পুণ্যস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

মূল্য ২৸৹

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার দক্ষিণে শান্তা (চট্টোপাধ্যায়) নাগ, হেমলতা ঠাকুর, নীলিমা মহলানবিশ, উষা (আচার্য্য) হালদার, নলিনী (সরকার) বসু, কমলা ঠাকুর। কবির বামে লীলা মৈত্র, সুরীতি (মিত্র) বসু, সুধা (গুপ্ত) চট্টোপাধ্যায়। ...সম্মুখের পংক্তিতে সন্তোষ মজুমদার, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ও প্রশান্তচন্দ্র মহল...

পুণ্যস্মৃতি

১

পার্থিব জীবনের ভিতর আমরা নিত্য বলিয়া কি জানি? দিনের শেষে রাত্রি আসে, আবার পরদিন ভোরে সূর্য্যোদয় হয়। বায়ু নিত্য প্রবাহিত, আলোর ধারা কোথাও অন্ধকারের ভিতর নিঃশেষ হইয়া যায় না। আকাশ মেঘে ঢাকে, কিন্তু জানি তাহার অড়ালে নিত্যকার সূর্য্য তেমনই জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে। হতভাগ্যতম যে মানুষ সেও এই অমরজ্যোতিকে সমস্ত অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করে, এ সান্ত্বনা তাহার কেহ হরণ করিতে পারে না।

তেমনই এই হতভাগ্য বাংলা দেশে জন্মিয়া, যখন প্রথম চৈতন্যলোকে স্থান পাইলাম, তখন এই আকাশের সূর্য্যেরই মত নিত্য, অক্ষয়, অমর বলিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে জানিয়াছিলাম। আজ বিশ্বাস করিতে পারি না তিনি নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরেই তিনি আছেন ইহা মনে করিয়াও সান্ত্বনা পাই না। নশ্বর জীবনের শেষ আছে, মানুষমাত্রেই মর-জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা ত বুদ্ধি দিয়া বুঝি, কিন্তু তাঁহাকে সাধারণ নশ্বর মনুষ্য

কোনদিন ভাবিতে পারি নাই বলিয়াই সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার মৃত্যুকে অস্বীকার করে। আশী বৎসর মানুষের জীবনে দীর্ঘকাল বটে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় তাহা কতটুকু? যাহাকে রূপ দিতে এত যুগ লাগিল, তাঁহাকে এই সামান্য এতটুকু সময়ের মধ্যেই বিধাতা কেন হরণ করিয়া লইয়া গেলেন? সৃষ্টির কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইল, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যের অতীত।

এই দরিদ্র দেশের তিনি যে কি ছিলেন, তাহা ত ভাষায় বলিয়া বুঝানো যায় না। একাধারে তিনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও আনন্দধন ছিলেন। পিতার ন্যায় শাসন করিয়াছেন, মাতার ন্যায় স্নেহ দিয়াছেন, প্রেমিকের মত ভালবাসিয়াছেন। তাই বাংলা দেশ আজ অনাথ, ইহার মাথার মুকুট ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহার দৈন্য আড়াল করিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিলেন, মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিলেন। আজ দেশের নগ্নতা, দীনতা বিশ্বের নিকট উদ্ঘাটিত।

মানুষের আত্মা অমর, তাহার বিনাশ নাই, ইহা ত বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহাতে আজ সান্ত্বনা পাই কই? সেই দেবোপম মূর্ত্তি, সেই শুভ্র হাস্য, আয়ত নেত্রের সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অন্তরে ত চিরউজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া আছে। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও কি তাহারা নাই?

একেবারে হারাইয়া গিয়াছে? বিশ্ববিধাতা এতই কি নিরাসক্ত যে এমন অকল্পনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া তাহা একেবারে বিলুপ্তির ভিতর মিলাইয়া যাইতে দিবেন? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ভাবী কালের মানুষ তাঁহাকে কি ভাবে স্মরণ করিবে জানি না। হয়ত বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার মানবতা লুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনি দেবতার মূর্ত্তি ধরিবেন। কিন্তু এ চিন্তাও আমাদের সান্ত্বনা দেয় না। আমরা যে তাঁহাকে মানুষ রূপেই জানিয়াছিলাম, পরমাত্মীয়ের মত জানিয়াছিলাম। অথচ শুধু মানুষও ভাবিতে পারি নাই। আত্মীয়ের সঙ্গে যে যোগসূত্র, তাহা রক্তের বন্ধন ও অভ্যাসের বন্ধন দিয়া গঠিত, সেভাবে আত্মীয় তিনি ছিলেন না। তবু আজ তাঁহার বিদায়ের ব্যথা, সাধারণ বিচ্ছেদদুঃখের অপেক্ষা এত গভীর, এত ভয়ানক কেন? শুধু মানুষ রবীন্দ্রনাথ ত চলিয়া গেলেন না, যেন এই হতভাগ্য দেশ হইতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ অবলুপ্ত হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রথম পরিচয় আমার যখন হয়, তখন আমার বয়স চার-পাচ বৎসরের বেশী হইবে না। আমরা তখন এলাহাবাদে বাস করিতাম। তখনকার

সিভিল্ লাইন্‌সে সাউথ রোড বলিয়া এক রাস্তার উপর একটি বাংলো বাড়ীতে আমরা ছিলাম। বিকাল বেলা বাড়ীর ভিতরের উঠানে খেলা করিতেছি, বাবা তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আমাদের "মহারাজ" (পাচক ব্রাহ্মণ) ছুটিয়া আসিয়া তাহার দেহাতি হিন্দিতে মহা ব্যস্ত ভাবে খবর দিল যে বাহিরে দুইজন রাজা আসিয়াছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের কোথায় বসানো হইয়াছে, মহারাজ বলিল সে তাঁহাদের নিজের খাটিয়া পাতিয়া বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে বাবা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার পিছন পিছন রাজা দেখিবার আগ্রহে ছুটিয়া গেলাম। উপকথার রাজা ও রাজপুত্রদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা অনেক শুনিয়াছিলাম, রাজার চেহারা কেমন হয়, কল্পনায় তাহার একটা ছবিও ছিল। কিন্তু অভ্যাগত দুইজনের চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিলাম, রাজারা যে এত সুন্দর হয় তাহা জানা ছিল না। সত্যই আমাদের বুদ্ধিমান্ মহারাজের দড়ি-ছাওয়া খাটিয়ার উপরেই তাঁহারা বসিয়া ছিলেন। একজনের পরিচ্ছদ কালো এবং অন্যজনের ধূসর। দুইজনই মাথায় ইরানী পাগড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণই তাঁহারা ছিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাবা আমাদের বলিয়া দিলেন যে, কালো পোষাকপরা যিনি তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও ধূসর পোষাকপরা ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

বাল্যকাল এলাহাবাদেই কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাঙালী হইতে বাধে নাই। বাংলা সাহিত্যের স্বাদ অতি অল্প বয়সেই পাইয়াছিলাম। প্রবাসীতে 'মাষ্টারমশায়' পড়িয়া যে ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের ঢেউ বুকের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল তাহা এখনও মনে আছে। তাহার পর আসিল 'গোরা'র যুগ। মাসের পর মাস কি আকুল আগ্রহেই অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম! এক মাসে যেটুকু খোরাক পাইতাম, তাহাতে ক্ষুধা ত একেবারেই মিটিত না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা তখনই হইত, যদিও বয়স তখন এগারো-বারোর বেশী নয়।

কিছু কাল পরে বাবা এলাহাবাদের বাস উঠাইয়া দিয়া, বরাবরের মত কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি বাড়ীতে আমরা চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। প্রবাসী কার্য্যালয়ও ইহার নীচের তলাতেই ছিল। এই বাড়ীর পাশে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী, ইহার একতলায় ছিল 'দেবালয়'। শশিপদ বাঁচিয়া থাকিতে প্রতি সপ্তাহেই

এখানে উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইত। এই-খানে দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। উহা বোধ হয় ১৩১৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেকালে তাঁহার সুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিবার আগ্রহ লোকের অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইতেই, চারিদিক্ হইতে অনুরোধ আসিতে লাগিল, একটি গানের জন্য। গান গাহিতে বলিলে আপত্তি তাঁহাকে তখনকার দিনে কখনও করিতে দেখিতাম না। শেষ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট খাতা বাহির করিয়া গান বাছিতে লাগিলেন। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে," গানটি বোধ হয় তখন সম্প্রতি রচনা করিয়া-ছিলেন, সেইটিই তিনি গাহিলেন। বক্তৃতার খবর বেশী লোকে পায় নাই, কাজেই 'দেবালয়ে'র ছোট ঘরখানি ভর্ত্তি হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বাহিরে তেমন জনসমাগম হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র 'দেবালয়ে'র সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লোক ভরিয়া উঠিল। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এই গানটির

ভিতরেও পৌত্তলিকতার আভাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন। তিনি কোনও উত্তর না দিয়া সস্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, ইহা এখনও মনে আছে।

ইহার পর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ী একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই; ডাঃ মৈত্র তখন মেয়ো হস্পিটালের উপরে বাস করিতেন। প্রকাণ্ড খোলা ছাদের উপর গানের আসর হয়। "তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি," গানটি সেদিন কবির কণ্ঠে শুনিয়াছিলাম।

১৩১৭ সালের ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "রাজা" প্রথম অভিনীত হয় বোধ হয়। আমার দিদি কয়েকটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়া এই অভিনয় দেখিয়া আসেন। অসুস্থ থাকাতে সেবার আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারি নাই। দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন শান্তি-নিকেতনের গল্প আরম্ভ করিলেন, তখন আমার আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার ত আর কোনও প্রতিকার নাই। স্থির করিলাম, ২৫শে বৈশাখে যে উৎসব হইবে তাহাতে যাইবই যেমন

করিয়া হোক। এক মাস আগে থাকিতে বাবা-মাকে বলিয়া কহিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। সঙ্গিনীও আরও কয়েকজন জুটিয়া গেলেন।

২২শে বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে আমরা একদল ছেলেমেয়ে বাবা ও স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ট্রেনে আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যাইতেছিলেন। অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। "রাজা" অভিনয় এবারেও হইবে শুনিয়াছিলাম। তাহার অনেক সাজসরঞ্জাম আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনেই চলিল দেখিলাম। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি দুইটা বা আড়াইটার সময় ট্রেন আসিয়া বোলপুর স্টেশনে থামিল। বোলপুর, বিশেষ করিয়া শান্তিনিকেতন অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্টেশনটি ত্রিশ বৎসর আগেও প্রায় এই রকমই ছিল। এখানে বেশীক্ষণ গাড়ী থামে না, এক রকম হুড়াহুড়ি করিয়াই ট্রেন হইতে নামিতে হইল। সবাই নামিয়াছে কিনা, কাহারও জিনিসপত্র ট্রেনে পড়িয়া আছে কিনা, এই লইয়া খানিক চেঁচামেচি, খোঁজাখুঁজি চলিল। তাহার পর সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী ও একটি বলদ-বাহিত বস্

অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। আমাদের পরিচিত দুই জন যুবক শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। আমাদের সকলের ইচ্ছা যে হাঁটিয়া যাই, তাহা হইলে দুই ধারের দৃশ্য বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা তাহাতে একেবারেই নারাজ, তাঁহারা আমাদের গাড়ী না চড়াইয়া কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। ঘোড়ার গাড়ীতে চার জন, ও অন্য সকলে বস্-এ চড়িয়া যাত্রা করা গেল। শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোলপুরের বাজার ছাড়াইয়া আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বালিকার দৃষ্টিতে সেই আলোকপ্লাবিত প্রান্তর স্বপ্নলোকেরই মত সুন্দর লাগিয়াছিল। এখনকার চোখে যেন আর কিছুই তত সুন্দর লাগে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঘোড়ার গাড়ী আগে আগে আসিয়াছে, বলদের গাড়ীটি কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলাম। একজন চাকর আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। ফুলবাগানের ভিতর দিয়া গিয়া একটি চওড়া বারান্দা-ঘেরা বাড়ীতে উঠিলাম। বাড়ীটির

চারিদিকেই বাগান, কয়েকটি সুন্দর আমলকী গাছ চোখে পড়িল। শুনিলাম ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী, তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তখন পুরী বেড়াইতে গিয়াছেন, তাই অতিথিদের জন্য এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীটির নাম শুনিলাম নীচু বাংলা। এখানে কেবল আমরা মেয়েরাই ছিলাম, একমাত্র কেবল বাবাকে কবি আমাদের অভিভাবক করিয়া সেখানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

একজন ভদ্রলোক আসিয়া এই সময় আমাদের অভ্যার্থনা করিলেন। দিদির কাছে শুনিলাম তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আগের বার যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া গিয়া ইঁহার ভদ্রতা ও অতিথিবৎসলতার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন দেখিলাম, তাঁহারা অত্যুক্তি ত করেনই নাই, হয়ত বা কমাইয়া বলিয়াছেন।

সামনের চওড়া বারান্দায় সতরঞ্চি বিছাইয়া আমাদের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গিনীরা তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। আরও আধ ঘণ্টা পরে বলদ-যানটি আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম আরোহীরা অর্দ্ধেক পথেই নামিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর জিনিসপত্র গুছাইয়া

রাখা ও কে কোথায় থাকিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। কয়েকজন ছোট ছোট ছেলের উপর মেয়েদের আদরযত্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল বোধ হয়। তাহারা যত্নের আতিশয্যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিল। রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বালকগুলির ইচ্ছা আমরা আবার এখন শুইয়া ঘুমাই। বিছানা পাতিয়া দিতে তাহারা মহাব্যস্ত। অগত্যা অল্পক্ষণের জন্য আমাদের শুইতেই হইল। সন্তোষবাবু বলিয়া গেলেন, পরদিন সকালে বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্পোর্ট্‌স্ আছে। সুতরাং সকাল সকাল উঠিবার অনেক সংকল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিজে হয়ত যথেষ্ট ভোরে উঠিতে পারিব না, এই ভয়ে সঙ্গিনীদের একজনকে বলিয়া রাখিলাম, যেন তিনি আমাকে যথাকালে উঠাইয়া দেন। বেশীক্ষণ ঘুমানো হইল না। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হইল। মুখ হাত ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিনের আলোয় চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। বাড়ীটির সামনে ও দুই ধারে বাগান, কিছু দূরে তালগাছবেষ্টিত একটি দীঘির মত দেখা যাইতেছে,

পিছনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। বাগানে তখন ফুলের হাট বসিয়া গিয়াছে।

ছেলেদের খেলা মাঠেই হওয়া সম্ভব মনে করিয়া আমরা ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা যাঁহাদের কাছে পরিচিত তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না, যে, সেই ত্রিশ বৎসর আগের ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম কি প্রকার ছিল। চারিদিকেই মাঠ আর খোয়াই, অনেক দূরে দূরে দুই-একটি সাঁওতাল-পল্লী দেখা যাইত। প্রথম যেবার গেলাম, শান্তিনিকেতনে তখন বোধ হয় দুইটির বেশী পাকা বাড়ী দেখি নাই। আর সব ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল। বিজলীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না, বাঙালী ছাড়া বিদেশী মানুষও দু-একটির বেশী দেখি নাই। সেই মাঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোটবড় নানা আকারের পাকা বাড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, খোয়াইগুলিও অনেক স্থানে শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। তখনকার পরিচিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেই এখন পরলোকগত, কেহ কেহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৬ সালে, ৭ই পৌষের উৎসবে গিয়া শান্তিনিকেতনের যে-রূপ দেখিলাম, তাহা আমার কাছে একেবারেই নূতন। কিন্তু ছাতিমতলায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার বেদীর দিকে চাহিয়া, এবং মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কণ্ঠে উচ্চারিত বেদমন্ত্র শুনিয়া আবার মনে হইল, আমার মনের সেই শান্তিনিকেতন ত হারায় নাই, এই নূতন আবেষ্টনের ভিতরেও ত তাহাকে পাইলাম। কিন্তু আর সে সান্ত্বনাও ত রহিল না। এই প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যিনি ছিলেন, তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনও যেন মনের মধ্যে অবাস্তব রূপ ধারণ করিতেছে।

সেদিনের দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া তাকাই। মাঠের ভিতর দিয়া খানিক দূর যাইবার পরই একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল যে, আমাদের জন্য খেলা আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া খেলার জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খেলা অনেক রকমই হইল, এবং ছেলেরা দর্শকের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করিল। এইখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শিশুকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে জানিতাম, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি হাতে-লেখা পোগ্রাম আদায় করিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন ছাপাখানা ছিল না। আশ্রমবাসিনী

মহিলারা ও অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত আলাপ হইল। মেয়েটির সরল ব্যবহারে আমরা সকলেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ তখনও পাই নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। খেলার মাঝামাঝি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে গুরুদেব আসছেন।" সকলে ফিরিয়া তাকাইলাম। গেরুয়া রঙের দীর্ঘ পোষাকপরা তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি ছেলেদের দিকে চলিয়া গেলেন।

খেলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে নীচু বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ছেলেদের দল আমাদের জন্য জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা তখনই আমাদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আমরা তখন খাইতে একেবারেই নারাজ। কবিবরের পিছন পিছন সব কয়জন বাহিরের ঘরে গিয়া জুটিলাম ও তাঁহার

চারিদিক্ ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম। তাঁহার দুই-চারিটি কথা শুনিতে তখন আমরা উৎসুক, নিজে কথা বলিবার চেষ্টা বিশেষ করি নাই। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পরও প্রথম প্রথম সাহস করিয়া কথা বলিতাম না। কি কথা যে বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতাম না। অথচ তিনি যে ভয়ানক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ নন, তাহা সেই স্বল্প পরিচয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতিটি কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। জলখাবারের পাত্রসমেত তাহারা এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা আমাদের সেইখানে বসিয়াই জলখাবার খাইতে হইল, যদিও খানিকটা সঙ্কুচিত ভাবে। জলখাবারের সঙ্গে ছেলেরা দুধও আনিয়াছিল, আমাকে দুধ খাইতে বলায় আমি বলিলাম, "আমি কোনও জন্মে দুধ খাই না।" তিনি কথাটা শুনিয়া অত্যন্ত হাসিতেছেন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্য অতিথিদের খবর লইবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন। আশ্রমবাসিনী কয়েকজন মহিলা আমাদের সঙ্গে খেলার মাঠ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও আর-একটুক্ষণ গল্প করিয়া নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন। একজন মহিলা শুধু থাকিয়া গেলেন

আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে। তবে আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না, সেই ছোট ছেলেগুলি আমাদের সত্যই এত যত্ন করিয়াছিল যে এখন সে-কথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। কোথা হইতে তাহারা মানুষকে এত যত্ন করিতে শিখিল? বাল্যকালে মানুষ আদর পাইতেই চায়, করিতে চায় না, জানেও না। সত্যের অপলাপ না করিয়াও বোধ হয় বলা যায় যে পুরুষ-জাতির এ বালাই আরও কম। কিন্তু এই দশ-বারো বৎসরের ছেলেগুলি দিনরাত হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিত অতিথিদের জন্যে। দারুণ রোদে ক্রমাগত খাবার বহিয়া আনা, জল তুলিয়া আনা, এ ত সারাক্ষণ ছিল। রাত জাগিতেও তাহাদের জুড়ি মিলিত না। অতিথিদের জন্য প্রয়োজন হইলেই নিজেদের বিছানাপত্র অকাতরে ধরিয়া দিত, ইহাও দেখিতাম। ইহা শিক্ষার গুণ এবং স্থানমাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হইত না। সন্তোষবাবুকে এখনও যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এতখানি পরিপূর্ণ ভদ্রতা আর কোনও মানুষের ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু সেই ভদ্রতার ভিতর কোনও কৃত্রিমতা, কোনও আড়ষ্টতা ছিল না; দুই দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আমাদের পরমাত্মীয়

হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেগুলি ইঁহাদের আদর্শ দেখিয়াই শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। না হইলে স্কুলের ছেলে, বাংলা দেশে আর যেজন্যই বিখ্যাত হোক, ভদ্রতা এবং অতিথিবৎসলতার জন্য নিশ্চয়ই নহে। ছেলেগুলির যত্নের আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা একদিন সন্তোষবাবুরই কাছে নালিশ করিয়াছিলাম যে ইঁহারা ত আমাদের কিছুই করিতে দিতে চায় না, সবই তাহারা করিবে। সন্তোষবাবু বলিলেন, "এতেও গুরুদেব সন্তুষ্ট হন নি, বলছেন 'মেয়েদের কষ্ট হচ্ছে'।"

কষ্ট আমাদের বিন্দুমাত্রও হয় নাই। এখন সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার দিন-কয়টির দিকে তাকাইয়া ভাবি; এইরূপ নির্ম্মল আনন্দ জীবনে আর কোনদিনও কি জুটিয়াছিল?

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর স্নানাহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে তখন নিরামিষ খাওয়া চলন ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর বাহিরের বড় ঘরখানিতে ঢালা বিছানা পাতিয়া সকলে বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সকলের তখন আকণ্ঠ কথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বিশ্রাম করিবে কে? সকলে কথাই বলিতে লাগিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আবার এ

বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়া শুনিলাম, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে আসিবেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

হঠাৎ আমাদের কলকোলাহলের ভিতরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ রূপে সার্থক হইল না। যাহা হউক, সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, এবং তিনি বসিবার পর আবার সকলে বসিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা ঘরোয়া বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। আমরা তখন তাঁহার গান বা পাঠ শুনিতে উৎসুক, ওসব আলোচনা আমাদের ভাল লাগিবে কেন? তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার জননী এই সময় উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার রলালাপ করিতেছি[illegible] [illegible]হাও আমাদের বিস্ময়ের খোরাক কিছু [illegible]য়াছিল। কবিবরকে আমরা পুরাকালের তপোবনের [illegible]িরই মত একটা কিছু কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি যে আবার সাধারণ মানুষের মত সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করেন বা বৈবাহিকার

সঙ্গে রসিকতা করেন, ইহা দেখিয়া মুগ্ধবিস্ময়ে আমাদের মন ভরিয়া গেল।

এক জন ভদ্রমহিলা শান্তিনিকেতনের দারুণ গ্রীষ্মের কথা তোলাতে তিনি বলিলেন, "গরমের আমি একটি মাত্র ওষুধ জানি, সেটি হচ্ছে কবিতা লেখা।"

ইহার ভিতর একজন শিক্ষক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মহিলারাও সভাভঙ্গ করিয়া ভিতর-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গান বা পাঠ না শুনিতে পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম যে কবি তখনও চলিয়া যান নাই, বারান্দায় একটি বেতের ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরে শুনিয়াছিলাম ঐ চেয়ারখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল।

আমরা মেয়ের দল আবার আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের ভিতরে একজন তাঁহাকে 'খেয়া' পাঠ করিয়া শুনাইতে অনুরোধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। তখনকার [illegible]কথা যখন স্মরণ করি তখন এই ভাবি, যে, কখনও তাঁহাকে কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে দেখি নাই, সে [illegible] ক্ষুদ্র, যতই অর্ব্বাচীন হোক্ না কেন। তাঁহার যেন শ্রান্তিক্লান্তিও ছিল না। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অম্লানবদনে এক আসনে বসিয়া গান

গাহিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, কবিতা পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধেক বয়স যাঁহাদের, তাঁহারা পা বদ্‌লাইয়াছেন পঞ্চাশ বার, উঠিয়াও গিয়াছেন দুই-চারি বার। তিনি কিন্তু মর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তির মত একই ভাবে বসিয়া থাকিতেন। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও সকল দিক্ দিয়াই তিনি যেন মনুষ্যত্বের ক্ষুদ্র সীমানার বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সামান্য জিনিসগুলি হইতেও বুঝা যায়।

কিন্তু কোন্ কবিতাটি পড়া হইবে? কেহই তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তখন তিনি বলিলেন, "তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশী interesting লাগবে। আমার লেখা 'জীবনস্মৃতি' তোমাদের পড়ে শোনাই।"

সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন 'জীবনস্মৃতি'র অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি স্নেহ করিয়া তিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন। সেটি সৌভাগ্যক্রমে এখনও আমার কাছে আছে। আরও কত

অমূল্য রত্ন হাতে আসিয়াছিল। সংসারের কণ্টকময় পথে চলিতে চলিতে কিছু বা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিছু এখনও কাছে আছে।

সন্ধ্যা আসিয়া পড়াতে সেদিন আর পাঠ শেষ হইল না। আর একদিন বাকিটা পড়িয়া শুনাইবেন আশ্বাস দিয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তিনি "শান্তি-নিকেতন" ভবনে বাস করিতেন। নীচু বাংলা সেখান হইতে কম দূর নয়। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি হাঁটিয়া আসিতেন, কখনও ছাতা লইয়া, কখনও না লইয়াই। বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটিতেন, দুই-চার বার তাঁহার সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, আমাদের সাধ্যে কুলায় না।

বিকালবেলাটা বাঁধের ধারে ও মাঠে বেড়াইয়া কাটাইয়া দিলাম। বাঁধটিতে তখন জল বেশী ছিল না। কিন্তু বৈশাখের গরমে বিদ্যালয়ের কুয়াগুলির জল শুকাইয়া উঠিতেছিল। তাই পুরুষ অতিথিদের ভিতর অনেকে এবং বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই বাঁধের জলেই স্নান করিতে আসিতেন দেখিতাম। আমরা অবশ্য সেই ছোট ছেলেগুলির অনুগ্রহে জলের কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই।

বিকালে আর একপালা ছেলেদের খেলা দেখা গেল।

সন্ধ্যার সময় শান্তিনিকেতন ভবনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা সকলেই তখন বালিকা, কেহ বা স্কুলে পড়ি, কেহ বা সবে স্কুলের গণ্ডি ছাড়াইয়াছি। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। সে-সব অমূল্য বাণী, কেন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি নাই, সেই ক্ষোভ এখন মনে জাগে।

শান্তিনিকেতনের তিনতলার ছাদে উঠিয়া সেদিন অনেকক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। মাঝে একজন যুবক আসিয়া খবর দিলেন যে গিরিধি ও কলিকাতা হইতে মস্ত আর একদল অতিথি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এত লোকের আসিবার কথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে এই খবরে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন বোধ হইল। এত লোককে যথোপযুক্ত আদরযত্ন করা বা স্থান দান করা সম্ভব হইবে কি না সেবিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়েরাও অনেকে আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের দলের অনেকে নীচু বাংলায় ফিরিয়া গেলেন, নবাগতদের ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই সময় ঝড় আসিয়া পড়ায় আমরা তেতলার ছাদ হইতে নামিয়া দোতলার গাড়ী-বারান্দার ছাদে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ চাকর এবং আলো সঙ্গে দিয়া আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

নীচু বাংলায় আরও অনেকগুলি মহিলা ও বালিকা আসিয়াছেন দেখিলাম। কেহ বা পরিচিতা, কেহ অপরিচিতা। দিদি এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে রাত্রিটা আমাদের বড়ই উদ্বেগের ভিতর দিয়া কাটিল। অতিথিদের ভিতর একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে কয়েক বার দেখিয়া গেলেন। রাত্রিতে আরও একপালা অতিথিসমাগম ঘটিল। নীচু বাংলায় আর তিল ফেলিবার জায়গা রহিল না। আমরা এক ঘরে বার-চৌদ্দজন করিয়া শুইতে আরম্ভ করিলাম। একজন মহিলা ট্রেনে কাপড়ের বাক্স ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, যে ক'দিন তিনি এখানে ছিলেন, নিজের ঐ হারানো কাপড়গুলির জন্য অবিশ্রাম বিলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা কাপড়-চোপড় ধার দিয়া তাঁহাকে সে-যাত্রা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২৪শে বৈশাখ সকালেও ছেলেদের খেলা ছিল। কিন্তু দিদির অসুস্থতার জন্য সেখানে যাইতে পারি নাই। সেদিন আর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই নাই। অভিনয়ের নানা কাজে তিনি সকাল হইতে ব্যস্ত ছিলেন। অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ ত তিনি সবটাই করিয়াছিলেন, আবার তাহাদের সাজানো, makeup করা, তাহাও সেকালে তাঁহাকেই করিতে হইত।

ছেলেরা কিছু ব্যস্ত ছিল বলিয়া পরিবেশনের কাজে আজ মেয়েরা কিছু কিছু সাহায্য করিল। ইহাতেও অবশ্য সন্তোষবাবু ও তাঁহার ক্ষুদ্র চেলার দল যথারীতি আপত্তি করিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলারা এক দল রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ শুনিতে গেলেন। প্রবন্ধটি অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী-রচিত। আমরা আর-এক দল নেপালবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেই দারুণ গ্রীষ্মে. নিদারুণ রৌদ্রে কিভাবে যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম তাহা ভাবিলে এখন অবাক্ লাগে। ওখানকার ছেলেরা জুতা পরিত না, দেখাদেখি আমরাও খালি-পায়ে বেড়াইতাম। ছাতার বালাই ত প্রথম হইতে ছিল না।

সন্তোষবাবু তখন একটি গোশালা খুলিয়াছিলেন। অনেকগুলি গরু-মহিষ দেখিলাম, তাহারা বেশ যত্নেই আছে। একটি প্রকাণ্ড কালো মহিষ দেখিয়া ও তাহার বীর- ও রৌদ্র-রসের বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। ডেয়ারী ফার্ম্ম দেখার পরে বিদ্যালয়ের ঘরগুলি, লাইব্রেরী, হাসপাতাল ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছাতিম-তলার বেদীও দেখিয়া আসিলাম।

একটি ছোট ছেলেকে এই সময় দেখিলাম, তাহার

ডাকনাম গুলু। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, তবে মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। ইহার অনেক গল্প আগেই শুনিয়াছিলাম। ছেলেটি আশ্রমে আসিয়া প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পায়, তাঁহাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি নাকি কবিতা লেখ?" তিনি অপরাধ স্বীকার করায় গুলু বলিল, "আমিও লিখি।" খাতা বাহির করিয়া সে তাঁহাকে কবিতা শুনাইয়াও দিল।

বিকালবেলাটা এদিক্-ওদিক্ বেড়াইয়াই কাটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের জন্য মেয়েদের কতকগুলি ফুলের মালা গাঁথিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও খানিকক্ষণ করা গেল। নীচু বাংলার সামনে তখন বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান ছিল, ফুলের কিছু অভাব হইল না।

সন্ধ্যার পর "রাজা" অভিনয় আরম্ভ হইল। তখন 'নাট্যঘর' নামক একটি বড় মাটির ঘরে অভিনয় হইত। ব্রাহ্মসমাজে লালিতপালিত হওয়াতে অভিনয় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। "রাজা" অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন, আড়াল হইতে "রাজা"র ভূমিকাও তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। 'ঠাকুরদাদা' সাজিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সদাসর্ব্বদা যে গেরুয়া রঙের

পোষাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদাদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোষাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব। তাঁহার সব-কিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত। একটি জিনিস আমার সর্ব্বদা মনে হইত যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম। তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন্, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। আকাশের সূর্য্যকে যেমন সাজাইয়া তারকার মূর্ত্তি ধরানো যায় না, তাঁহাকেও তেমনই অন্য কাহারও মূর্ত্তি ধরানো যাইত না।

দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই-তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রাণী সুদর্শনা, ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরঙ্গমা,

সাজিয়াছিলেন। কাঞ্চিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়। নাটকের ভিতর অনেকগুলি গান ছিল, তাহার কয়েকটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনিলাম, অভিনয় বেশী দীর্ঘ হইলে অতিথিরা পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। ক্লান্ত অবশ্য কেহই হন নাই, হইতেনও না। ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ঠাকুরদাদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতে.। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের মূর্ত্তিই শুধু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন।

২৫শে বৈশাখ ভোর পাঁচটার সময় আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্য প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের আগেও অনেকে উঠিয়াছেন দেখিলাম। ভোর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক বাঁধ হইতে স্নান করিয়া ফিরি.তছেন। আমরাও স্নানাদি সারিয়া আম্রকুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও বেশী লোক-সমাগম হয় নাই। রবীন্দ্রনা. স্বয়ংও আসেন নাই। উৎসবক্ষেত্র আলপনা ও পল্লব অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। আমরা

না বসিয়া এদিক্‌ওদিক্ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, কবি শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইয়া উৎসবক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আম্রকুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমবাসী ও অতিথিবর্গে দেখিতে দেখিতে সভাস্থল ভরিয়া উঠিল। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যের কাজ করিলেন তিনজন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়। নেপালবাবু শেষের দিকে ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁহার কয়েকটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা সকলেই গুরুদেবকে ভক্তি কর, কিন্তু তাঁকে কখনও যেন ঈশ্বরের স্থানে বসিও না।"

এখন মনে হয়, এ উপদেশের প্রয়োজন ছিল, শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, অন্য অনেকের জন্যও। এই হতভাগ্য দেশে তিনি মূর্ত্ত দেব-আশীর্ব্বাদ ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া মনে হয় দেবতাই আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। একজন মানুষের মৃত্যুতে কোনও দেশ কখনও এমন রিক্ত আর কোথাও হইয়াছে কি? আজ যদি গৌরীশৃঙ্গ ভাঙিয়া পড়িত, বা ভাগীরথী শুকাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি বাঙালী ইহার চেয়ে অধিক অভিভূত

হইত? এই নিরাশার মহাতমস্বিনীর ভিতর আলোক-রেখা ত কোথাও দেখিতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক্ হইতে অনেকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। তিনি ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিয়া অল্প কিছু বলিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু মনে আছে। "আমাকে আপনারা যে উপহার দিলেন, সেগুলি পাবার আমি কতখানি যোগ্য তা যদি আমি মনে করতে যাই, তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের কোনো লজ্জা নেই, সেটা প্রীতির ক্ষেত্র। এই-সব উপহার আমাকে আপনারা প্রীতির সহিত দিচ্ছেন, সেইজন্য এসব গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই।"

কবিবরকে অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। সভাস্থ অতিথিদেরও ফুলের মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এইখানে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিলাম।

সভার কার্য্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রায় তিন শত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ

করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশী দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন।

নীচু বাংলায় ফিরিয়া শুনিলাম, অভ্যাগতদিগের ভিতর অনেকেই বেলা দুইটার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাদের নিজস্ব দলটি ও আর দুই-একজন মাত্র আরও এক দিনের জন্য থাকিয়া গেল।

ইহারই ভিতর একদিন সুকুমার রায় তাঁহার "অদ্ভুত রামায়ণ" গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪শে কি ২৬শে বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ গানটি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। "অদ্ভুত রামায়ণে" একটি গান আছে, "ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কই রে, ঐ আসে, ঐ আসে ঐ, ঐ, ঐ রে।" আশ্রমের ছোট ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল, "ঐ আসে।" একটি ছোট ছেলে মাঠের

ভিতর গর্ত্তে পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমারবাবুকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও ঐ আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও ত।"

২

অতিথির দল ত বাহির হইয়া পড়িলেন, যাইবার সময় খুব হুড়াহুড়ি করিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইল, কারণ সময় হাতে অল্পই ছিল। আমরা সকলেই আশা করিতেছিলাম যে তাঁহারা ট্রেন ফেল করিবেন। যাত্রীরা বলদের বস্-এ উঠিলেন, তাঁহাদের মালপত্র চলিল গরুর গাড়ীতে। সে গাড়ীও আবার নানারকম উৎপাত সুরু করিল। কখনও রাস্তা ছাড়িয়া নালায় নামিয়া পড়ে, কখনও জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। এক ভদ্রলোকের একটা বাক্স ভাঙ্গিয়া সব জিনিষপত্র রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল। শেষে চতুষ্পদ বাহনগুলির আশা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের ছেলের দলই গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল, এবং তাঁহাদের ট্রেন ধরাইয়াও দিল।

বাকি দুপুরটা কিভাবে কাটানো যায়? নেপালবাবুকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠানো হইল; তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া "জীবনস্মৃতি"র বাকী অংশটুকু আমাদের শুনাইয়া যান। এইপ্রকার অনুরোধ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচও আমরা অনুভব করি নাই। কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে, আমরা বয়সে ও বুদ্ধিতে ছোট বটে, কিন্তু তাঁহার চোখে ছোট নয়। ছোট বলিয়া সর্ব্বদা প্রশ্রয়ই পাইয়াছিলাম, অবজ্ঞা কখনও কোনওভাবে পাই নাই। যে অগাধ স্নেহ এই সদ্যপরিচিতা বালিকা-গুলির উপর তিনি অজস্রধারে বর্ষণ করিতেন, তাহার তুলনা পাই না। এই অমূল্য দানের যোগ্য আমরা কেহই ছিলাম না, কিন্তু একমাত্র স্নেহই জগতে যোগ্যতার বিচার করে না।

কিন্তু দূত পাঠানোটা প্রথমবার বিফলই হইল। নেপালবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একদল ভদ্রলোক কবিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িতে একান্তই নারাজ। কিন্তু এত অল্পেই হাল ছাড়িবার মত মনোভাব আমাদের কাহারও ছিল না। অন্য অতিথিদের প্রতি অবিচার হইতেছে কিনা তাহা

ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। আবার দূত পাঠানো গেল, এবার সন্তোষবাবুকে। এবার রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন দেখিলাম, তবে সঙ্গে কয়েকজন ভদ্রলোকও আসিতেছেন। তাঁহারাই বা দখল ত্যাগ করিবেন কেন? তাঁহাদিগের ভিতর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

নেপালবাবু আমাদের শিশুকাল হইতেই জানেন, এলাহাবাদে আমরা বহুকাল একই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে "মা" বলিয়া ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। কবি আমাদের সামনে আসিয়া নেপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, আপনার এখানে এসে মাতৃসম্মিলন হ'ল নাকি?" চারুচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি যে কেবল নেপালবাবুরই মা তা নয়, আমারও বটে।" সত্যই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেন, এ স্নেহ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তা'হলে আমিও

একজন candidate হলাম।" বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি যে ভারি ঘরে থেকেও দাবী ছেড়ে দিয়েছেন ?" বাবা হাসিমুখে কি একটা উত্তর দিলেন। আমার মুখ দিয়া কোনও কথাই বাহির হইল না। কি যে বলা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া পাইলাম না।

"জীবনস্মৃতি" পাঠের আয়োজন হইতে লাগিল। বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, তবু ঘরে না ঢুকিয়া সকলে বারান্দায়ই বসিলাম। কয়েকজন বৃষ্টির ছাটে ভিজিতেছিলাম বলিয়া সস্নেহ তিরস্কার লাভ করিলাম, এবং সরিয়া আসিলাম। বৃষ্টি সমানে চলিল, পাঠও চলিল। "জীবনস্মৃতি"র সবটা সেদিনও শেষ হইল না। বর্ষার গান শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতা কখনও লক্ষ্য করিতাম না বলিয়া আমরাও ভাবিতে পারিতাম না যে তাঁহারও শ্রান্তিক্লান্তি কিছু থাকিতে পারে। গান শুনিবার আব্দার ধরিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া বলিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অতিথিরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা শান্তিনিকেতনকে শাস্তিনিকেতন বলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখানে আমার কোন অধিকার নেই, মেয়েরা যা বলবেন

তাই হবে।" আমরা অবশ্য অল্পবয়সের বিবেচনাহীনতায় তাঁহাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছুকই ছিলাম। কিন্তু তিনি অন্য অতিথিদের একেবারে বঞ্চিত করিলেন না। কয়েকটি বর্ষার গান গাহিয়া তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলেন। "বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে" গানটি সেদিন প্রথম শুনিয়াছিলাম। শুনিলাম পুরুষদের আসরেও "জীবনস্মৃতি" রবীন্দ্রনাথ আর-একবার পড়িয়া শুনাইয়াছেন। দানে কখনও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আকাশের সূর্য্যেরই মত তিনি অজস্রধারে কিরণ বর্ষণ করিতেন, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন কাহারও সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখিতাম না।

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।"

ইহা যেন তিনি নিজের সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন।

কবি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেশীক্ষণ বাহিরে থাকি নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাড়ী এক রকম খালি, শুধু বাবা একলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সামনের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম

রবীন্দ্রনাথ একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। অতিথিরা প্রায় সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন বোধ হয়। বাবার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি এই চাষাটির সঙ্গে আলাপ করুন, আমি ততক্ষণ নূতন আলাপ জমাবার চেষ্টা করি।" ঐ যুবকটি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, তিনি অল্পদিন হইল আমেরিকা হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। আগের দিনের অভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন, আমি উত্তরে কি যে বলিয়াছিলাম মনে নাই। বোধ হয় কিছুই বলি নাই। এমন সময় প্রশান্তচন্দ্রের একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের ভগিনীর হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন, যদিও তাঁহার নিজের যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বালিকাটি অনতি-বিলম্বে নিজেই ফিরিয়া আসিল, সে তাহার দাদা ও দিদির সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহাদের কিঞ্চিৎ বকুনি খাইতে হইল, এবং তখনই আবার কবিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইল। তিনি সৌভাগ্যক্রমে

বেশী দূর যান নাই, সুতরাং কিছু পরেই নীচু বাংলায় আবার ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সকলে বারান্দায় বসিলাম। গান শুনিবার আবেদন জানাইলাম, তাহা মঞ্জুরও হইল। "আসনতলে মাটির 'পরে লুটায়ে র'ব," গানটি সেইদিন তিনি গাহিয়াছিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া শান্তিনিকেতনের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। সন্তোষবাবুরা তখন একটি ছোট পাকাবাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর ছাদের উপর গিয়া আর-একবার বসা হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথকে একটি বসিবার কার্পেট উপহার দিয়াছিল। সেইটি আনাইয়া তিনি আমাদের জন্য পাতিয়া দিতে বলিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে না বসিয়া ছাদের সিমেণ্টের উপরেই বসিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একটি বালক আসিয়া খবর দিল যে নাট্যঘরে "কলির ভগীরথ" ও "বিনা পয়সার ভোজ" অভিনয় হইবে। সকলে দেখিতে গেলাম বটে, কিন্তু অভিনয় বিশেষ ভাল লাগিল না। সেই রাত্রেই অবশিষ্ট অতিথি যে ক'জন ছিলেন প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের ছেলেরাও পরদিন যাইবে বলিয়া শুনিলাম।

আমরা ছাব্বিশে বৈশাখ, শেষরাত্রের ট্রেনে যাইব বলিয়া স্থির হইল।

মন অত্যন্ত মুষ্‌ড়াইয়া গেল। তিনদিনের পরিচয়েই যেন এখানকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিলাম। এই বন্ধনে টান পড়িয়া অত্যন্ত একটা ক্লিষ্টতা মনকে অধিকার করিয়া বসিল। ইহা ছুদিনের ক্ষণিক জিনিস ছিল না, তাহা ত এখন বুঝিতে পারি। মধ্যে মৃত্যু আসিয়াও এই বন্ধনের গ্রন্থি ত শিথিল করিতে পারিল না; পৃথিবীর মানুষ নশ্বর বটে, কিন্তু ভালবাসা অমর, এই বিশ্বাসই এখন আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়।

পরদিন সকালে ছেলেদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করিবেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমরাও সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। ক্ষিতিমোহন-বাবুকে তখন ছেলেরা "ঠাকুরদা" বলিয়া ডাকিত, প্রথম "রাজা" অভিনয়ে তিনি ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। শুনিলাম কাশীতেও তাঁহার "ঠাকুরদা" নাম চলিত ছিল, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই নাম প্রচার করিয়া দেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর পত্নীরও

ডাকনাম ছিল "ঠান্‌দি"। আমরা এখনও এই নামেই তাঁহাকে ডাকি। তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে যাইব স্থির করিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ঠান্‌দি তখন নিজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া মহাব্যস্ত। তাহারা সব ক'জন মিলিয়া দড়ির আল্‌না ছিড়িয়া, কলসীর জল উল্‌টাইয়া ফেলিয়া এবং নিজেরা জলের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িয়া, জননীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছিল। তাঁহার তখনও কিছু দেরি আছে দেখিয়া আমরা অন্যান্য অধ্যাপকদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া খোকাখুকীদের সঙ্গে ভাব করিয়া আসিলাম। শ্রীমান্ শান্তিদেব ঘোষকে তখন প্রথম দেখিয়াছিলাম বোধ হয়। কালো পাথরে খোদাই করা পুতুলের মত গোলগাল সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া সকলেই খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আগুন ধরিতে গিয়া তিনি তখন দুইটি কচি আঙ্গুল পুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা আর পথ প্রদর্শিকার অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই বাহির হইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শান্তিনিকেতন ভবনের (বর্ত্তমান অতিথিশালার) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ, উপরেই আছেন। এই বাড়ীর নীচের তলায় তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় বাস করিতেন। আমরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপরেই উঠিয়া গেলাম। ইহার আগে সঙ্গে একজন কাহাকেও না লইয়া, সোজা কবিবরের দরবারে কখনও উপস্থিত হই নাই। কিন্তু তিন দিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম আমরা গেলে তিনি বিরক্ত হইবেন না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তিনি গাড়ীবারান্দার ছাদে বসিয়া আছেন, পায়ের কাছে একটি বিড়াল। বুদ্ধিহীন পশুও যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির টানে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত, ইহা পরেও অনেকবার দেখিয়াছি।

আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমার একজন সঙ্গিনী একটি মালা নিজে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে পরাইবার জন্য। কিন্তু আঁচল হইতে বাহির করিতে গিয়া মালাটি জট পাকাইয়া গেল। পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এইজন্য কবি হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া যেন বেড়াইবার উদ্দেশ্যেই ছাদের অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে মালার জট ছাড়িয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং মালাটি গ্রহণ করিলেন।

আমরা সকালের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতে চাই শুনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের নিয়ে একটু আলাদা উপাসনা করতে চাই, তোমাদের আমার কিছু বলবার

ইচ্ছে আছে। আমি এখন আশ্রমের ছেলেদের বিদায় দিতে যাচ্ছি, তাদের নিয়ে উপাসনা শেষ হলেই তোমাদের ডাকব। আমি সন্তোষকে ব'লে যাচ্ছি, এইখানেই তোমাদের জলখাবার দিতে।"

তিনি চলিয়া গেলেন, কয়েক মিনিট পরে মন্দিরের ঘণ্টাটি গম্ভীর মন্দ্রে বাজিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ঘণ্টা তিনি নিজেই বাজাইতেছেন। যতদিন দৈহিক সামর্থ্য অটুট ছিল, এই ঘণ্টা বাজানোর কাজটি তিনি নিজেই করিতেন।

আমরা সেই গাড়ী-বারান্দার ছাদে বসিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলযোগাদি সেইখানেই সম্পন্ন হইল। খানিক পরে আমাদের ডাক পড়িল। বালিকাদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিলাম। উপাসনার পর আমরাও সজলচক্ষে নীচুবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কবি আর-একবার অতিথিদের খবর লইতে আসিলেন। যে কয়দিন ছিলাম, কখনও একাজে তাঁহার অবহেলা দেখি নাই, সকলের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। তুচ্ছ বলিয়া কোন কিছুকে উপেক্ষা করিতেন না। এদিন

আর গান বা পাঠ হইল না, বাবার সঙ্গে সাধারণ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। "গোরা" সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল।

রোদ পড়িলে পারুলবনে বেড়াইতে যাইবার একটা প্রস্তাব উঠিল। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই এ প্রস্তাবটা করিয়াছিলেন বোধ হয়। দিদি হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে গরুর গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গ ধরি, কিন্তু সকলে প্রস্তুত হইতে কিছু দেরি হইয়া গেল এবং শুনিলাম তিনি আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সঙ্গেও অনেকে চলিলেন, তবে আমরা কয়েকজন কবিবরকে সঙ্গী পাইবার আশায় দ্রুতপদে হাঁটিয়া, সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন মহিলা এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। ছাত্রের দল আমাদের দেখিয়াই এক এক করিয়া পিছাইয়া গেলেন।

পথে চলিতে চলিতে নানা রকম হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল। সাধারণ কথাবার্ত্তার ভিতর রঙ ও রস ছড়াইবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যতখানি ছিল, এমন

কখনও কাহারও মধ্যে দেখি নাই। একমাত্র ক্ষিতিমোহনবাবু এ-বিষয়ে তাঁহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ছোট ছোট কথা যেন আলোক-স্ফুলিঙ্গের মত ঠিক্‌রাইয়া পড়িত। রবীন্দ্রনাথ নিজে গম্ভীর ভাবে বলিয়া যাইতেন, শ্রোতারা হাসিয়া আকুল হইত। তাঁহার সম্বন্ধে সকলের সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত অধিক থাকায় অন্যরা কেহ তাঁহার সামনে রসিকতা করার চেষ্টা বিশেষ করিত না কিন্তু দৈবাৎ কাহারও কথায় কোনও হাস্যরসের উপাদান পাইলে তিনি তাহা যথেষ্টই উপভোগ করিতেন, ইহাও দেখিতাম।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছেলেদের দেখাদেখি আমরাও এখানে খালি পায়ে বেড়াইতাম, তাহা আগেই বলিয়াছি। আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর ইহা একরকম সহিয়া গিয়াছিল, পথঘাট পরিষ্কার ছিল, কাঁকর ভিন্ন অন্য কিছু পায়ে বড় একটা ফুটিত না। বাহিরের মেঠো পথে আসিয়া কিন্তু বিপদ্ হইল। কাঁটাভরা পথে চলিতে গিয়া নিজেরা অত্যন্ত জব্দ হইলাম, কবিবরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। একবার তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, "এইজন্যই ত গানে আছে, 'সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে'।"

মেয়েদের পায়ে যাহাতে কাঁটা না ফোটে এজন্য তিনি

অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিলেন, অনেককে টানিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে ফিরাইয়াও আনিলেন।

অনেক দূর আসিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে আমরা অন্যান্য সকলকে পিছনে রাখিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছেলেদের কাহাকেও পিছনে বা আশেপাশে তাকাইয়া দেখা গেল না। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "একটাও ছেলে যে দেখছি আমাদের সঙ্গে আসে নি, কি হবে?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন, আপনি কি মনে করেছেন যে আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব না? আপনি আমাকে এতই অজ্ঞ মনে করেন?" মুখে ওকথা বলিলেন বটে, তবে সচরাচর যে-পথে তাঁহারা পারুলবনে আসিতেন, সে পথে না গিয়া নূতন একটা পথ দিয়া আমাদের বনের ভিতরে লইয়া আসিলেন। জায়গাটি অতি সুন্দর, শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বনের ভিতর বেড়ানো হইল না। কবি বলিলেন, "এখানে সাপটাপ মাঝে মাঝে বেরয়, এখানে থেকে দরকার নেই, চল বাইরের মাঠে গিয়ে বসা যাক, এখন বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে।"

আমরা বাহির হইয়া আসিয়া একটা খোলা জায়গায় বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "গান ধরা যাক, তাহলে অন্যরা বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।" তাঁহার সম্মুখে মেয়েরা কেহ গাহিতে রাজী না হওয়ায়, তিনি নিজেই একটি হিন্দী গান ধরিলেন। যাঁহারা সেকালে তাঁহার গান না শুনিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহার কণ্ঠ কতখানি মধুর ও শক্তিশালী ছিল। সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ একলা তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল। কতকগুলি ছেলে হঠাৎ বন হইতে বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মনে করিলেন ইহারা বুঝি আশ্রমেরই ছেলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিক্ দিয়ে তোরা কোথা থেকে এলি রে?"

তাহারা বলিল, "আজ্ঞে, আমরা পারুলডাঙার।"

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "যা বাপু, তোদের কোন দরকার নেই।" কিন্তু তাঁহার দরকার না থাকিলেও ছেলেগুলির দরকার ছিল দেখা গেল। তাহারা চলিয়া না গিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই আরও কতকগুলি লোক মাঠের উপর দিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাঁহাদের একজনের বিরাট দেহ এবং কাঁধের উপর লম্বিত এস্রাজ

দেখিয়া কাহারও মনে আর সন্দেহ রহিল না যে ইঁহারা সত্যই আশ্রমের দল। সকলেই দেখিতে দেখিতে আসিয়া জুটিলেন এবং মাঠের মধ্যে ছোটখাট একটি সভা বসিয়া গেল। আবার গান গাহিবার অনুরোধ চলিতে লাগিল। "পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে," গানটি কবিকে গাহিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "এখানে ত খালি কাঁটা ফুটে।"

গান অনেকগুলিই পরে পরে হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি হিন্দী ও বাংলা গান গাহিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মিলিয়া আরও কয়েকটি গান করিলেন। গান আরও চলিত বোধ হয়, কিন্তু দিনেন্দ্র-নাথের এস্রাজের ছড়ি রজনবিহনে হঠাৎ অচল হইয়া উঠিল। মাটিতে ঘষা এবং কাপড় দিয়া মোছা প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসার কল্যাণে অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল, অগত্যা তাঁহাদের গানবাজনা বন্ধই করিতে হইল।

অতঃপর মেয়েদের গান করিতে বলা হইল। সকলেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সম্মুখে গান করিতে নারাজ। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর শ্রীমতী অরুন্ধতী সরকার (অধুনা চট্টোপাধ্যায়) একটি হিন্দী গান করিলেন। ত্রিশ বৎসর আগে কবে কি গান শুনিয়াছিলাম তাহা

সাধারণতঃ মনে থাকিবার কথা নয়। এই গানটি কেন জানি না মনে আছে, তাহার প্রথম লাইন—

"দুখ দে গয়ো, সুখ লে গয়ো, পরদেশী সৈঁয়া।"

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে কবি গান গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার অতুলনীয় বাগ্বৈদগ্ধের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, পাকা আম সামনে থাকিতে আমসী কেহ খায় না। রবীন্দ্রনাথ কোন একটা জায়গার নাম করিলেন, সেখানে পাকা ল্যাংড়া আম থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে আম্‌সী খাইতে দেখিয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকে শেষ পর্য্যন্ত একটি হিন্দী গান গাহিতে হইল।

অতঃপর আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। ফেরার পথেও সকলে একসঙ্গে আসিতে পারিলাম না, নানা দলে বিভক্ত হইয়া গেলাম। আমরা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়িলাম না। মাঠের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ "গুম্‌" করিয়া একটা শব্দ হইল। কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় কবি গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "সাড়ে ন'টার তোপ পড়ল।" তিনিও যে ঠাট্টা করিতে পারেন ইহা বারবার দেখিয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় নাই, তিনি যাহা বলিতেন প্রথম প্রথম সমস্তই বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস

করিয়া লইতাম। একটি মেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোপ কোথায় পড়ল?" রবীন্দ্রনাথ আবার তেমনই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ফোর্ট উইলিয়মে।" দুই-তিন-জন মেয়ে সত্যই ঘড়ি মিলাইয়া লইল। পরে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিল।

সারাপথ রবীন্দ্রনাথ গান করিতে করিতে আসিলেন, কখনও হিন্দী কখনও বা স্বরচিত বাংলা গান। "প্রেম-পথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও হে নাথ," গানটি অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন।

নীচুবাংলার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা এখন বাড়ী ফের, আমি খেয়ে দেয়ে আবার তোমাদের ওখানে যাব, বিদায় নিতে।"

আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মন ভারাক্রান্ত ও বিষাদ-পূর্ণ। দুইদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল যেন চিরজীবনের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি। বিভিন্ন জন্মে ভগবান্ মানুষের বিভিন্ন ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কিন্তু অনন্ত আশ্রয়ও ত থাকে, তাহার সন্ধান এইখানেই পাইয়াছিলাম, তাই চলিয়া আসিতে প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বাগানে বেড়াইতে

লাগিলাম। যদিও ট্রেন রাত তিনটায়, তবু শুইতে বা ঘুমাইতে একেবারে ইচ্ছা করিল না। রাত্রি বারোটারও পরে দেখিলাম শান্তিনিকেতনের দিক্ হইতে একজন কেহ আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছেন, সঙ্গে আলো। জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ সামান্য কয়টি বালিকার নিকট বিদায় লইবার জন্য অত রাত্রে হাঁটিয়া আসিতেছেন, তখন ব্যাপারটাকে কি সাধারণই না ভাবিয়াছিলাম!

তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার মাথায় ও মুখে সাদরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি বিদায় নিতে এসেছি বটে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা হবে।" কয়েকজন অতিথির তখনও খাওয়া হয় নাই, সেই-খানে গিয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইলেন, দুইচারিটা কথা বলিলেন, তাহার পর আবার হাঁটিয়াই ফিরিয়া চলিলেন।

গভীর রাত্রে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া চলিলাম। অত রাত্রেও সন্তোষবাবু এবং তাঁহার সহকারী ছেলের দল উপস্থিত ছিলেন, যাহাতে অতিথিরা কোনরকম অসুবিধায় না পড়েন। চাহিয়া দেখিলাম, শান্তিনিকেতনের দিক্ হইতে তখনও একটি আলো দেখা যাইতেছে। অনেকেই হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। রাত তিনটার ট্রেন ধরিয়া সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

মনটা বড়ই অস্থির হইয়া রহিল। আগেকার জীবন হইতে কেমন করিয়া যেন অনেকখানি দূরে সরিয়া গেলাম। নূতন একটি দৃষ্টি খুলিয়া গেল, যেন উপনয়নের পর দ্বিজত্ব লাভ করিলাম। চোখে দেখা ও কানে শোনার জগতের উপর হইতে একটি অদৃশ্য যবনিকা উঠিয়া গেল, অন্তরালে যে নিত্যসুন্দর আর-একটি জগৎ আছে তাহারই পরিচয় নানাভাবে নানাক্ষণে হৃদয়ের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইল জুলাই মাসে। তখন তিনি কলিকাতায় প্রায়ই আসিতেন। নূতন কোন লেখা হইয়াছে জানিলেই কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেন। সকলের ত ক্রমাগত শান্তিনিকেতনে গিয়া উৎপাত করিলে চলে না, সুতরাং সকলের আগ্রহাতিশয্যে তিনিই দুই-এক মাস পরে পরে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত-বৃন্দকে কৃতার্থ করিয়া যাইতেন। আমরা আশ্রমে গিয়া যে প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম, তাহা বহুকাল ধরিয়াই উপভোগ করিয়াছিলাম। সর্ব্বসাধারণের জন্য যে বক্তৃতাদির আয়োজন হইত, সেগুলিতে ত উপস্থিত থাকিতামই, তাহা ছাড়া শুধু আমাদের ছোট দলটি যাহাতে নিভৃতে তাঁহার

কাছে গিয়া বসিতে পারে, তাহার আয়োজনও প্রায় প্রত্যেকবারই হইত। বন্ধুবর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এই-গুলির ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন, ইহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

বাবার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা কবির প্রায়ই চলিত। সুতরাং তাঁহার খবর ও আশ্রমের খবর সারাক্ষণই পাইতাম। আবার উৎসব হইলেই আমরা শান্তিনিকেতনে যাইব এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাবা সে-কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে লিখিলেন, "উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোন কাজের কথা নয়, তাঁরা যখন আসবেন তখনই উৎসব।"

"অচলায়তন" নাটকটি এই সময় রচিত হয়। তাহা শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জুলাই মাসের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। নানা স্থানে নিমন্ত্রণের আতিশয্যে আমরা প্রথম দু-এক দিন তাঁহার দেখা পাইলাম না। পরে শুনিলাম নাটকটি প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়ীতেই পড়িয়া শোনানো হইবে এবং কবি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

কি আকুল আগ্রহেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম

তাহা ত এখনও ভুলি নাই। এই আগ্রহের অবসান কোন-দিনই হয় নাই, কিন্তু বিধাতা এই প্রতীক্ষার অবসান এ জন্মের মত ঘটাইয়া দিলেন। তবু বুদ্ধির অতীত কিছু দিয়া এখনও মনে হয় এ প্রতীক্ষারও শেষ হয় নাই, অন্য কোন লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিবার, তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইব।

সেদিন রবিবার ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে আমরা কয়জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম কতক্ষণে তিনি আসিবেন। প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়ী ইহারই মধ্যে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঘণ্টাখানিক পরে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী-লতা দেবী। ইঁহারই ডাকনাম ছিল বেলা। বহুদিন হইল ইনি ধরার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রাণীতুল্য রূপ এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

কবি আসিয়া বাবাকে বলিলেন, "রামানন্দবাবু, আপনি মনে করবেন না যে আপনিই কেবল কন্যাদের নিয়ে বেড়াতে পারেন, আমিও পারি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বড়মানুষী তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সাধারণ

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে অনেক সময় চলিয়া আসিতেন, এমন কি দু-একবার জোড়াসাঁকো হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের সমাজপাড়ার সেই বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ ছিল, কিন্তু কতবার তাঁহার চরণরেণু-স্পর্শে তাহা ধন্য হইয়াছে। প্রবাসী অফিসের সাজসরঞ্জাম তখন এতই দীন ছিল যে তাহার বর্ণনা করিলে এখনকার দিনে মানরক্ষা হয় না। সেই স্বল্পালোক ছোট ঘরটিতে সাধারণ কাঠের টুলে বসিয়া কতদিন তাঁহাকে বাবার সঙ্গে ও চারুবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়াছি। চারুবাবুকে তিনি স্নেহ করিতেন, অনেক সময় তাঁহার কলিকাতা আগমনের সংবাদ চারুচন্দ্রই প্রথম পাইতেন। পোষ্টকার্ডে, "অয়মহং ভো," এই কথাটি মাত্র লিখিত থাকিত, কিন্তু হাতের লেখাই লেখককে ধরাইয়া দিত।

রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া আসিয়া অল্পক্ষণই বসিয়াছিলেন, কারণ নাটক-পাঠের তাড়া ছিল, শ্রোতার দল আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হওয়ার পর কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা ত আপনার মেয়েদুটিকে এক রকম দখল ক'রে নিয়েছি, তাই আমার

একটিকে নিয়ে এলাম।" বেলা দেবীকে স্বল্পভাষিণী বোধ হইল, তুই-চারটি মাত্র কথা বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গেই চলিলাম। পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতেছেন। "অচলায়তনে" অনেক গান, সবগুলি তিনি একলাই গাহিয়া গেলেন, তবে গলা একটু ভার থাকায় নীচু গলায়ই গাহিলেন। লোকের ভীড়ে আর কথাবার্ত্তা বলিবার কোন সুবিধা হইল না। তাহার পর-দিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে কবিতা পড়া বিশেষ অভ্যাস ছিল না। শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আগাগোড়া সব পড়িয়া ফেলিলাম। সবই যে বুঝিলাম তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাতে রসগ্রহণের কোন বাধা জন্মিল না।

"অচলায়তন" প্রথমে প্রবাসীতে ছাপা হয়। পাণ্ডুলিপি-খানি যখন বাবার কাছে আসিল, তখন দেখিলাম কবি

দুইটি গান কাটিয়া দিয়াছেন। একটি গান, "কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না ব'সে, আমি চলব বাহিরে।" ইহা পরে অধুনালুপ্ত 'সুপ্রভাত' মাসিকপত্রে আবার দিবালোক দেখিয়াছিল এবং প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি আর কোথাও কোনদিন দেখি নাই। গানটি এই—

বাজে রে বাজে রে
ঐ রুদ্র তালে বজ্রভেরী,
দলে দলে চলে প্রলয়-রঙ্গে বীর সাজে রে।
দ্বিধা ত্রাস আলস-নিদ্রা ভাঙ্গ গো জোরে,
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য মাঝে রে।
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে।

আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই মুলুকে এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার কথা হইতে লাগিল। বাবার সঙ্গে গিয়া সে একবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখিয়াও আসিল। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া সে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কবিবরের হাসি বালকের মনোহরণ করিয়াছিল। তখনই তাহার অবশ্য যাওয়া হইল না, কয়েক বৎসর পরে সে গিয়াছিল। তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, এইজন্য অত অল্পবয়সে তাহাকে বোর্ডিংএ পাঠানো গেল না।

৩

এই সময় কলিকাতায় প্রতি বৎসর পূজার আগে 'স্বদেশী মেলা' বলিয়া একটি মেলা বসিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রায় সামনাসামনি একটু উত্তরে একখণ্ড খোলা জমি ছিল। বাল্যকালে জায়গাটাকে আমরা "পান্তির মাঠ" বলিয়া জানিতাম। এইখানে চালা বাঁধিয়া উপরি উপরি কয়েক বৎসর মেলা হইয়াছিল। মেলাতে বেড়াইতে গিয়া আর একবার বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও আসিয়াছিলেন. তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। অল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহাব বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিযা অত্যন্ত খুশি হইলাম।

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার খবর আগেই পাইয়াছিলাম। ১৩ই আগষ্ট বোধ হয় তিনি কলিকাতায় আসেন। পর দিন সকালে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী একবার বেড়াইযা গেলেন। প্রতিমা দেবী পুরাতন বন্ধুর মত অতি সহজভাবে অনেক গল্প করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমাদের কলেজের সময় এসে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলাম না ত?"

সপ্তাহখানিক পরে প্রতিমা দেবীর নিমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বিকালবেলা আমরা দুই বোনে বেড়াইতে গেলাম। এ বাড়ী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উহা আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের তীর্থক্ষেত্র; দেখিয়া মনে একটা শ্রদ্ধাজড়িত পুলকের সঞ্চার হইল।

একজন দরোয়ান আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া ভিতরে লইয়া চলিল। প্রায় যখন তেতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়াছি তখন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে সোজা উপরে উঠবে, না মাঝে বিশ্রামের দরকার?"

বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন ছিল না, সোজা উপরেই উঠিলাম। তেতলার একটি ঘরে বসিলাম, প্রতিমা দেবী আসিলেন। শুনিলাম এই ঘরে পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। এই ঘরে তাঁহাদের পরিবারের অনেকের ছবি দেখিলাম। মৃণালিনী দেবীর বড় ছবি একখানি দেখিলাম। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বাড়ীখানি দেখিয়া আসিলাম। বিরাট্ বাড়ী, সমস্তটা বেড়াইয়া আসিতে অনেক সময় লাগিল। তখন ইহা লোকজনে গম্‌গম্ করিত সারাক্ষণ। কে কোথায় থাকেন তাহাও জানিয়া লইলাম।

মিষ্টিমুখ করার অনুরোধ আসিল। কিছু খাইতেও হইল। রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানি না, এখন আসিয়া বলিলেন, "আমি চাই যে তোমাদের খুব ভাব হয়, কিন্তু আমি থাকলে আর কেউ কথাই বল না, সব কথা একলা আমাকেই বলতে হয়। তাই আমি তোমাদের একলা ছেড়ে দিয়েছি।" শুনিলাম সকালে দুইজন মহিলা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই কথা বলেন নাই; তাই কবির এই অভিযোগ।

বেলা দেবীও শেষের দিকে আসিয়া জুটিলেন, তিনি কি একটা কাজে আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাই এতক্ষণ আসিতে পারেন নাই। তিনিও অনেক গল্প করিলেন এবার। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও সেদিন প্রথম দেখিলাম।

২১শে আগষ্ট ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা হয়। জনতার চাপে প্রায় মন্দিরের দরজা-জানলা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক আগে গিয়া বসিবার স্থান দখল করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি রাখিতে পারি নাই। দাঁড়াইয়াই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। বক্তৃতার পরদিনই প্রাতে বোধ হয় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

যাইবার দিনও বিকালবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখনও স্কুল হইতে ফিরি নাই, সুতরাং তাঁহারদর্শন পাইলাম না।

এই সময় হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া বিলাত-যাত্রা করিবেন। অবশ্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর উহা ঘটিয়া উঠে নাই, পরের বৎসর তিনি গিয়াছিলেন। পূজার ছুটির আগেই শান্তিনিকেতনে "শারোদোৎসব" অভিনীত হইবে শুনিলাম। যাইবার জন্য জেদ ধরিলাম এবং নানা বিঘ্ন-বাধা আসিয়া জোটা সত্ত্বেও সে জেদ কিছুতেই ছাড়িলাম না। আমাদের পুরাতন দলের অনেকে এবার যাইতে পারিলেন না। তবে নূতন অনেক সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী জুটিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার খানিক পরেই উপরের অমলনীল আকাশ, আর দুই ধারের মাঠে বনে শারদ-শ্রীর উজ্জ্বল প্রাচুর্য্যে মনটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। ধানের ক্ষেতের সেই উচ্ছল সবুজ ঢেউ আর মাঝে মাঝে কাশের ফুলের হাতছানি এখনও মনে পড়ে। মেমারী বলিয়া একটি ছোট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়া গোছা গোছা কাশফুল তুলিয়া আনিয়াছিলাম।

রাত্রি হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে বোলপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবার দেখিলাম নেপালবাবু কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সেই পূর্ব্বপরিচিত বলদের বস্‌টিও হাজির। এবার ঠিক করিয়াই আসিয়াছিলাম যে জোর করিয়া হাঁটিয়া যাইব, কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প আর রহিল না। বস্‌-এ চড়িয়াই যাত্রা করিলাম, তবে অল্পক্ষণের ভিতরই বৃষ্টি থামিয়া যাওয়াতে আবার নামিয়া পড়িয়া হাঁটিয়াই গেলাম। অমাবস্যার রাত্রি তবু হাঁটিতে কোনও কষ্ট হইল না। নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কিছুক্ষণের ভিতরই নীচু বাংলার সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং কবি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবং দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলার সঙ্গে পরিচয় হইল। শৈলবালাকেও উপস্থিত দেখিলাম।

সকলের সঙ্গে নীচু বাংলার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এবারেও এখানেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তবে বাহিরের ঘরখানি আর খালি ছিল না, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও বাবাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরের উঠানে আসিলেন। সেইখানে কয়েকটি চেয়ার অতিথিদের জন্য পাতা ছিল। তাঁহারা সেইখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমরাও কাছেই বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে লাগিলাম। এমন সময় আর-এক পশলা বৃষ্টি আসাতে সকলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। হেমলতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে খাটের উপর বসিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "মেয়েরা এটা invidious distinction মনে করবেন।"

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চেহারা তাঁহার বয়স ও খ্যাতির তুলনায় অত্যন্ত কাঁচা দেখিয়া আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাত্রে খাইবার সময় পুরুষ অতিথিরাও আমাদের সঙ্গে বসিলেন। অধ্যাপক সরকার যে শুধু দেখিতেই অল্পবয়স্কের মত ছিলেন তাহা নহে, খাইতেনও অত্যন্ত কম। মেয়েরা খাওয়া শেষ করিতে দেরি করিত অনেক, কারণ গল্প করাটা হইত খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। সরকার-মহাশয় ততক্ষণ হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেন পরিবেষণ ঠিক্ মত হইতেছে কিনা ও সকলের খাওয়া শেষ হইয়াছে কিনা।'

শুইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, ঘুমাইতে রাত্রি হইল তাহারও অধিক। বড় গরম ছিল, খানিক পরেই খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া আমরা মাটিতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সকালে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিয়াছিলাম, পাছে ঠিক সময় উঠিতে না পারি, এই ভাবনায় আর ঘুমই হইল না।

ভোরবেলা উঠিয়া, যথাসময়ের পূর্ব্বেই মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আজও দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘণ্টা বাজাইলেন। উপাসনান্তে খানিক এদিক্-ওদিক্ ঘুরিলাম, খানিক ফুল কুড়াইলাম। সন্তোষবাবুর গোশালাও আর-একবার দেখিয়া আসিলাম। আমাদের জলখাবার ঠিক হইয়াছে, খবর পাইলাম চাকরের মুখে; আমরা তখন অতিথিশালার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এই-খানেই জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনার পর অনেকেই এখানে আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম। জলযোগের পর গান শুনিবার প্রস্তাব উঠিল। সেইদিনই রাত্রে অভিনয়, সুতরাং গায়কের দল কেহই গান করিতে প্রথমতঃ রাজী হইলেন না, বলিলেন রাত্রে তাহা হইলে গলা ধরিয়া যাইবে। কিন্তু তখনকার দিনে জেদ কখনও ছাড়িতাম না, সেদিনও গান শুনিয়া তবে ছাড়িলাম।

প্রথমে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী একটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণ নিজের গানের খাতার সন্ধান করিতে গেলেন। খাতা আনিয়া তিনিও গোটা-দুই গান শুনাইয়া দিলেন, দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গে এস্রাজ বাজাইলেন। তিনজনে মিলিয়াও গান হইল। মেয়েরাও গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রথমে কাহাকেও সম্মত করা গেল না। অনেক অনুরোধের পর কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দুই কন্যা একটি গান করিলেন। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিলাম। একবার ছাতিমতলায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। ঠিক সেই সময় ধূলা উড়াইয়া ডালপালা ভাঙিয়া, প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসিল। ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায়ও খানিকটা এবং কোনও ছাদ হইতে ঝড়ের পূর্ণ বিক্রম দেখার ইচ্ছায়ও খানিকটা, আমরা তাড়াতাড়ি সন্তোষবাবুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, কাজেই ঝড় দেখা বা বৃষ্টিতে ভিজার ইচ্ছাটা পুরাপূরি মিটিল না। নানা বিষয়ে

কথা হইতে লাগিল, এমন কি আমিও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এই সময় কবির আর-এক পরিচয় পাইলাম। তিনি যে আবার চিকিৎসকের কাজও করেন তাহা আগে জানিতাম না। তাঁহার পাশে দেখিলাম একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তিন-চার মিনিট পরে পরে এক-একজন রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিলেন। কাহারও মাথা ধরিয়াছে, কাহারও গলা ভাঙিয়াছে, কাহারও জ্বর, কাহারও পেটের গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই ঔষধ দিতেছিলেন। সেদিন রাত্রে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় সকলের সুস্থ থাকিবার ঝোঁকটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বহুকাল আগে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাহার কথা, বিলাতযাত্রার কথা, অনেক গল্পই সেদিন রবীন্দ্রনাথ করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গল্পগুচ্ছের ভিতর কোন্ গল্পটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?" আমি প্রথমে বলিলাম, "সবগুলিই খুব ভাল লাগে," তাহার পর বলিলাম, "'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিই সবচেয়ে ভাল লাগে।" দাক্ষিণাত্যের যে প্রাসাদটি দেখিয়া তিনি এই গল্প রচনা করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধেও

অনেক কথা বলিলেন। পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া মুখে মুখে গল্প রচনা করার একটা খেলা তাঁহারা খেলিতেন, সে কাহিনীও শুনিলাম। দলের একজন গল্পকে নানা লোমহর্ষণ অবস্থায় ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন, উদ্ধারের ভার পড়িত রবীন্দ্রনাথের উপর। অনেক সময় গল্পের আদি ও অন্ত দুয়েরই তাল সামলাইতে হইত তাঁহাকে। "দুরাশা", "গুপ্তধন" প্রভৃতি অনেক গল্পই নাকি এই ভাবে রচিত হইয়াছিল।

আমাদের সঙ্গে দুই-চারজন ছিলেন যাঁহারা কবির নিকটে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে পান নাই। তাঁহাদের ভিতর একটি বালিকার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার গান শোনে। কিন্তু নিজে বলিতে সাহস না পাইয়া সে ক্রমাগত আমার কানে কানে অনুরোধটা জানাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝিতেই পারিলেন ব্যাপারটা কি। মুখ ফুটিয়া অনুরোধ জানানো মাত্রই হাসিয়া বলিলেন, "এই পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি এতক্ষণ ?"

রাত্রে অভিনয়, সকলেই নিজের নিজের গলা সযত্নে বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু বালিকার আগ্রহ পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিলেন না। একটা গান গাহিয়াই নেপালবাবুকে ডাক দিয়া বলিলেন, "নেপালবাবু,

দেখুন এরা ত আমাকে ধরে গানটান করিয়ে নিচ্ছে, আপনি ত আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না।"

নেপালবাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "আমি ত গান শুনেই ছুটে এলাম।" ইহার পরেও ঘণ্টা-খানিক সেখানে বসিয়া গল্প করিয়া তবে আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

নীচু বাংলায় ফিরিয়া খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতে হইল। ইহার আগের বার সঙ্গে অভিভাবিকা কেহ না থাকায় ইচ্ছামত রোদে ঘুরিয়া বেড়ানো যাইত, এবার মা সঙ্গে থাকায় সে সুবিধা হইল না। বিকালে আবার বেড়াইতে বাহির হইয়া মাঠে, বনে, লাল মাটির রাস্তায় অনেকখানি ঘুরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়াদাওয়া সারিয়া, "শারদোৎসব" অভিনয় দেখিতে চলিলাম। গিয়া পৌছিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় তখনকার দিনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইত, কোনও ক্রটি ত চোখে পড়িত না। বালকদের গান ও নৃত্য এত সুন্দর লাগিয়াছিল যে ত্রিশ বৎসর পরেও উহা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। দুইটি গানের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, "আমার নয়ন ভুলান এলে," এবং "আমরা

বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।" রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারেও তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ বেশের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই, শুধু মাথায় একটি গেরুয়া রঙের পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন।

এইবার লাল্‌চে কাগজের উপর ছাপা একটি প্রোগ্রাম পাইলাম। এটি এখনও আমার কাছে আছে। নূতন তিনটি গান রচিত হইয়াছে, তাহা উহাতেই দেখিলাম। একটি "ওগো শেফালীবনের মনের কামনা," দ্বিতীয়, "আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি," তৃতীয়, "আমাদের শান্তিনিকেতন।" প্রোগ্রামটি কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রেসে ছাপানো, ইহাতে নাটকের পাত্রদের নামও ছাপা হইয়াছিল। ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, লক্ষেশ্বর সাজিয়াছিলেন শ্রীযুত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশী সাজিয়াছিলেন ধনপতি। বালকদের ভিতরেও অনেকে এখন জনসমাজে সুপরিচিত।

অভিনয়ান্তে খানিকক্ষণ নাট্যঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কবি অন্যত্র ব্যস্ত থাকাতে তখন আর তাঁহার দেখা মিলিল না। নীচু বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া খাওয়াদাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়া গেল।

পরদিনটাও আমাদের থাকিয়া যাইবার কথা। কি ভাবে এই সময়টুকু কাটানো হইবে সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হইল। রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "ডাকঘর" শুনিতেই হইবে এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইল না।

Visva Bharati Quarterlyর যে Tagore Birth-day Number বাহির হইয়াছে, তাহাতে "অচলায়তন ও ডাকঘর" দুইটিই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া লেখা আছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ত ১৯১২তে হইয়া থাকিবে, কিন্তু রচিত হইয়াছিল দুইটিই ১৯১১র মধ্যে।

অভিনয়ের শেষে ছেলেরা, "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি গাহিয়া পালা সাঙ্গ করিল। নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত তাহারা আশ্রমের পথে পথে এই গানটি গাহিয়া ফিরিয়াছিল।

পরদিন সকালটা মাঠে ও খোয়াইয়ে বেড়াইয়া কাটিয়া গেল। এই খোয়াইগুলিও এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন আশ্রম এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই, চারিদিকেই এই বালখিল্য পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইত। ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত স্বচ্ছ জলের ধারা। ইহার মেটে লাল রংটার কেমন একটা স্নিগ্ধতা ছিল, চোখ জুড়াইয়া যাইত।

ইহার পর অতিথিশালার বাড়ীর দিকে চলিলাম। সেইখানে "ডাকঘর" পাঠ হইবার কথা ছিল। সকলেই কিছু কিছু পুষ্পঅর্ঘ্য বহন করিয়া লইয়া গেলাম কবিকে উপহার দিবার জন্য।

অতিথিশালার দোতলার মাঝের ঘরটিতে বসিয়া "ডাকঘর" পড়া হইল। পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব দ্রুতগতিতে আসিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ও তাহার উত্তর লইয়া, তেমনই দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার বয়স তখন সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, তবু দেহ বেশ ঋজু ও সবল। তাঁহার চক্ষু-দুইটি বড় অসাধারণ ছিল, এমন প্রদীপ্ত দৃষ্টি আর কখনও দেখি নাই।

ইহার পর ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিলেন। আসিয়াও ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা তখন কোথায় বাহির হইয়া গিয়া-

ছিলাম; তাঁহার সঙ্গে নামে মাত্র দেখা হইল, কথাবার্ত্তা বলিবার স্থযোগ ঘটিল না। তিনি এইমাত্র ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও বিদায় লইয়া আসিলাম।

বিকালের গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ী চড়িয়া ষ্টেশনে আসিলাম, পুরুষ অতিথিরা হাঁটিয়াই আসিলেন। অনেকেই নিজের নিজের ব্যাগ ও স্যুটকেস্ হাতে করিয়া বহন করিতেছেন দেখিয়া আমরা সেগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুতেই তাঁহার ব্যাগটি হাতছাড়া করিলেন না, ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

ষ্টেশনে আসিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ আমরা কিঞ্চিৎ আগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ট্রেন যথাসময়ে আসিল, সকলে উঠিয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্রও এই সঙ্গে উঠিল। সকলকে বিদায় দিতে একদল ছাত্র আসিয়াছিল, তাহারা ট্রেন ছাড়িবামাত্র সমস্বরে, "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি আরম্ভ করিল। ট্রেন যখন প্রায় প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও দেখিলাম ছেলেরা গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে গান করিতেছে,—

"আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।"

শাঁকটিগড় (শক্তিগড়) বলিয়া একটা ষ্টেশনে আমাদেরই ট্রেনের তলায় একজন মানুষ কাটা পড়িল। মৃত্যুবিভীষিকার করাল ছায়া আমাদের উৎসবের আনন্দকে একেবারে ম্লান করিয়া দিল। গাড়ীর কি একটা গোলমাল হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়াও বাড়ী পৌঁছিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

কবিবরের সপরিবারে বিলাত যাত্রার কথা তখনও চলিতেছে, নানাপ্রকার আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে। এই-সকল আয়োজনের সম্পর্কেই বোধ হয় পূজার ছুটির মধ্যে তিনি একবার কলিকাতায় আসিলেন। ২রা অক্টোবর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গেলাম। সেদিন বিজয়া দশমী, রাস্তায় প্রচুর জনতা দেখিলাম। এবারেও তিনিই আসিয়া সর্ব্বপ্রথম আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই তেতলার ঘরটিতেই গিয়া বসিলাম। বেলা দেবী আসিলেন, প্রতিমা দেবী বাজার করিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন বলিয়া শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এ ঘরে থাকলে তোমরা কথা বলবে ত? না চুপ ক'রে

থাকবে ?” বাধ্য হইয়া তখন কিছু কথা বলিতেই হইল। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখনই নিজেও কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অন্য কাহারও কথা বলিবার ইচ্ছাই যে শুধু হইত না তাহা নহে, প্রয়োজনও অল্পই হইত। তাঁহাদের বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উঠিল, দেখিলাম তখনও পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই। আমাদেরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলায় আমি বলিলাম, “আমরা গিয়ে কি করব ?”

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমার রাঁধুনী ক’রে নিয়ে যেতে পারি, রাঁধতে জান ত ?”

রাত্রে আর-এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া সেদিন আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

এই সময় কলিকাতায় তিনি মাসখানেকের উপর ছিলেন বোধ হয়। অনেকবার তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যাত্রার দিন পাকাপাকি কিছুতেই স্থির হয় না, নানা প্রকার বাধা পড়িতে লাগিল। কখনও শুনিতাম তিনি দুই বৎসরের অধিক সেখানে থাকিবেন, কখনও শুনিতাম অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। বহুদিন তাঁহার অদর্শনের সম্ভাবনাটা আমাদের বড়ই কাতর করিয়া তুলিত। পার্থিব জীবনে বিচ্ছেদ-

দুঃখ আছে, ইহা তখন একটা কথার কথা বলিয়া জানিতাম, অনুভব তখনও করি নাই। আজ জীবনের অনেকখানি পথ মাড়াইয়া আসিয়াছি, বিচ্ছেদ যে কতখানি ভয়ানক হইতে পারে, নিরাশা কতখানি অতলস্পর্শী হইতে পারে, সকলই ভগবান্ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে বিশ্বাস দিয়াছেন যে পৃথিবীর বিচ্ছেদটাই শেষ কথা নয়, ইহারও পরে অনন্তজীবন অপেক্ষা করিয়া আছে। যাঁহাদের হারাইয়া প্রাণ আজ হাহাকার করিতেছে, তাঁহারা সত্যই হারান নাই।

প্রশান্তচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রফুল্ল (আমাদের কাছে বুলা নামেই সুপরিচিত) শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তিনি এই সময় কিছু অসুস্থ হইয়া বিদ্যালয় হইতে কলিকাতার বাড়ীতে চলিয়া আসেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। এই বালকটিকে দেখিতে একদিন তিনি তাঁহাদের বাড়ী আসিলেন। দিনটা ১২ই অক্টোবর। আমাদের বাড়ী একই পাড়ায়, কবি আসিয়াছেন শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার চেহারা একটু খারাপ দেখিলাম, বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহার মাথা প্রায় চৌকাঠে ঠেকিয়া যাইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ মহলানবীশ মহাশয় বলিলেন, "আমি ত জানতাম না যে প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পৌত্র কোনোদিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন, তা হলে দরজাগুলো আরও উঁচু ক'রে করতাম।"

নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বুলার পাশে বসিয়া গল্প করিলেন। আগে যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন কেমন শীত সহ্য করিতে পারিতেন, একবার ভুলক্রমে হোটেলে কি রকম ব্যাঙের তরকারি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক গল্প শুনিলাম। চলিয়া যাইবার সময় কবিবর আশ্বাস দিয়া গেলেন যে শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

সেই সময় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে খুব ঘটা করিয়া টাউনহলে কবি-সম্বর্দ্ধনার একটা কথা চলিতেছিল। আয়োজন বাঙালী মতে অতি ধীর গতিতে হইতেছিল, তবু এ বিষয়ে আলোচনা প্রায়ই শুনিতাম। তিনি বিলাত চলিয়া যাইবার আগে ইহা ঘটিয়া উঠিবে কিনা সে বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল।

১৪ই অক্টোবর তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে

বেড়াইতে আসিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া আর একবার বুলাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার জাহাজটা যাহাতে ছাড়িতে না পারে সেই রকম কামনা আমাদের অনেকের মনে জাগিতেছে শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তার চেয়ে তোমরা আমার সঙ্গেই চল না? তাহলে সব দিক্ দিয়েই ভাল হয়, বেশ জমেও উঠবে।"

যাইবার সময় আবার অভ্যাস মত বলিয়া গেলেন শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

আজ এ আশ্বাস কোথাও পাই না কেন? পৃথিবীর জীবনের ভিতর আর দেখা হইবে না জানি, যদি অন্য কোথাও, অন্যভাবে দেখা হয়, তাহাতে এই মর্ত্ত্য জীবনের কোনও আনন্দের স্মৃতি থাকিবে কি?

৩০শে আশ্বিন তখন মহা ধুম করিয়া রাখীবন্ধন হইত। অনেক গানের মিছিল, অনেক সভা, ইত্যাদি হইত। অনেকের বাড়ী সেদিন অরন্ধন, আমরাও তাহা পালন করিতাম। রাখীবন্ধনের দিন পরিচিত অনেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন, আমরা যাইতে না পাওয়ায় বড়ই নিরাশ হইলাম। লাল ও হল্‌দে রেশমী-সুতা দিয়া আমরা তখন নিজেরাই বাড়ীতে অতি সুন্দর

রাখী তৈয়ারী করিতাম ও পরিচিত সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রাখী বাঁধিয়া বেড়াইতাম।

এই সময় প্রায়ই তিনি আসিতেন। কখনও বা নীচে অফিসের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেন, কখনও উপরে উঠিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন। ভাইফোঁটার দিন একবার আসিয়াছিলেন। "জীবনস্মৃতি"র পাণ্ডুলিপিখানি চাহিয়া লইয়া গেলেন, কিছু পরিবর্দ্ধন করিবেন বলিয়া। তাঁহার ন'দির (স্বর্ণকুমারী দেবীর) বাড়ী ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

অল্পবয়স্কদের সঙ্গই যেন তাঁহাকে সর্ব্বদা বেশী আনন্দ দিত। ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে পাইয়া বসিত। দেবতাকে মানুষ যেমনভাবে ভক্তি করে ও ভালবাসে, সেই ভক্তি ও ভালবাসা মানুষ হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই পাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু দেবতার মত তিনি দুরধিগম্য ছিলেন না। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, এমন কি ছোট শিশুও তাঁহাকে নিকটতম আত্মীয় অপেক্ষাও ভালবাসিত। অথচ তাঁহার সামনে ছ্যাবলামি করিতে বা হুড়াহুড়ি করিতে অতি দুরন্ত ছেলেকেও কখনও দেখি নাই, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই আপনা হইতে মাথা ভক্তিতে নত হইত।

রিপন কলেজে এই সময় তাঁহার একটি বক্তৃতা হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা মেয়েদের বসিবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না। ইহার পরই তিনি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। যাইবার আগে প্রতিমা দেবী ও তিনি আমাদের বাড়ী একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

নবেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শিলাইদহে থাকিতেও বাবার কাছে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার খবর পাইতাম। আমাদের পাশের বাড়ীর দোতলায় তখন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা ও পত্নী বাস করিতেন, তাঁহাদের কাছ হইতেও রবীন্দ্রনাথের সংবাদ পাওয়া যাইত। অজিতবাবুর প্রথমা কন্যা তখন শিশু, তাহাকে লইয়া আমরা সারাদিন কাড়াকাড়ি করিতাম। মা তাহাকে 'পারুলদিদি' বলিয়া ডাকিতেন। সত্যই ফুলের মতই সে সুন্দর ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন তাহাকে দেখেন, তখন শিশু হাত বাড়াইয়া তাঁহার একটি আঙুল ধরিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এ যে দেখি এখনই পাণিগ্রহণ করছে।"

এই সময় রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একটি

পুত্র জন্মলাভ করে। মীরা দেবী ইহার পর কিছুকাল অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তখনও তাঁহাকে চোখে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহারই কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ভূমিকম্প হইয়া গেল।

কন্যার অসুস্থতার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসাতে আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। মীরা দেবীও ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

৪

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসটায় রাজা পঞ্চম জর্জ কলিকাতায় আসাতে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। তাহার উপর কংগ্রেসের একটি অধিবেশন এবং থীষ্টিক কন্‌ফারেন্সের (একেশ্বরবাদীদের সম্মেলনের) অধিবেশন প্রভৃতিও হইয়া গেল। শুনিলাম শেষোক্ত কন্‌ফারেন্সে একদিন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বক্তৃতা দিবেন।

পুরাতন সিটিকলেজ গৃহে এই কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। এখন সেই বাড়ীটিতে সিটি স্কুল হয়। বাড়ীটি পুরাতন, নড়বড়ে গোছের, সিঁড়িটিও সঙ্কীর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন শুনিয়া সেদিন যে কি বিপুল জনতা হইয়াছিল

তাহা, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই মনে করিতে পারিবেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল যে জনতার ঠেলায় এইবার জীর্ণ বাড়ীটি ধরাশায়ী হইবে, এবং আমরাও জীবন্ত সমাধি লাভ করিব। ভাগ্যক্রমে সেই দিনই আবার শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্যও ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। সেই তাঁহাকে আমি প্রথম দেখিলাম। ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন তিনি দেখিতে অনেকটাই অন্য রকম ছিলেন।

সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উল্লাল রঘুনাথাইয়া নামে কেরল দেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মনেতা। ইহার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার চেহারাটি অতি অমায়িক ও ভদ্র, চোখের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত, বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার যেন মৈত্রীর সম্পর্ক।

জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কোলাহলও প্রায় সাগরের গর্জ্জনের মত শুনাইতে লাগিল। শুনিলাম কবি আসিয়া পৌছিয়াছেন সপরিবারেই, কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভীড় ঠেলিয়া উপরে আসিতে পারিতেছেন না। কিছু পরে প্রতিমা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন কোনওমতে উপরে আসিয়া উঠিলেন। সভা হইতেছিল তিনতলার হলটিতে।

জনতার কোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া অনুষ্ঠাতারা সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। প্রথমে একটি গান হইল, তাহার পর সভাপতি উঠিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনার ভিতরেই প্রচণ্ড করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন। কখন করতালি দেওয়া চলে এবং কখন চলে না সে-বিষয়ে বাঙালী জনতা চিরকালই অজ্ঞ, ত্রিশ বৎসর আগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভাপতির পাশে আসন গ্রহণ করিলেন, সভার কাজ আবার আরম্ভ হইল। বিদেশী কয়েকজন ভদ্রলোকের বক্তৃতার পর কবি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঘরের ভিতর তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শোনা গেল, বাহিরে তখনও পূর্ণ বিক্রমে গোলমাল চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করিলেন। একটি গানের পর সভাভঙ্গ হইল। গান শেষ হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। জনতার কোলাহল কোনোদিনই তিনি পছন্দ করিতেন না, তবে চিরদিনই তাহা সহ্য করিয়াছিলেন।

প্রতিমা দেবীর নিকট শুনিলাম যে বিলাত-যাত্রা মার্চ্চ

মাসে হইবে বলিয়া কথা চলিতেছে, তবে রবীন্দ্রনাথ হয়ত একলাই যাইবেন। ভীড় এইবার কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই আমরা এবার নীচে নামিবার পথ পাইলাম। কবি দোতলার একটি ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন, পথ একেবারে সুগম না হইলে তিনি নামিবেন না শুনিলাম। সন্তোষবাবু প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের অনেককেই দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। গাড়ী পাওয়া গেল না বলিয়া আমরা এক দল হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

ইহার দুই-তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসও সেই সময় আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কবিবরের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনিলাম, মার্চ্চ মাসে তাঁহার যাওয়া একেবারে স্থির, passage পর্য্যন্ত book করা হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার সময়ও তিনি হাঁটিয়া যাইবারই উপক্রম করিতেছিলেন; চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি সামনে যে গাড়ীখানা পাইলেন, তাহাই ভাড়া করিয়া আনিলেন। গাড়ীটির ছাদ অতি নীচু, কবি হাসিয়া বলিলেন, "দু-তিন

পাট হ'য়ে কোনোমতে পৌঁছে যাব।" ইহার পরদিন তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

জানুয়ারী মাসে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইল। শুনিলাম মীরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যেই নিমন্ত্রণ, তবে সেই দিনই তাঁহার জন্মদিন ছিল কিনা জানি না। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার পুত্রটিকেও দেখিলাম। অনেকগুলি মহিলাকে দেখিলাম, অধিকাংশই ঠাকুর-পরিবারভুক্তা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে দেখিলাম। তাঁহার সৌদামিনী নাম সার্থক ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী টাউনহলে বিরাট সভায় কবি-সম্বর্দ্ধনা হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের আট মাস পরে এই সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

সেদিন আবার মাঘোৎসবের উদ্যান-সম্মিলনের দিন। দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া সারাদিনটাই হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। ভয় ছিল পাছে টাউনহলে গিয়া ভাল জায়গা না পাই। টাউনহলে পৌঁছিয়া দেখিলাম সৌভাগ্যক্রমে ভাল জায়গা তখনও অনেক খালি রহিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে মেয়েদের হাত দিয়া কবিকে পুষ্পঅর্ঘ্য প্রদান করা হইবে। পৌঁছিয়া

শুনিলাম ফুলও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফুলের গুচ্ছ হাতে করিয়াই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি সাঁচ্চা জরির স্তবকের মালা দেওয়া হইবে, তাহার পর মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তাহার পর পুরুষরা, এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আমরা গিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনও সভাস্থলে আসিয়া পৌঁছান নাই। জনতা কখনও নীরব থাকিতে পারে না, এক-একজন করিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় আর করতালির মহাঘটা পড়িয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি এই প্রকার করতালির ভিতর দিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। গোখলে মহাশয়কে কলিকাতা-বাসী অনেকেই দেখেন নাই, তাই তাঁহার প্রবেশের সময় মহা ঠেলাঠেলি লাগিয়া গিয়াছিল।

বিরাট্ টাউনহল যখন করতালির শব্দে টলিতে আরম্ভ করিল, তখন বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে বিষম ভীড়, মঞ্চের উপর আসিয়া না-বসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এক রকম দেখিতেই পাওয়া গেল না। তাহার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল ঐকতান বাদ্যের

দ্বারা। তখনও এত কোলাহল চলিতেছে যে অতগুলি বাজনার শব্দ তাহার ভিতরে ডুবিয়াই গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন সারদাচরণ মিত্র মহাশয়। তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, তখন সভাস্থ লোকেরা একটু স্থির হইলেন। তিনি বিদেশী অনেক কবির উদাহরণ দিয়া বলিলেন, কবিদের সম্মান নিজেদের দেশে প্রায়ই হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারা নিজেদেরই সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

অতঃপর পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য্য সংস্কৃতে স্বস্তি-বাচন করিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। রচনাটিও তাঁহারই। তাঁহার সেই আনন্দ-বিকশিত মুখ এখনও মনে পড়ে। কেমন জলদগম্ভীরস্বরে "কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন," বলিয়া শেষ করিলেন, তাহা এখনও কানে বাজিতেছে। কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচী রচিত একটি গান, তাহার প্রথম লাইন, "বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে," এই সভায় গীত হইল গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও একটি অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। সকলেই কবির শতায়ুঃ কামনা করিলেন।

কিন্তু মানুষের কামনা চিরকালই বিধাতার বিধানের কাছে হার মানে তাহা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুন্দর উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ভিতর একটি সোনার পদ্মফুল ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর কবিকে জরির স্তবকের মালা পরাইয়া এই ফুলটি উপহার দিলেন। সভার লোকেরা উপহারগুলি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হস্তিদন্তের ফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দনটি একবার উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি-প্রতিভা নাটক অভিনয় দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেইটি এতকাল পরে তিনি পড়িয়া শুনাইলেন এবং কবিকে উপহার দিলেন। কবিতাটি এই—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব বাল্মীকি-প্রতিভা দেখাইতে পুনর্ব্বার।

হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
"মণিময় ধূলিরাশি" খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি নিজেকে উপলক্ষ্যমাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া সেদিনকার সভায় প্রাপ্ত সকল সম্মান ও আদর জননীবাণী ও দেশের দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরে ডাক পড়িল মেয়েদের পুষ্প-অর্ঘ্য দিবার জন্য। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এইখানে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। তিনি লোকের ভীড়ে কিছুতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সামনে আনিয়া উপস্থিত

করিলেন। তিনিও কবির হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। সঙ্গীত ও ঐকতান-বাদ্যের পর সভাভঙ্গ হইল। প্রবল জয়ধ্বনির ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ী আগাগোড়া ফুলে সজ্জিত করা হইল। টাউনহলের একদিকে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফের ছোট একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাহাও গিয়া দেখিয়া আসিলাম।

জনতা যেমন বন্যাস্রোতের মত আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়াও গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই আমরা বাহির হইতে পারিলাম, এবং ট্রামে করিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। আমাদের দোতলার ঘরে আসিয়া বসিয়া আগের দিনের সভার অনেক গল্প তিনি করিয়া গেলেন। ভীড়ে আমাদের কোনও কষ্ট হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বড় তাড়াতাড়ি সব চুকাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কথার প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার ইচ্ছে ছিল দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলি, কিন্তু যে President, আমাকে যেন একেবারে engine-এ জুতে দিয়েছিলেন, এক মিনিটও কোথাও দাঁড়াতে দিলেন না। কোনোরকমে টেনে বের ক'রে দিলেন।"

ইয়ুরোপে গিয়া কিছুকাল নরওয়েতে বাস করিবেন বলিলেন। তাঁহার এক বন্ধু নাকি তাঁহাকে Land of the Midnight Sun দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাবাকেও আমাদের লইয়া বিলাত যাইতে বলিলেন। পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতে বাবাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের বলিলেন, "তোমাদের নিমন্ত্রণ রহিল পরিবেষণ করবার।" আমাদের কি একটা কারণে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ঘটিয়া উঠিল না।

এই বৎসর ১১ই মাঘ রাত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য হইবেন শুনিয়াছিলাম। ভাল জায়গা পাইবার লোভে অনেক আগে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদেরও আগে অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। অত বড় দালান, উপরের চারিপাশ ঘোরানো বারান্দা সব লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। পরিচিত লোক প্রচুর দেখিলাম। আমাদের স্কুলের দুই-তিনজন খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীকে সেখানে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা মনে আছে। তখন অল্প বয়সের বুদ্ধিহীনতায় বুঝিতে পারিতাম না যে রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ সমাজের সম্পত্তি নহেন।

ঠাকুরদালানটি বড়ই সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল।

উপরে প্রথমে চন্দ্রাতপ ছিল, পরে তাহা সরাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরা যেদিকে বসিয়াছিলেন, তাহার সামনা-সামনি উপাসনার স্থান, গানের ব্যবস্থাও সেইখানে। অনেকগুলি বিপুল বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইল, গায়করাও আসিয়া বসিলেন। গম্ভীর মধুর মন্দ্রে পূজার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে উপাচার্য্যরূপে আসিয়া বসিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশের ভার লইয়াছিলেন, স্বাধ্যায়ের ভার ছিল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর। উপদেশের পরে ছু-লাইন গান গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ করিলেন। গানগুলি যদিও অনেক নামকরা ওস্তাদরা গাহিলেন, তবু শুনিতে কিছু ভাল লাগিল না। রবীন্দ্রনাথ পিছন ফিরিয়া অনেক বার গানের সুর ও তাল সংশোধন করিয়া দিলেন, তাহাতেও সুবিধা হয় না দেখিয়া নিজেই গায়কদের সঙ্গে গান ধরিয়া দিলেন। "জীবন যখন শুখায়ে যায় করুণাধারায় এস", এই গানটি প্রথম শুনিলাম সেই দিন, আর শুনিলাম "জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।" এই মহাসঙ্গীতটি কয়দিন আগেই রচিত হইয়াছিল।

উপাসনার পর কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। বাহির হইবার পথ আর কিছুতেই পাই না, এত লোকের ভীড়। অবশেষে উপরে উঠিয়া গেলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তখনও ১১ই মাঘ রাত্রে বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো হইত। অনু-রোধে পড়িয়া কিছু জলযোগও করিতে হইল। পাশের ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোকের খাওয়ার তত্বাবধান করিতেছেন দেখিলাম, এতগুলি মেয়েকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রশান্তচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা কে?" পরিচয় পাইয়া সাস্মিত মুখে দুই-চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

১২ই মাঘ রাত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন। এখানেও এত অধিক জনসমাগম হইল যে উদ্যোক্তারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কবিকে হলের ভিতরে আনা ও বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াও এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বক্তৃতান্তে কোনও মতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গিয়া তিনি কিছুক্ষণ মহলানবীশ মহাশয়ের বাড়ীতে বসিলেন। সেখানেও অবিলম্বে ভীড় জমিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া, কন্যা ও পুত্রবধূকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। সেদিন একলাই আসিয়াছিলেন। বাবা কি কারণে নীচে আটকাইয়া পড়িলেন, কবি উপরে আসিয়া আমাদের সঙ্গেই গল্প করিতে লাগিলেন। পাড়ার আর দুই-চারিটি মেয়েও আসিয়া জুটিল। আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক আসিয়া খানিকক্ষণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয় তাঁহার সঙ্গে গল্প করিয়া গেলেন। দিদির তখন আই-এ পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহারই উল্লেখ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "শান্তা পরীক্ষার চোটে শুকিয়ে গেছে।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ। আমি কিন্তু ঐ পরীক্ষা জিনিষটার থেকে খুব উৎরে গিয়েছি, যদি পুনর্জন্ম থাকে তাহলে হয়ত আমার কাছ থেকে সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেবে।"

বিলাত-যাত্রার গল্প আজও হইল। প্রথমে হয়ত তিনি ফ্রান্স যাইবেন বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম কতদিন তিনি ইউরোপে থাকিবেন। বলিলেন, "কি জানি, এক বৎসর প্রায় হবে বোধ হয়। যদি গিয়ে দেখি যে ভাল লাগছে না, তাহলে হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। শেষ যেবারে গিয়েছিলুম, সেবার আমার term ফুরাবার আগেই চলে এসেছিলুম। তবে এবার বয়স ঢের বেশী হয়েছে, একটু স্থির হয়ে বসে দেখার ইচ্ছে হতে পারে।"

জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি আমি নকল করিয়া প্রেসে দিতাম, যাহাতে আসল লেখাটি পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাসের কিস্তি নকল হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম "হ্যাঁ।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটাতে কি হয়েছে? আমি বিলেত গিয়েছি?" বলিয়া হাসিয়া বলিলেন "এবারেও চৈত্রে বিলেত যাচ্ছি। বিলেতের চিঠি দেখতে পাবে তোমরা, যদি অবশ্য চিঠি লিখি।" জীবনস্মৃতি আরও খানিকদূর লিখিবার জন্য অনুরোধ করায় বলিলেন, "বিদ্যালয়ের ছাত্র আর অধ্যাপকদের কাছে মুখে মুখে আরও খানিকটা বলেছিলুম, সন্তোষ সেটার নোট্ রেখেছিল, যদি তার থেকে সহজে লিখবার কোনো material পাই, তাহ'লে আবার লিখতে পারি।"

ইহার মধ্যে একটি বালিকার নিকট হইতে গান গাহিবার অনুরোধ আসিল। অনুরোধ রক্ষা না করা তখন তাঁহার স্বভাবেই ছিল না। যদিও বালিকার দিকে ফিরিয়া একবার বলিলেন, "আমি কি আর এখন গাইতে পারি গো?", তবু একটি গান গাহিয়া শুনাইয়াও দিলেন। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে," এই গানটি গাহিলেন। গান শেষ করিয়া বলিলেন, "একবার জগ-

দীশের বাড়ী ঘুরে আসি।" বলিয়া নামিয়া নীচে চলিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, আমি লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম। সদর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "এবারে আমাকে আলোটা দাও।" তাঁহাকে অবশ্য দিলাম না, দাদার হাতে আলো দিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাঁহার বিলাত যাত্রা উপলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তের দল বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করিয়া কবিকে দেখাইলেন। শুনিলাম তাহা খুব ভাল হইয়াছিল। দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। মেয়েরাও একদল "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য তিনি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলেন মার্চ্চ মাসের প্রথম দিকে।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে তাঁহাকে দিয়া একদিন উপাসনা করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহার নিকটেই এ খবরটা পাইলাম। Mr. Myron Phelps নামক এক আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে

গল্প করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার গল্পও কিছু শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ভদ্রলোক নিজে কোনো কথা ত বললেই না, তার উপর আমি যা কিছু বললুম, তা নোট বুকে টুকে নিলে। আমার সমস্ত কথা যখন ফুরিয়ে গেল, তখন আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলুম, ভাবলুম দেখি এখনও কিছু বলে কি না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে কথা বললেই না, শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ত তখন বাঁচলুম। বাস্তবিক এক তরফা conversation-এর মত কষ্টকর আর আমার কাছে কিছু লাগে না।" এ কষ্ট তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহাদের ভিতর অধিকাংশই তাঁহার কথা শুনিতেই যাইতেন, নিজেরা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিতেন না।

ইহার মধ্যে একদিন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি বলিয়াছেন, "আমিও পিতামহের মত ঐখানেই থেকে যাব।" শ্রোতারা একথা শুনিয়া প্রচণ্ড আপত্তি করাতে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, "না না, ফিরেই আসব, এখনও আমার এখানে অনেক কাজ বাকি আছে।"

ইহার পরেও যে প্রায় ত্রিশ বৎসর আমাদের মধ্যে ছিলেন, সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি লইয়াই আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে যুগযুগান্তর কাটাইতে হইবে। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে এমন কাহাকেও বিধাতা আর পৃথিবীতে পাঠাইবেন কি? আশা হয় না।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে উপাসনা করা বোধ হয় সেবার সম্ভব হইল না। ১৫ই মার্চ্চ সেখানে একটি আলোচনা সভা হইল। বাবা সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান বক্তা। এই সভাটি ছাত্র সমাজের উদ্যোগে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেই যে বিপুল জনতা উপস্থিত হইত, তাহা আলোচনা অসম্ভব করিয়া তুলিত। সুতরাং এই সভার কোন বিজ্ঞাপন বাহিরে দেওয়া হয় নাই। তবু যখন সভাস্থলে গেলাম, তখন হল পূর্ণই দেখিলাম। অবশ্য গেট্ ভাঙা বা জানালা ডিঙাইয়া ভিতরে ঢোকা, এগুলি আর এবার দেখিতে হইল না। সভার আরম্ভে আমাদের পাড়ারই এক তরুণী গান গাহিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামনে গান গাহিতে হইবে শুনিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং অর্গ্যানের শব্দই আমরা শুনিলাম, গান আর কিছু কানে আসিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ছোট একটি

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার পর আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত হীরালাল হালদার, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি প্রবীণ ভদ্রলোক কয়েকজন কিছু কিছু বলিবার পর ছাত্রসমাজের তৎকালীন সভ্যরাও দুই-তিন জন বলিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইল তাহাতে মনে হয় ভাল করিয়া প্রস্তুত না হইয়া এ চেষ্টাটা তাঁহারা না করিলেই পারিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক জায়গায় হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, দেখিলাম। ৯টা বাজিয়া যাইবার পর বাবা আলোচনা থামাইয়া দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিতে উঠিলেন। খুব মৃদু কণ্ঠে কথা বলিলেন, পিছনের অনেকে শুনিতে পাইল না। ৯॥ টার পর তিনি সভা ত্যাগ করিলেন।

১৬ই মার্চ্চ ওভারটুন্ হলে তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম, "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"। পাড়ার কয়েকজন মেয়ে দল বাঁধিয়া বক্তৃতাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চারুচন্দ্র পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং ভাল বসিবার জায়গা জোগাড় করিয়া দিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা কোনও জায়গা করা হয় নাই, সামনের লাইনের চেয়ারে গিয়া আমরা বসিলাম। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

convocation ছিল বলিয়া অনেকেই বেশ দেরি করিয়া আসিলেন দেখিলাম। সভাপতি হইয়াছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। তিনি কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। খুব একচোট করতালির ঘটা পড়িয়া গেল। প্রতিভা দেবীকে এই প্রথম দেখিলাম।

অল্পক্ষণের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌছিলেন, এবং সভার কাজ আরম্ভ হইল। সভাপতি মহাশয় কেন যে ইংরেজিতে কথা বলিলেন তাহা তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়াই প্রবন্ধটি পড়িলেন। মাঝে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসাতে খানিক গোলমাল হইল, কবি কয়েক মিনিটের জন্য থামিয়া গেলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসিলে পর আবার আরম্ভ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনা হইবে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সভাপতি বলিলেন যে তাঁহারা যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহার উপর আর কোনও আলোচনা চলে না। কয়েক-জন ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রথম হইতেই মনে হইতেছিল যে

জিহ্বা শানাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর "নায়ক" পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে আছে। ইঁহাদের ক্ষুণ্ণ মুখ দেখিয়া হাসি পাইতেছিল। সভপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন, যদিও ইহাও বলিয়া লইলেন যে বেশী প্রশংসা করা তাঁহার সাজে না, কারণ তিনি রবীন্দ্র-নাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং পরদিনই বিলাত যাত্রা করেন। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও সেবার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলকে তিনি কবিবরের শুভযাত্রা ইচ্ছা করিতে অনুরোধ করিলেন। খুব করতালি-ধ্বনি হইল। স্যার গুরুদাস বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া একটি সরস ছোট বক্তৃতা করিলেন। তাহার পরে বলিলেন চুনীলাল বসু মহাশয়।

বক্তৃতা শেষ হইবার পর বাহিরে আসিলাম। রবীন্দ্র-নাথও বাহিরে আসিয়া প্রবন্ধটি বাবাকে দিলেন। বলিলেন, "অনেক কাটাকুটি আছে, চারুকে একবার ভাল ক'রে দে'খে দিতে বলবেন।"

ইহার পরদিনই বোধ হয় ভবানীপুর সম্মিলন-সমাজে

তাঁহার উপাসনা ছিল। এখন সম্মিলন-সমাজ মন্দির যেখানে, তাহারই নিকটে আর-একটি বাড়ীতে তখন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভোরে উঠিয়া ট্রামে করিয়া ভবানীপুর গিয়াছিলাম। পরিচিত অনেক লোককে ট্রামে দেখিলাম। মন্দিরে গিয়া বসিবার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। সেদিন তাঁহাকে বড়ই অসুস্থ দেখাইতেছিল, ভাবিলাম হয়ত বেশী পরিশ্রমে এইরূপ হইয়াছে। তাহার পরদিনই তাঁহা-দের বিলাত যাত্রা করিবার কথা। সকাল হইতে মেঘলা, খানিক ঝড়বৃষ্টিও হইয়া গেল, মনও যেন কেমন মুষড়াইয়া গেল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। আমরাও বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন ভোরবেলাই দাদা বাহির হইয়া গেলেন, বাবাও গেলেন কিছু পরেই। ঘরে বসিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণে জাহাজে উঠিতেছেন বোধ হয়। কিছু পরে বাবা ও দাদা ফিরিয়া আসিলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টীমার-ঘাটে কি খুব লোক হয়েছিল?" উত্তরে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের যাওয়াই হয় নাই। আগের রাত্রে বালীগঞ্জে এক পার্টিতে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত হয়, সারারাত তাহার পর আর ঘুমাইতে পারেন নাই। সকালে যখন

যাত্রার সময় আসিল, তখন দেখা গেল যে তিনি এত অসুস্থ যে কোনোক্রমেই সেদিন আর তাঁহার যাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কিছু সুস্থ বোধ করিলে দিন-দুই পরে মাদ্রাজে গিয়া তিনি জাহাজ ধরিতে পারেন। সমস্ত দিন তাঁহার খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম এবং নানা রকম আশঙ্কাজনক কথা শুনিতে লাগিলাম। বিকালে সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত দেখা হইল, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে চিকিৎসকগণ সাত দিন অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হওয়া বা কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দেশসুদ্ধ মানুষ তাহাদের প্রিয়তম কবির এই অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদে যেন মুহ্যমান হইয়া গেল।

পরদিন শুনিলাম তিনি কিছু ভাল আছেন, এবং ডাক্তারদের কথা না শুনিয়া বই-খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। বারণ করিলে বলিতেছেন, "কথা বললে বল, 'কথা বলছ কেন?' চুপ ক'রে থাকলে বল, 'অত ভাবছ কেন?' তাহলে আমি করি কি?"

তাঁহার যাত্রায় বাধা পড়া সম্পর্কে নানা রকম গল্প শুনিতে লাগিলাম, কিছু সত্য, কিছু গুজবও হইতে পারে। শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের অসুখটা কতখানি সাঙ্ঘাতিক তাহা

লইয়াও ডাক্তারদের ভিতর প্রচুর মতভেদ হইয়া গিয়াছে। একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ বলিয়াছেন, "প্রায় Appoplexyর মত, এক মাস তাঁর নড়াচড়া করা একেবারেই চলবে না।" একজন এলোপ্যাথ বলিয়াছেন, "কিছুই বিশেষ হয় নি, খানিকটা brandy খাইয়ে জাহাজে তুলে দাও।"

তাঁহার অসুখ যেমনই হইয়া থাকুক, বিলাতযাত্রা কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া গেল। রোজই তাঁহার খবর সংগ্রহ করিতাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে যাইবার অনুমতি কাহারও ছিল না। কখনও শুনিতাম ভাল আছেন, কখনও শুনিতাম তেমন ভাল নাই। কয়েক দিন পরে যখন চারুচন্দ্রের কাছে তিনি "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"র প্রুফ চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলাম নিশ্চয়ই খানিকটা ভাল তিনি আছেনই। ভাল না থাকিলেও কাজ না করিয়া থাকিতে তিনি একেবারেই পারিতেন না, ইহা পরে দেখিয়াছিলাম। রোগ এবং শোক, এই দুইয়েরই ঔষধ ছিল তাঁহার কাজ।

কয়েকদিন পরে বাবা একবার গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম না করিয়া সব কাজই করিতেছেন। এমন কি আশুতোষ

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী গিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভা"র গান এবং অভিনয় শিখানোও চলিতেছে। তবে দুই-তিন দিনের ভিতর তিনি শিলাইদহ চলিয়া যাইবেন, সেখানে বাধ্য হইয়া খানিকটা বিশ্রাম তাঁহাকে করিতেই হইবে। দিন-দুই পরে তিনি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন।

বিলাতযাত্রার ধুয়া সমানে চলিতে লাগিল। রোজই প্রায় তাঁহার যাত্রার একটা না একটা তারিখ শুনিতাম, আবার এমন-সব লোকের কাছে শুনিতাম যে অবিশ্বাস করিবারও উপায় থাকিত না। মধ্যে বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আসিল, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "মাথাটা এখনও নলিনীদলগতজলবত্তরলং টল্‌মল্‌ করিয়া উঠে।"

কিছুকাল শিলাইদহে থাকিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার পথ কলিকাতা হইয়া, সুতরাং এক দিন কলিকাতা বাস করিয়া গেলেন, তবে আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম না। বাবার কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি শান্তিনিকেতনে যাইতেছেন, এবং সকলকে সেখানে যাইতেও নিমন্ত্রণ করিলেন।

নববর্ষের উৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। কয়দিন পরে

শৈলবালার চিঠিতে জানিলাম যে ১০ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনে "রাজা ও রাণী" অভিনয় হইবে। দিন-দুই পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তখন যাহা কিছু বাধাবিপত্তি ছিল তাহা প্রায় গায়ের জোরে দূর করিয়া সকলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এবারের দলটি বিশেষ বড় হইল না।

ট্রেনে শান্তিনিকেতন-যাত্রী আরও দুই-চারটি মানুষের দেখা পাওয়া গেল। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম রীতিমত ঝড় বহিতেছে, তবে বৃষ্টি নাই। সুতরাং হাঁটিয়াই চলিলাম। এবারেও থাকার জায়গা হইয়াছিল নীচু বাংলায়। সেখানে ঢুকিয়া দেখিলাম অভিনয়ে যাঁহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁহাদের সাজাইতে গিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমাদের আগমন-সংবাদ গেল, তিনি খানিক পরেই ফিরিয়া আসিলেন। খাইয়া-দাইয়া অভিনয় দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল, সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। খাওয়া শেষ করিতে একটু দেরি হইয়া গেল, বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র আসিয়া খবর দিলেন যে গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা খাওয়া ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িলাম, এবং একরকম ছুটিতে ছুটিতে নাট্যঘরে আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। বাবা এবং প্রশান্তচন্দ্রের তখনও খাওয়া হয় নাই, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারিলেন না।

অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেবদত্ত এবং বিক্রমদেব কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। দেবদত্ত সাজিয়াছিলেন ক্ষিতিমোহনবাবু এবং বিক্রমদেব সাজিয়াছিলেন অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তী। রবীন্দ্রনাথ তখনও অসুস্থ, সেই জন্য তিনি এবার অভিনয়ে যোগ দেন নাই। সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন কুমার সেন। মহিলাদের ভূমিকায় ছাত্র-রাই বোধ হয় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কাহারও নাম মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বসিবার জায়গার সামনেই বসিয়াছিলেন। ঘরটি তখন প্রায় অন্ধকার, আলো যেটুকু তাহা ষ্টেজের পাদপ্রদীপ হইতেই আসিতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তবে এইটুকু বুঝিলাম যে অসুখের জন্য অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতদূরে বসিয়াই তিনি একরকম রঙ্গমঞ্চের কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর গোলমাল করার জন্য একবার একটি ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিলেন, ভুল সময়ে যবনিকা ফেলার জন্য আর একবার দুজন ছাত্রকে

বকিলেন। তিনিও যে বকিতে পারেন, ইহা সেই আমরা প্রথম দেখিলাম।

অভিনয়ান্তে বাহির হইয়াই ক্ষিতিমোহনবাবু ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। ক্ষিতিমোহনবাবু তখনই প্রস্থান করিলেন, বলিলেন, "যাই, একবার নারায়ণীর খবর নিয়ে আসি।" সন্তোষবাবুও চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলাম তিনি সত্যই অনেক রোগা হইয়া গিয়াছেন, গায়ের রংও ম্লান দেখাইতেছে। তিনি তখনও অতিথিশালার বাড়ীতে বাস করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেইখানে গিয়া উঠিলাম। বাবা অভিনয় দেখার তাড়ায় খাইয়া আসেন নাই শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার আনিতে বলিলেন, এবং নিজেও সেই সঙ্গে বসিলেন। খাইতে খাইতে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল।

আমার ছোট ভাই মুলু এবার আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কোথায় শুইবে সেই প্রশ্ন উঠিল। মুলুর অতিথিশালার বাড়ীটি বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রথমে সেইখানেই বাবার সঙ্গে শুইতে চাহিল। শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "ও বেশ বোঝে যে খাবার বেলা নীচু বাংলা ভাল, কিন্তু শোবার পক্ষে ভাল এই বাড়ীটা।"

মুলু কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে নীচু বাংলাতেই ফিরিয়া আসিল, বোধ হয় গল্প করার লোভে।

পরদিন সকালে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিলাম, সুতরাং তাড়াতাড়ি করিয়া শুইতে গেলাম, যাহাতে সময় মত উঠিতে পারি। অবশ্য সারারাত ভাল করিয়া ঘুম না হওয়ায় যত ভোরে উঠিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা পারি নাই। যাহা হউক, সকালেই উঠিলাম এবং একেবারে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে বলিয়া গেলাম যে ঘণ্টা শুনিলেই আমরা মন্দিরে চলিয়া যাইব। রাস্তায়, বাগানে, মাঠে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মধ্যে সন্তোষবাবু ও অন্যান্য অধ্যাপকদের বাড়ীও অল্পক্ষণের জন্য ঘুরিয়া আসিলাম। এই সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা শুনিতে পাইয়া সকলে মিলিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলাম।

দিনের আলোয় রবীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার চেহারা কতখানি খারাপ হইয়াছে, অসুখটা নিতান্ত সামান্য হয় নাই। অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির জোরেই তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন। উপদেশের সময় তিনি বিদ্যালয়ের সকলের কাছে বহু-

কালের মত বিদায়-প্রার্থনা করিলেন শুনিয়া একটু বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলাম। বুঝিলাম আবার বিদেশযাত্রার ইচ্ছাটা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে।

উপাসনার পর তিনি বেশীক্ষণ না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। অসুস্থ ছিলেন বলিয়া এবারে তাঁহাকে অন্যান্য বারের মত ঘোরাঘুরি করিতে দেখিলাম না। আমাদের সেই দিন বিকালের গাড়ীতেই যাইবার কথা, কিন্তু আশ্রমের সকলেই বার বার করিয়া এই দিনটা থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখনই অবশ্য কিছু স্থির হইল না। নীচু বাংলায় ফিরিয়া জলযোগাদি সারিয়া আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর যখন রোদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তখন নীচু বাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। সন্তোষ-বাবুর পত্নী ও ছোট বোনগুলি আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে ছিলেন, তাঁহারাও বাড়ী ফিরিলেন। কবির কাছে আর একবার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি তখন অধ্যাপক-সভায় ব্যস্ত আছেন শুনিয়া আর গেলাম না। খাইয়া-দাইয়া দুপুর বেলাটা ঘরের ভিতরেই কাটাইয়া দিলাম। রোদ তখন এত ভয়ানক যে বাহিরে যাইবার ভরসা হইল না। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সঙ্গে নানা

বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময়টা আনন্দেই কাটিয়া গেল।

তখনও স্থির ছিল যে আমরা সন্ধ্যার ট্রেনে চলিয়া যাইব। জিনিষপত্র সব গুছাইয়া রাখিয়া অতিথিশালার দিকে চলিলাম বিদায় লইবার জন্য। ঢুকিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নামিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আমাদের সকলের পরিচয় দিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনই চলিয়া গেলেন।

দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম মাঝের বড় ঘরখানিতে রবীন্দ্রনাথ, বাবা এবং রথীবাবু বসিয়া আছেন। তাঁহাদের তখন খাওয়ার আয়োজন চলিতেছে। আমরা অন্যদিকে বসিয়া নিজেরা গল্প করিতে লাগিলাম। খাওয়ার পর কবি আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "এবার অনেক নূতন গান লিখেছি, অজিতের কাছে শুনো।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কাজ করিতেন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। অধ্যাপকরা একদল বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময় রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। কবি বলিলেন, "কি সব লুচিমণ্ডার লোভে চলেছ? মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ।"

নানা প্রয়োজনে তাঁহার কাছে ক্রমাগতই লোক আসিতেছে দেখিয়া আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুলু এবং আমাদের সঙ্গিনী একটি বালিকা খুব ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। খানিক পরে নামিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছাদে দেখছি তোমরা কৃত্রিম মেঘগর্জ্জনের সৃষ্টি করেছিলে। করছিলে কি তোমরা? ছাদেই সাঁতার দিচ্ছিলে নাকি?"

আবার কিছুক্ষণ Mr. Myron Phelps-এর গল্প হইল। রবীন্দ্রনাথ মধ্যে স্থির করিয়াছিলেন যে শিলাইদহে কতকগুলি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া তাঁহার একদল বন্ধুবান্ধবকে সেখানে লইয়া যাইবেন। তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমার চরে কুঁড়ে বাঁধার প্ল্যান্ ত গেল, বিলেত যাওয়ার এক মিথ্যা হুজুকে সব মাটি হ'ল।"

শিলাইদহে বোটে বেড়ানোর এবং সাঁতার দিবার খুব সুবিধা। কবি বলিলেন, "আমি ছেলেবেলা খুব সাঁতার দিতে পারতুম, তোমরা কেউ সাঁতার জান?" একজন মেয়ে বাদে সবাই বলিল, "না।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বৌমার কিন্তু খুব সাহস আছে। সাঁতার দিতে না জানলেও তিনি life-belt প'রে দুবার এপার-ওপার হলেন, অন্য মেয়েরা কেউ জলে নামতেও চাইলে না।"

এই সময় বেশ জোরে ঝড় উঠিল। আমরা আবার ছাদে উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আর তোমাদের ধ'রে রাখে কে ?" একজন ছাত্র সেখানে বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিতে লাগিল, দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যখন বালিগুলো চোখে ঢোকে, তখনই বুঝি কেন 'চোখের বালি' লিখেছিলুম।"

খানিক পরে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম। দুতলার মাঝের ঘরে তখনও তিনি বসিয়াছিলেন। আরও দুই-চারজন আসিয়া জুটিলেন। চুঁচুড়ায় ঠিক ইহার পূর্ব্বে একটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনেক গল্প হইল। সুরেশ সমাজপতি মহাশয় কি রকম কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা করিলেন। কে একজন অক্ষয়বাবু নাকি চুঁচুড়ার রক্ষণশীলতা প্রমাণ করিবার জন্য বক্তৃতার ভিতর বলিয়াছিলেন যে কেশবচন্দ্র সেন সেখানে ১২২ বার আসিয়াছিলেন, কিন্তু একজনকেও ব্রাহ্ম করিতে পারেন নাই। এই গল্পটি অন্য কে একজন বলিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "১২২ বার! এ যে একেবারে অচলায়তন।" তখনকার দিনের সাহিত্যিকদের বিষয় খানিক আলোচনা হইল।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই দুইজনের লেখার রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করিলেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর বর্ণনাশক্তির খুব প্রশংসা করিলেন, তাঁহার কন্যাকে আমরা চিনি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কবির বন্ধু লোকেন পালিত বাঁকুড়ার জজ্ হইয়াছেন, তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধুকে সেখানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন শুনিলাম। বাবা বলিলেন, "বেশ ত, চলুন না?" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন ত শিলাইদহ যাচ্ছি, দেখি পরে যদি হয়।"

ইহার পর আসিল গানের অনুরোধ। তিনি পূর্ব্বের মত বলিলেন, "ও, এতক্ষণ এই পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি?" অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর খোঁজ করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে আমার দ্বারা যতটা হয় তাই শোন। আমার কিন্তু ঢের ভুল হবে। আমি গান কাউকে শিখিয়ে না রাখলে সুরই ভুলে যাই। যতদিন দিনু এখানে ছিল, বেশ সুবিধে ছিল।" অন্য ঘর হইতে তিনি গানের খাতা লইয়া আসিলেন, এবং পরে পরে অনেকগুলি গান গাহিলেন। একটি গান মনে আছে, "তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে।" গানগুলি একটি খাতায় তুলিয়া আনিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি গান গাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তোমাদের ক্লান্ত লাগছে না ত? সব সময় আবার গান শুনতে ভাল লাগে না।" তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করা হইল, তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্রামের কিছু দরকার নেই।"

রোদ পড়িয়া গেলে বাহির হইয়া নীচু বাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। জলযোগের পর বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইল। সাথী জুটাইতে গিয়া খানিক দেরি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া অনেক দূর বেড়াইয়া আসিলাম। বোলপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে কোপাই বলিয়া একটি ছোট নদী আছে, তাহাই ছিল আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু পথ-প্রদর্শক দুইজন থাকাতে অনেকবার ভুল পথে গিয়া ভ্রমণটা বড়ই দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দু-একজনের জলপিপাসা পাওয়ায় আরও বিপদ্ বাড়িল। ভাগ্যে চাঁদের আলো প্রচুর ছিল, না হইলে অন্য প্রকার বিপদ্ও ঘটিতে পারিত। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর কোপাইয়ে অবশ্য পৌঁছিলাম, কিন্তু অতিশয় ক্লান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বেশ রাত হইয়া গেল। রাত্রে ঘুম অল্পই হইল। শেষ রাত্রে উঠিয়া ট্রেন ধরিবার জন্য রওনা হইলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছেলেও এই সঙ্গে গেল। ট্রেনে অসম্ভব ভীড়, এক রকম দাঁড়াইয়াই সারাপথ কাটাইয়া দিলাম।

এপ্রিল মাসের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতায় আসিলেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে সেদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া, বাবার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলেন। নূতন কিছু নিয়ম করিতে চাহিলেই কতদিক্ দিয়া বাধা আসে তাহাই বলিতেছিলেন। অনেক ছেলেকে অধ্যাপকরা দুষ্টামির জন্য তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিজের দায়িত্বে রাখিয়াছেন, এবং কখনও তাহাতে কুফল হয় নাই। ছেলেদের বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং তাহাদের জামিন হইতেছেন, ইহার পর তাহারা আর কোনও অপরাধ করে নাই। কথায় কথায় বলিলেন, "এ সব ত এক রকম গড়ে তুলেছি, এখন আমি চলে গেলে সব ঢিলে না পড়ে যায়। আপনি যখন ওখানে যাবেন, সব একটু দেখে আসবার চেষ্টা করবেন।" আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাদের যাওয়া আবার স্থির হয়ে গেছে, ২৯শে যাব। বৌমা, রথীও যাবেন। বারবার আমাকে নিয়ে এক ঠাট্টা চলবে না, এবার যাবই। স্কুল যখন খুলবে একবার গিয়ে দেখে এস আমাদের ছেলেদের খাওয়াটা, খুব আনন্দ করে তারা খায়, নিজেরা আবার কত রকম ফরমাস করে।" আর এক জায়গায় যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

বিলাত যাইবার আগে তাঁহার সঙ্গে যে আর দেখা হইবে তাহা আশা করি নাই, কারণ আমাদেরও কয়েক দিনের মধ্যে দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবার কথা হইতেছিল। কিন্তু ৪ঠা যে সকালে বাবার কাছে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে শুনিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ তখনও কলিকাতায় আছেন, এবং সন্ধ্যাবেলা আমাদের এখানে আসিবেন।

সেদিন গোখলে মহাশয়ের Elementary Education Bill সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। বিপিনচন্দ্র পালের দল ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আমাদের দেশে যদি এখন শিক্ষাবিস্তারের কোনো উপায় থাকে ত ঐ একমাত্র।" ইহার কিছুদিন আগে টাইটানিক জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল, জলে ডুবিয়া যাঁহারা মারা যান, তাঁহাদের অসাধারণ শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, "এই জিনিষটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ছোট একটা নৌকাডুবি হ'লেও ভীরুতার যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, তা শোচনীয়। আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কোথাও খুব বড় একটা গলদ থেকে গিয়েছে, তা না হলে এরকম হ'ত না। একথা বললে লোকে রাগ করে, কিন্তু বাস্তবিকই বলবার সময়

এসেছে।” তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, “আমি এখন পালাই, কিছু এখনো গোছানো হয়নি, সব ঠিক করে নিতে হবে।” বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এবার বোধ হয় আর আপনি যাত্রার আগে বেশী সময় থাকতে কলকাতায় ফিরছেন না?” রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “এবার ঠিক দুদিন আগে আসব, আর কাউকে কিছু করবার অবসর দিচ্ছি নে। আর লোকেরাও এবারে বেশ বুঝে নিয়েছে যে আমার ক্ষমতা কতখানি।” তিনি চলিয়া গেলেন। আমরাও ইহার দুই-তিন দিনের ভিতর দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলাম।

১৫ই কিম্বা ১৬ই মে তিনি শিলাইদহ হইতে বাবাকে একখানি চিঠি লেখেন এবং “জীবনস্মৃতি” এক কিস্তি ডাকে আমার নামে পাঠাইয়া দেন। আমি পাণ্ডুলিপিটি রাখিতেছি তাহা শুনিয়াছিলেন, তাই আমার নামে মনে করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে নাম ও ঠিকানা লেখা খামখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিলাম। চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, তিনি ১০ই জ্যৈষ্ঠ বোম্বাই যাত্রা করিবেন। কয়েক দিন পরে চারুচন্দ্রের পত্রে তাঁহার যাত্রার খবর পাইলাম। ইংল্যাণ্ডে পৌছিবার পর চিঠিপত্র খুবই কম আসিত, তবু মধ্যে মধ্যে খবর পাইতাম। সর্ব্বত্রই

যে তিনি অতিশয় সমাদর ও সম্মান পাইতেন, ইহা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম, গর্ব্বও অনুভব করিতাম অনেকখানি।

এই সময় "রোগীর নববর্ষ" লেখাটি 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। আমি স্বয়ং তখন রোগে ভুগিতেছিলাম, তাই লেখাটি যেন বিশেষ একটি অর্থ লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও তাঁহার বিলাতের চিঠি মধ্যে মধ্যে বাহির হইত। বাবার কাছে যখনই পত্র আসিত, তখনই আমাদের দুই বোনকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইতেন।

জীবনের ওপার হইতেও এই আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য মন কাঙাল হইয়া থাকে। কিন্তু আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিবে কে?

৫ই সেপ্টেম্বর দাদা বিলাতে চলিয়া গেলেন। লণ্ডনে ও ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কারণ ইহার পরের চিঠিগুলিতে প্রায়ই দাদার উল্লেখ থাকিত। সন্তোষবাবু কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিলেন, তাঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক খবর পাইলাম। শুনিলাম আশ্রমে প্রায়ই চিঠি আসে, খুব বর্ণনাবহুল চিঠি। প্রতিমা দেবী তখন ইংরেজী

ভাল জানিতেন না, তবু জাহাজসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, দুই-তিনটা ভাষার সাহায্যে,—ইহাতে কবি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র আসিত, তাহাও দেখিতাম। লণ্ডনের সাহিত্যিক জগতে যে তাঁহার উপস্থিতি খুব প্রচণ্ড বিস্ময়ের ঢেউ তুলিয়াছিল, তাহার খবর নানা দিক্ দিয়া আসিত। ইংরেজী গীতাঞ্জলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে শুনিয়াছিলাম। তিনি যাওয়াতে লণ্ডনে যে রকম সাড়া পড়িয়াছিল তেমন ব্যাপার সেখানকার সম্পাদকদের নাকি আর মনে পড়ে না। তাঁহার সম্বন্ধে William Rothenstein লিখিয়াছিলেন, "He stands easily the first poet of the world"। তাঁহার গৌরবে বাঙালী মাত্রই গৌরবে আত্মহারা হইত, তাহা বালিকা বয়সেও বুঝিতাম। Rothenstein যখন প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন, তখন খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে আঁকা যায় না।"

২১শে সেপ্টেম্বর বোধ হয় চারুচন্দ্রের কাছে কবির এক-খানি চিঠি আসে, সেটি তিনি আমাদের দেখিবার জন্য উপরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রের শেষে ছিল,

"রামানন্দ-বাবুকে আমার নমস্কার দিও এবং শান্তা-সীতাকে বোলো যে এই দৈত্যপুরীর সদর রাস্তার সামনে ব'সে তাদের শীর্ণ নিভৃত গলিটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

এই সময় আমরা দুই বোনে মিলিয়া একটি উপকথার বই বাহির করি, বইটির নাম, "হিন্দুস্থানী উপকথা"। একখানি বই লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। উত্তরে তিনি ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমার অতি দুর্ভাগ্য যে, চিঠিখানি হারাইয়া গিয়াছে। তাহার একটি লাইন কেবল মনে পড়ে। বইখানার ভিতর "সহানুভূতি" কথাটা ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন "সহানুভূতির উপর আমার বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই।"

ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রথম প্রকাশিত হইল, ইণ্ডিয়া সোসাইটির জোগাড়েই বোধ হয়। আমাদের দুই বোনের নামে একখানি বই আসিয়াছিল। সাদা রেশমে বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা, বইটি দেখিতে ভারি সুন্দর হইয়াছিল।

ইংল্যাণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় চলিয়া যান। Urbanaতে কিছুকাল ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। প্রতিমা দেবী সেখানে কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন বলিয়া

খবর পাওয়া গেল। শুনিলাম তাঁহারা আরও দুই বৎসর থাকিয়া তবে দেশে ফিরিবেন। আবার পরে শুনিলাম জুলাই আগষ্ট মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিবেন।

অবশেষে ১৯১৩র সেপ্টেম্বর মাসে সত্যই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার দেখা পাইলাম না। কলিকাতায় অপেক্ষা না করিয়া তিনি সোজা শান্তি-নিকেতনে চলিয়া গেলেন। আমরাও মাস-দেড়েকের জন্য দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলাম। সর্ নীলরতন সরকার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত গিয়াছিলাম, বাবা, মা, ও ভাইরা কলিকাতায়ই ছিলেন। বাবার চিঠিতে জানিলাম, যে, রবীন্দ্রনাথ মধ্যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীও একদিন আসিয়াছিলেন। আমরা কলিকাতায় নাই শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যে তাদের দেখতে এসেছিলুম।"

১৪ই নবেম্বর কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন

না, অন্য কাহাকে দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। শান্তিনিকেতনে সেদিন মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এমন কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও নাকি নীচু বাংলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভ্রাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "রবি, তুই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস্!" এগুলি শোনা গল্প। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবিচলিতই ছিলেন শুনিয়াছি। টেলিগ্রামখানি উপস্থিত এক অধ্যাপকের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাদের বাড়ী তৈরি হ'ল।" বিদ্যালয়ের জন্য কি একটি বড় বাড়ী তখন হওয়ার কথা চলিতেছিল, অর্থাভাবে আরম্ভ হয় নাই।

কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। আমরা যাইব স্থির করিয়া রাখিলাম।

২৩শে নবেম্বর স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া বোলপুর যাওয়া হয়। সেদিন রবিবার ছিল। হঠাৎ সেদিন কি কারণে জানি না হাওড়ার পুল অতি অসময়ে খোলা হইয়া গেল। যাঁহারা স্পেশ্যাল ট্রেনে যাইতেছিলেন সকলেই ভুগিলেন বিস্তর, ফেরি ষ্টীমারে করিয়া গঙ্গা পার হইয়া তবে স্টেশনে

পৌছিতে হইল। যাঁহারা যাঁহারা টিকিট কিনিয়াছিলেন, সকলে আসিয়া জুটিতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। ট্রেনটি পতাকা দিয়া সাজানো হইয়াছিল, একটি রস্থনচৌকির ব্যাণ্ডও উঠিয়াছিল গাড়ীতে, তাহারা ব্যাণ্ডেল পার হইবার আগে বাজনা স্থরু করে নাই। স্টেশনে প্রচুর জনসমাগম দেখিলাম। স্যার জগদীশচন্দ্রের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি আর আসেনই না, অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌছিলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় এই ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি পণ্ডিত-ব্যক্তিদের সাংসারিক জ্ঞান-হীনতা সম্বন্ধে অনেক রসিকতা করিতে লাগিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, যাত্রীর দল মহানন্দে গান ও গল্প করিতে করিতে চলিলেন। ব্যাণ্ডেল জংশন ছাড়াইবার পর যখন ট্রেনে রস্থনচৌকি বাজিতে লাগিল, তখন রেল-লাইনের দুই ধারে লোক জমা হইয়া এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে লাগিল। বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিলে অনেকে নামিয়া পড়িয়া সেখানকার স্থবিখ্যাত সীতাভোগ ও মিহিদানার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখা গেল যে আমরা যে গাড়ীতে ছিলাম, সেটির চাকায় আগুন লাগিবার উপক্রম ঘটিয়াছে। তাড়াতাড়ি আমাদের, নামাইয়া অন্য গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় বলিলেন,

"এই স্পেশ্যাল ট্রেনটি পুড়িয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজ সমূলে ধ্বংস হইত।" বাস্তবিক ট্রেনে যাঁহারা সেদিন যাইতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। শান্তিনিকেতনে গিয়া কি গান হইবে, তাহাও গাড়ীতে বসিয়া অভ্যাস করা হইতে লাগিল।

বোলপুর স্টেশনেও খুব ভীড় দেখিলাম। কেহ আসিয়াছেন আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য, কেহ বা আসিয়াছেন স্পেশ্যাল ট্রেন দেখিবার জন্য। শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক ও ছেলেরা, যাঁহারা স্টেশনে আসিয়া-ছিলেন, সকলেই প্রায় গেরুয়া পোষাক পরিয়াছিলেন। মেয়েরা যাহাতে ভীড়ে কষ্ট না পান, তাহার জন্য অনেক ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের স্টেশনের বাহিরে আনা হইল। অত লোককে গাড়ী চড়াইবার মত ব্যবস্থা তখনকার শান্তিনিকেতনে ছিল না, তবু যতগুলি সম্ভব গাড়ী স্টেশনে আসিয়াছিল। যাঁহাদের বেশী হাঁটার অসুবিধা ছিল, তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, আমরা অল্পবয়স্কা মেয়ের দল হাঁটিয়াই চলিলাম। রোদের প্রাখর্য্যে প্রথমে একটু কষ্ট হইয়াছিল, পরে অল্প মেঘ করায় সে কষ্টও রহিল না। বোলপুরের লোক একসঙ্গে এত মানুষের আবির্ভাব ইতি-পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, তাহারা মানুষ দেখিবার উৎসাহে

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। যখন আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পত্রপুষ্পে রচিত একটি তোরণ চোখে পড়িল, উপরে লেখা "স্বাগতম্"। অতিথিদের এখানে চন্দনচর্চ্চিত করিবার চেষ্টা করা হইল, অনেকে অবশ্য অচর্চ্চিত অবস্থায়ই তোরণ পার হইয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনে আরও দুই-চারটি নূতন ঘর উঠিয়াছে দেখিলাম।

মীরা দেবী, কমলা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে এইখানে দেখা হইল। তাঁহাদের সঙ্গে সভাস্থলে চলিলাম। প্রতিমা দেবীও অল্প পরে আমাদের দলে আসিয়া যোগ দিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার শুনিবার আশায় অনেকে সেখানে না বসিয়া প্রকাশ্য সভাস্থলেই বসিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও সভাস্থলে আসেন নাই। সভাপতি মনোনীত করা, অভিনন্দনপত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করা ও তাহা মঞ্জুর হওয়া, প্রভৃতি নানা কাজ চলিতে লাগিল। ক্ষিতিমোহনবাবু, দিনুবাবু ও বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর সভাস্থ ব্যক্তিদের ভিতর পাঁচজন প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে আনিতে গেলেন।

কয়েক মিনিট পরে কবি তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিলাম, প্রবাসে, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার বসিবার স্থান হইয়াছিল একটি মাটির বেদীতে, তাহার উপর পদ্মপাতা বিছানো। চারিদিক্ অতি সুন্দর আলপনায় চিত্রিত। কবিবরকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হইল, তাহার পর জগদীশচন্দ্র অভিনন্দনলিপি পাঠ করিলেন, এবং ছোট মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বর্গীয় পূরনচাঁদ নাহার মহাশয়ই বোধ হয় কবিকে একটি জরির স্তবকের মালা পরাইলেন, আতর উপহার দিলেন এবং হিন্দী একটি কবিতার দুই লাইন আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এই যে আকাশের রবিরও যেখানে প্রবেশাধিকার নাই, কবি সেখানেও প্রবেশ করিতে পারেন। অতিথিরা অনেকেই ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন, ছবি তোলা মহোৎসাহে চলিতে লাগিল। দুই-চারখানি ছবি ইহার পরে দেখিয়াও ছিলাম। এক জন মুসলমান ভদ্রলোক এবং জন-দুই ইংরেজও বক্তৃতা করিলেন।

সকলের বলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

আগে শুনিয়াছিলাম তিনি বক্তৃতা করিবেন না, অভিনন্দনের উত্তরস্বরূপ কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" গানটি গাহিবেন। বোধ হয় আর কিছু বলিবার সংকল্প প্রথমতঃ তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে প্রিয়তমের মত ভালবাসিয়াছে এমন বাঙালীরও যেমন অভাব নাই, এবং ছিলও না, তেমনি চিরকাল তাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়াছে এবং লোকচক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন বাঙালীরও অভাব তখন ছিল না। এই রকম কয়েকটি ব্যক্তি সভাস্থলে খুব সামনে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেখিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কপটতা ও অসত্যের প্রতি তাঁহার যে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ছিল তাহা অনলবর্ষী ভাষায় রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সভাস্থ সকলে যে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। তাঁহার যথার্থ অনুরাগী যাঁহারা, তাঁহারা মনে অতিশয় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের বিস্ময়-বিমূঢ়তার স্মৃতি এখনও মনে জাগিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার পুরাতন ডাইরীর পাতায় এখনও কিছু কিছু লেখা আছে। তখন

বালিকা ছিলাম, তাঁহার অনবদ্য ভাষা হয়ত ঠিক তুলিয়া রাখিতে পারি নাই, কিন্তু কথাগুলি খানিকটা এই ধরণের : "দেশের বহু লোকেরই আমার প্রতি যথার্থ কোনো ভালবাসা নেই সেটা আমি জানি! আজ একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে অনেকে ভেসে চলেছেন, কিন্তু এ স্রোত চ'লে গেলেই আবার ধাপে ধাপে পাঁক বেরিয়ে পড়বে। গীতাঞ্জলি আমি যাঁকে নিবেদন করেছিলুম, তিনি যে তা গ্রহণ করেছেন এতেই আমি ধন্য। পুরস্কার যদি কিছু পেয়ে থাকি তা আমার অন্তরেই সঞ্চিত হয়ে আছে। অন্য কোনো পুরস্কারে নিজের চিত্তকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলার দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনও না হয়। যাঁরা আজ আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন, তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের প্রদত্ত অভিনন্দন আমি গ্রহণ করলুম, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে নয়।"

অতঃপর আরও কিছু উপহার প্রদান এবং কবিকে প্রণাম করার পর সভা ভঙ্গ হইল। সকলে হাঁটিয়া আবার স্টেশনে ফিরিয়া গেলাম। অভ্যাগতদের জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু জলযোগ করার উৎসাহ আর কাহারও ছিল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছেলেরা সব খাবার বহন করিয়া স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং

গাড়ীতে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। যতদূর মনে পড়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির সদ্‌গতিই হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও এই স্পেশ্যাল ট্রেনে আমাদের সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

বর্দ্ধমানে যখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অভিযোগ করিলেন যে যত লোক কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন তাহার চেয়ে দেড় শত লোক বেশী ফিরিয়া চলিয়াছেন। অনেকের সততার এই একটি প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া মনে হইল রবীন্দ্রনাথ যে সকলকে তিরস্কার করিলেন, তাহা নিতান্ত অকারণে নয়। এই দেড় শত লোককে মাঝপথে নামাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইল। কিন্তু ট্রেন রিজার্ভ হইয়াছিল ৺শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নামে, তিনি ভদ্রতা করিয়া সেটা করিলেন না। এই দেড় শত লোকের টিকিটের দাম শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই গণিতে হইয়াছিল কি না, জানি না। বেশ রাত করিয়া কলিকাতায় পৌছিলাম।

কলিকাতায় কয়েক দিন এই ব্যাপার লইয়া বিষম হৈচৈ চলিল। কাগজে কাগজে কত বিষই যে উদ্‌গীরিত হইল তাহার ঠিক নাই। কালের স্রোতে ফেনার মত সে-সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। যাঁহারা যথার্থ তাঁহার

অনুরাগী ভক্ত তাঁহারাও দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর বিদ্বেষটাই খালি দেখিলেন, ভালবাসাটা দেখিলেন না। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এত মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়াছিলেন, যে, ইহার পরে দুই দিন তিনি আহার গ্রহণ করেন নাই।

২৫শে নবেম্বর বিকালের দিকে কবি হঠাৎ আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপালবাবু সঙ্গে ছিলেন। তিনিই প্রথমে উপরে আসিয়া খবর দিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপরে আসিয়া বলিলেন, "সেদিন তোমরা গিয়েছিলে, আমি কিছু দেখিনি। কে যে সামনে এল, কে প্রণাম করল, কারুরই মুখের দিকে তাকাই নি। তোমাদের বোধ হয় যেতে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।" ট্রেনে গাড়ীর চাকায় আগুন ধরিয়াছিল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কামরায়?" আমাদেরই গাড়ীতে, শুনিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্!" দাদা কিছুদিন আগে লণ্ডন হইতে একখানি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন, মধ্যে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার চারিদিকে লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের দল। মা সেই ছবির উল্লেখ করাতে কবি আমাকে বলিলেন, "আন ত ছবিখানা একটু দেখি।" আমি লইয়া আসিলাম। ছবি হাতে করিয়া বলিলেন,

"বেশ ত উঠেছে।" আমি বলিলাম, "আপনার ছবি তত ভাল হয় নি।" বলিলেন, "কেন, বেশ ত গম্ভীর শান্ত হয়ে ব'সে রয়েছি, মন্দ কি হয়েছে?" আমার মা বলিলেন, "একটু বেশী বয়স দেখাচ্ছে।" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা কি যে মনে করেন, আমার ত সত্যি অনেক বয়স হয়েছে।" লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে আরও কিছু কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ী যাইবার জন্য উঠিলেন। কবি যেদিন শান্তিনিকেতন হইতে আসেন, সেই রাত্রেই তাঁহাকে তাঁহার এক আত্মীয়কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে হয়। তাঁহার অনেক দেরি হইতেছে দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা অন্য পুরোহিতের দ্বারা বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কবি স্বয়ং আসিয়া বিবাহ না দিলে বর বিবাহ করিতেই অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে বরিশালের ছেলে, শক্ত হয়ে ব'সে রইল। অত রাত্রে আমি যাবার পর তবে সব হ'ল।" স্পেশ্যাল ট্রেনযাত্রীদের কথা আবার উঠাতে বলিলেন, "আমি সেদিন কাউকেই চেয়ে দেখিনি, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। মনটা যে কোথায় ছিল জানি না।" উপর হইতে একতলায় নামিয়া তিনি চারুচন্দ্রের আপিস ঘরটিতে

গিয়া ঢুকিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার যথার্থ অনুরাগী ও ভক্তদের মনে যে আঘাত দিয়াছিলেন, সেই বেদনা দূর করিবার জন্যই যে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চারু-বাবুকে সেই মর্ম্মে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেনও, পরে শুনিয়াছিলাম। দেশের লোকে যে তাঁহাকে যথার্থই ভালবাসে তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া চারুচন্দ্র বলিলেন, "উনি সেদিন ফুটপাথে নেপালবাবুর জন্যে দু-সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছিলেন, তারই মধ্যে দু-শ লোক দাঁড়িয়ে গেল, তাঁকে দেখবার জন্যে।" ভীড় করিয়া দাঁড়ানোই অনেক লোকের স্বভাব। তাহা যে সর্ব্বদাই ভালবাসার পরিচায়ক নয়, তাহার মর্ম্মান্তিক পরিচয় ত কবির মহাপ্রস্থানের দিনও পাওয়া গেল। হুজুকপ্রিয় লোকেরা হুজুকের কোন উপলক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করে না। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত এবং এখনও বাসে, এমন লোকও বাংলা দেশে কম নয়। চারুচন্দ্র নিজের কথাই বলিলেন, "সেদিন ওঁকে আলো দেখাবার জন্যে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমি প্রণাম করাতে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে লণ্ঠনটায় তাঁর একটা আঙ্গুলে ছ্যাঁকা লেগে গেল। সারারাত আমার মনে

হচ্ছিল যেন ঐ ছ্যাকাটা আমার বুকের মধ্যে লেগে রয়েছে।”

আমার ছোট ভাই অশোক তখন বালক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে দেশবাসী তাঁহাকে ভালবাসে না, ইহা শুনিয়া সে মহা চটিয়া বলিল, “না, ভালবাসে না! শুধু শুধুই আমার ঠ্যাংটা ভেঙে গেল সেবার সমাজে লোক আটকাতে গিয়ে।” শারীরিক শক্তির জন্য সমাজ-পাড়ায় অশোক বিখ্যাত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বা উপাসনা হইলে দরজা আগ্‌লাইবার ভার অনেক সময় অশোকের উপর পড়িত।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোধ হয় ৺সুকুমার রায়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

মাঘ মাসে উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই

কলিকাতায় আসিতেন, এ বৎসরও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে ইহার ভিতর একদিন নিমন্ত্রণে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। কি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণটা ছিল তাহা এখন মনে পড়িতেছে না। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া অভ্যাগত অনেকগুলিই আসিয়াছিলেন। এইবারের উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার একটি বক্তৃতার আয়োজন হইতেছিল। তাঁহার বক্তৃতা বা উপাসনার সংবাদ শুনিলেই এমন ভীষণ জনতা হইত যে তাহা সম্বরণ করা মানুষের অসাধ্য হইয়া উঠিত। এইজন্য এবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে বক্তৃতাটা টাউনহলে করার ব্যবস্থা হউক। কিন্তু মাঘোৎসব টাউনহলে করার প্রস্তাব বিশেষ কাহারও মনঃপূত হইল না। কথাটা কেমন করিয়া জানি না রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়াছিল। তিনি সেদিন আমাদের দেখিয়া কাছে আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে টাউনহলে বক্তৃতা দেওয়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি ?" মা বলিলেন যে কিছু স্থির হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখুন, তাহলে আমি পারব না, আমার আর আগেকার মত চেঁচাবার শক্তি নেই।"

"চেঁচাবার শক্তি" অবশ্য তখন কেন, মৃত্যুর দু-এক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষুণ্ণই ছিল।

১১ই মাঘ রাত্রে জোড়াসাঁকোর উৎসবে এবার আশ্রমের ছেলেরাই গান করিবে শুনিয়াছিলাম। এই সময় তাহাদের রিহার্স্যাল আরম্ভ হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি গান শুনিবার জন্য ছুটিলাম। যে ঘরে গান হইতেছিল তাহার সম্মুখের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। দিনেন্দ্রনাথ গান শিখাইতেছিলেন, কবি স্বয়ংও মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিলেন; খানিক পরে গান করিতে করিতেই উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

১১ই মাঘ রাত্রে সেবার মেয়েদের দিকে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল, অনেকক্ষণ ত দাঁড়াইয়াই ছিলাম। গান অতি সুন্দর হইয়াছিল, শান্তিনিকেতনের ছেলেরাই করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এবং নলিনী দেবীর নেত্রীত্বে কয়েকটি গান মেয়েরাও করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলে মাথায় হল্‌দে পাগড়ী বাঁধিয়া আসিয়াছিল। এবারে আচার্য্যের কাজ করিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনবাবু মিলিয়া। গানগুলির ভিতর একটির কথা মনে পড়ে, "প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।" এই গানটি ছেলেমেয়ে দুই দল মিলিয়া গাহিয়াছিল। শ্রীমতী সাহানা গুপ্ত একলা, "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে", গানটি গাহিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিলেন। উপাসনান্তে প্রায় ঘণ্টা-দেড় জোড়াসাঁকোতেই আট্‌কাইয়া থাকিতে হইল। ভীড় একটু কমিলে পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা না করিয়া ১৫ই মাঘ রাত্রে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে নবীনপন্থীদের কিঞ্চিৎ কলহ হইয়া গেল। নবীনরাই তাহাতে জয়লাভ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিলেন ফাল্গুন মাসে। এই সময় রামমোহন লাইব্রেরীতে ছোট একটি সভা হয়। সভাটি যত ছোট করিবার ইচ্ছা উদ্যোক্তাদের ছিল, তাহা অবশ্য হইল না, কারণ কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলেও, রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন, এ খবর লোকের মুখেই শহরময় ছড়াইয়া পড়িত। তাহার পর ভীড়, ঠেলাঠেলি, জানলা বাহিয়া ওঠা, সব পুরাদমে আরম্ভ হইয়া যাইত। এবারেও অনেকটা তাহাই হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। দেখিতে তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, বাঙালীদের ভিতর তেমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রায় দেখা যায় না।

গান হইয়া সভার কাজ আরম্ভ হইল। বক্তৃতা না হইয়া কথোপকথন হয়, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলে কথা বলিতে কেহই রাজী হইত না, সুতরাং ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে তিনি তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি লেখার ইতিহাস খানিকটা দিলেন। তাহার পর ২৩শে নবেম্বর শান্তি-নিকেতনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কোনো রিপোর্ট লওয়া হইয়াছিল কিনা জানি না, কোনো কাগজে কিছু বাহির হইয়াছিল কিনা তাহাও মনে পড়ে না। তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ ছিল :—

কবি চিরদিনই দেশের লোকের প্রীতিকামনা করেন। দেশের লোকের ভালবাসা তাঁহার প্রেয় নয় ইহা বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না। অন্য দেশের লোকের নিকট হইতে এই প্রীতি অজস্রধারায় লাভ করিলেও যথেষ্ট বোধ হয় না, কবির হৃদয় উপবাসীই থাকিয়া যায়। কিন্তু মানুষ এ ধরণের উপবাস সহ্য করিতে পারে না বলিয়া একটি বিশিষ্ট দলের আদর বা বিদেশে প্রাপ্ত সম্মান দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। তেমনি রবীন্দ্রনাথও বিদেশে বহু সম্মান পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা

তিনি নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের সম্মান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই বিদেশে প্রাপ্ত সম্মানের প্রতিধ্বনিই তিনি চাহেন নাই। মায়ের ও ভাইয়ের সহিত ত মানুষের সম্মানের সম্পর্ক নয়, ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু ইহা এমন জিনিস যে ভিক্ষা বা দাবী করিয়া পাওয়া যায় না, পাইবার সৌভাগ্য থাকিলেই একমাত্র পাওয়া যায়। বিদেশে তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তিনি সকলকে ভুলিয়া যাইতে বলিলেন, উহাকে মায়া বা স্বপ্ন মনে করিতে অনুরোধ করিলেন। এগুলি ভুলিয়া গিয়া, তাহার পর যদি দেশবাসী তাঁহাকে কিছু দিতে পারেন, তাহা হইলে সেইটুকুই তিনি চান। সম্মান তাঁহার কাম্য নয়। এই কারণে দেশের লোক যখন তাঁহাকে সম্মান দিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেশবাসী তাঁহাকে ভুল না বোঝেন, এই তাঁহার অনুরোধ। তিনি জানেন যে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহার অনেক জায়গায় বিরোধ আছে, তাহা না থাকিলে এতদিন ধরিয়া এত অপমান এবং লাঞ্ছনা তাঁহার অদৃষ্টে জুটিত না। সে বিরোধের কারণ এই যে দেশের লোকের প্রীতি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াও, জনসাধারণ যাহা শুনিতে চায়, তিনি সেইটুকু

বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলিতে হয়। দেশের লোকের প্রীতির চেয়েও যে বড় জিনিস, তাহার খাতিরে তিনি নীরব থাকিতে পারেন না। ইহাতে অনেকে আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু কবিকে এই পথেই চিরদিন চলিতে হইবে। এই-সব সত্ত্বেও, যদি তিনি কোনোদিন দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারই পুরস্কার তিনি চান, সে যেটুকুই হোক। এই পুরস্কার যদি দেশবাসী তাঁহাকে না দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে টাউনহলে লইয়া গিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলে বা অন্য ভাবে সম্মান দিলে কোনো লাভ নাই। ছেলে একটা খেলনা চাহিলে আর-একটা দিয়া তাহাকে ভুলানো যায়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষ যাহা চায় তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জিনিস দিয়া তাহাকে ভুলানো যায় না। যে ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় যে মানুষ, কবিকে তিরস্কার এবং পুরস্কার দুই দিয়াই গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং সভাস্থ সকলকে নমস্কার করিয়া কবি আসন গ্রহণ করিলেন।

করতালিধ্বনি খুব প্রচণ্ড ভাবেই হইল, যদিও এই জিনিসটিতে রবীন্দ্রনাথের আজীবন বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু

শ্রোতারা আর কোনও উপায়ে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে ত শিখে নাই ?

ইহার পর সঙ্গীতের পালা। শ্রীমতী সুপ্রভা রায় একলা একটি গান গাহিলেন, এবং পরে আরও কয়েকজন তরুণী মিলিয়া "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" গানটি করিলেন। অতঃপর সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সমবেত ভদ্র-মণ্ডলীকে কবিবরকে প্রত্যভিবাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিল। তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে ইংরেজী গীতাঞ্জলি হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ হইল। বই কাছে নাই বলিয়া প্রথমে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ এড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বই তৎক্ষণাৎ একখানা জুটিয়া গেল। ইংরেজী শুনিয়া সকলের মন ভরিল না, সুতরাং বাংলা কবিতাও দুই-তিনটি তিনি পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর সভাভঙ্গ হইল।

বাহিরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। বাবাকে দিবার জন্য একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্ব্বে "অচলায়তন" অভিনয় হইল। আমরা এবার গিয়া "শান্তিনিকেতন" ভবনে উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই সময় "দেহলী" নামক ছোট তুইতলা বাড়ীতে বাস করিতে-ছিলেন, সুতরাং শান্তিনিকেতনের উপরতলা খালিই পড়িয়া ছিল। এবার অনেকগুলি নূতন সঙ্গী ও সঙ্গিনী জুটিলেন।

"অচলায়তন" অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন আচার্য্য অদীনপুণ্য, সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন উপাচার্য্য। দিনেন্দ্রনাথ পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ রায় মহাশয় সাজিয়াছিলেন মহাপঞ্চক। ক্ষিতি-মোহন বাবু দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন। অভিনয়ের ভিতর এক জায়গায় আচার্য্য দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন এই দৃশ্য আছে। আমরা যেন কেমন চকিত হইয়া উঠিলাম। যিনি বিশ্বের প্রণম্য, তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতেছেন, ইহা অভিনয়ের মধ্যেও ভাল লাগিল না।

"অচলায়তন" অভিনয়ের সময় স্বর্গীয় পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশু সাজিয়া কেমন উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। তিনি তখন বাংলা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চারণের অনেক ত্রুটি তখনও ছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দমেন নাই।

আচার্য্য অদীনপুণ্যরূপী রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সুন্দর মূর্ত্তি এখনও চোখে ভাসিতেছে। সাজটা একটু নূতন ধরণের হইয়াছিল। একটি শাদা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া তিনি পিছনে গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া পরিয়া আসিয়াছিলেন। আমার ছোট ভাই মুলু ইহার পর কিছু দিন ঐ ভাবে চাদর বাঁধিয়া গাঁয়ে দিয়া ঘুরিত বলিয়া কথাটা ভাল করিয়া মনে আছে।

ইহার পর আসিল "সবুজ পত্রে"র যুগ। নূতন লেখা হইলে প্রায়ই তিনি কলিকাতায় আসিয়া শুনাইয়া যাইতেন। "হালদার গোষ্ঠী," "হৈমন্তী" এবং "বলাকা"র কয়েকটি কবিতা এই ভাবে শুনিয়াছিলাম। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে "ফাল্গুনী" নাটক রচিত হয়। কিছুদিন পরেই, ইষ্টারের ছুটিতে উহা শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইল। প্রথম প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে যাইতাম, তখন বাহিরের মহিলা অতিথির সংখ্যা কমই দেখিতাম, এখন ক্রমেই তাহা বাড়িতেছিল। "ফাল্গুনী" দেখিতে যেবার গেলাম, সেবার মহিলা, তরুণী ও বালিকা মিলিয়া এমন একটি দল উপস্থিত হইলাম যে থাকার জায়গারই টানাটানি পড়িয়া গেল। গ্রীষ্মের দিন বলিয়া গাড়ীবারান্দার ছাদ প্রভৃতি স্থান-গুলিকেও শুইবার জায়গারূপে ব্যবহার করা হইতে

লাগিল। পুরুষ-অতিথিও অনেক আসিয়াছিলেন। এত জনসমাগমে কবিকেও কিঞ্চিৎ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তবু ইহারই ভিতর সময় করিয়া আমাদের নূতন গান শুনাইয়া গেলেন।

তখন শুক্লপক্ষ ছিল, বাহিরে জ্যোৎস্নার জোয়ার। চন্দ্রালোকে এক দিন খোলা আকাশের তলায় ছোট একটি ইংরেজী নাটিকা অভিনয় হইল। নাটিকাটি আইরিশ্ কবি এ. ই. লিখিত, নাম বোধ হয় "The King"। অভিনয় যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। এণ্ড্রুস্ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব, সন্তোষবাবু ও কালীমোহন-বাবুর নাম অভিনেতাদিগের ভিতর মনে পড়িতেছে। King সাজিয়াছিল একটি অল্পবয়স্ক সিন্ধুদেশীয় বালক, নাম যতদূর মনে পড়ে গিরিধারীলাল কৃপালানী। বালকটির গলা অতি মিষ্ট। প্রায় মন্দিরের পাশেই এক জায়গায় একটি পুকুর কাটানো হইয়াছিল। খানিকটা মাটি তোলার পরই উহা পরিত্যক্ত হয়, ঐ আধকাটা পুকুরটির ধারেই অভিনয় হয়। আইরিশ গানগুলি দুর্ব্বোধ্য ছিল, চন্দ্রালোকিত দৃশ্যগুলি এখন স্বপ্নলোকের ছবির মত মনে পড়ে।

"ফাল্গুনী" অভিনয় জমিয়াছিল খুব। রঙ্গমঞ্চ ত ফুলে

পাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা। "ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া" গানটি যখন হইল, তখন দুইটি ছোট ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া মহানন্দে দোল খাইতে খাইতে গান আরম্ভ করিল। সঙ্গী তাহাদের অনেকগুলিই ছিল, তাহারা ষ্টেজে দাঁড়াইয়াই গান করিতেছিল। ঐ ছেলে দুইটির ভিতর একটি সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়, ডাকনাম "বুনী", আর একটি ছেলের নাম সমরেশ। পাখীর কাকলীতে যেমন বনস্থল প্রতিধ্বনিত হয়, বালকদের গানেও তেমনই নাট্যঘরখানি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল সাজিয়াছিলেন। "ঘরছাড়ার দলে" ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষবাবু, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, অসিতকুমার হালদার, প্রভৃতি। জগদানন্দবাবু "দাদা" সাজিয়া যা চৌপদী আওড়াইয়া- ছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে।

"অন্ধ বাউলের" গান এখনও যেন কানে বাজিতেছে, "ধীরে বন্ধু গো, ধীরে ধীরে" ও "চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে"।

এই বিপুল অতিথি-সমাগমের ভিতরেও কবি রোজ দুই বেলা আসিয়া আমাদের খবর লইয়া যাইতেন, গান শোনানো কবিতা পড়িয়া শোনানোও বাদ যায় নাই।

এই বৎসর রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন। পুরাতন সিটি কলেজ গৃহের সেই তিনতলায় সভা হয়। সেই বিষম জনতা, ঠেলাঠেলি, প্রায় মারামারি, সবেরই পুনরভিনয় হইয়া গেল।

অন্যান্য বৎসরের মত ১৩২২এর মাঘোৎসবেও রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিলেন। মাঘোৎসবের পরেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বিস্তৃত ঠাকুরদালানে আবার "ফাল্গুনী"র অভিনয় হইল। বাঁকুড়ায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, তাহারই সাহায্যকল্পে এই অভিনয় হইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অভিনয় করা লইয়া কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল, পরে তাহা থামিয়াও গেল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় "বৈরাগ্য সাধন" নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া তাহা "ফাল্গুনী"র গোড়ায় জুড়িয়া দেন, দুইটি একসঙ্গেই কলিকাতায় অভিনয় হয়।

"বৈরাগ্য সাধনে" রাজসভার দৃশ্যটি হইয়াছিল অপরূপ। যেন কালিদাসের কাব্য হইতে একটি দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুই ভ্রাতাকে যশস্বী চিত্রকর বলিয়াই এতদিন জানিতাম, তাঁহারা যে আবার এত ভাল অভিনয় করেন,

তাহা কোনোদিন শুনি নাই। অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতি-ভূষণের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কোনো-দিনও ভুলিতে পারিবেন না। প্রহরীর ভূমিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা যে আসরে নামিতেছেন, তাহা জানিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিশেখর সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন তখন দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। কোন্ মন্ত্রবলে যে তিনি নিজের বয়স হইতে ত্রিশটা বৎসর খসাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। এলাহাবাদে তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি যেন তাহারও চেয়ে নবীন। চিরদিন তাঁহাকে গৈরিক বা শাদা পোষাকেই দেখিয়াছি, বিচিত্র মহার্ঘ্য সজ্জায় সজ্জিত কবিশেখরের ভিতর আমাদের সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। দর্শকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন।

"বৈরাগ্য সাধন" অবশ্য চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দিল, কর্ণকেও পুলকিত করিল কম নহে; কিন্তু "ফাল্গুনী"র অভিনয় শান্তিনিকেতনে যেমন দেখিয়াছিলাম, এখানে তেমন যেন দেখিলাম না। বালকেরা আর তত প্রাণ খুলিয়া গান

গাহিতে পারিল না। দোলনাও তেমন সতেজে দুলিল না। রবীন্দ্রনাথ এখানেও "অন্ধ বাউল" সাজিয়া গান গাহিয়া গেলেন।

ইহার পর আবার কবির জাপানযাত্রার একটা কথা উঠিল। কবে যাইবেন, কোথায় কোথায় যাইবেন, সঙ্গে কে কে যাইবে, তাহা লইয়া পূর্ব্বের মত নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল।

১লা মে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রা করিলেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় আসিলেন যাত্রার আয়োজন করিতে। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ী ২৮শে কি ২৭শে এপ্রিল কবিকে লইয়া একটি গানের আসর হয়। সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। কয়েকটি গান হইল, "বলাকা"র কবিতাও কয়েকটি পড়া হইল।

তাহার পরদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গেলাম। গিয়া দেখি ফোটো তোলার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা নিজেরা সাজিতে এবং ছোটদের সাজাইতে ব্যস্ত, রথীন্দ্রনাথ নিজের একটি ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক ছাত্রকে 'সিটিং' দিতেছেন। খানিক পরে তিনি উঠিয়া আসিলেন। একটি ছবিতে তিনি বসিলেন, চারিদিক্ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার

নাতি নাতনী ও নাতবৌয়ের দল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি শিশুকন্যা কবির কোলে গিয়া বসিল। আর-একটি ছবিতে তাঁহার পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূও যোগ দিলেন। ছবি তোলা শেষ হইবামাত্র খবর আসিল যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কবি নাতনীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি তাহ'লে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তোমরা একটু বসতে পারবে কি ?"

আমরা সেইখানেই বসিলাম, তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। খানিক পরে সেইখানেই আমাদের আহ্বান আসিল। সেখানে গিয়াও কিছুক্ষণ বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ এবারেও তাঁহার সহিত জাপান যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার জাপানযাত্রার আগে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না।

জাপান এবং আমেরিকা ঘুরিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭-র মার্চ্চ মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। চিঠিপত্রে প্রায়ই খবর পাওয়া যাইত। জাপানে কবি অনেক বিচিত্র ও সুন্দর উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আগেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে

সেগুলি অনেক দিন সাজানো ছিল, আমরা কয়েকবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌছিবার আগেই রব-উঠিয়া গেল যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। মহা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল যথার্থ খবরের জন্য; তাহার পর শুনা গেল যে তিনি আসিয়া পড়েন নাই বটে, তবে অতি শীঘ্রই আসিতেছেন। ১৩ই মার্চ্চ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। ঠিক খবরটা জানা না থাকাতে Outram ঘাটে ভীড়টা কিছু কমই হইয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহার ভিতর অধিকাংশই তাঁহার আত্মীয়ের দল; অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের ভিতর যাঁহারা খাঁটি খবর বাহির করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্য আসিয়াছিলেন।

ঘাটের উপরে দোতলায় যেখানে বসিবার ও চা খাইবার স্থান, সেইখানেই বসিয়া আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজ আর আসেই না, অনেক পরে দূরে একটি জাহাজ দেখা গেল। অনেকে আশ্বাস দিলেন ঐটিই ঠিক জাহাজ। সাম্‌নে একটি পাইলট বোট খুব দ্রুতগতিতে আসিতেছিল। জাহাজটির নাম 'বাঙ্গালা'। দূর হইতেই জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কে একজন দুই-এক বার রুমাল নাড়িলেন। অপেক্ষাকারীদের ভিতর

মহা কোলাহল সুরু হইল। তাঁহারাও ছাতা, লাঠি, রুমাল, টুপি প্রভৃতি নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। - এক দিকে গেরুয়া ধরণের রঙের পোষাক-পরা কাহাকে যেন দেখা গেল; দুই-চারিজন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ গুরুদেব!" কিন্তু জাহাজ আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেখা গেল যে মূর্ত্তিটি গুরুদেবের নয়, একটি খাকি পোষাকপরা গোরার। আরও কিছু নিকটে আসিলে, জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ ও মুকুলচন্দ্র দে-কে দেখা গেল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সমবয়স্ক বন্ধু যাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুকুলচন্দ্রের পোষাক-পরিচ্ছদ, মাথার টুপি, লম্বা চুল প্রভৃতি সব-কিছুরই সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তীরে দণ্ডায়মান জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

তরুণের দল "Three cheers for Mukul San. hip hip, hurrah!" করিয়া এক চীৎকার দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া মুকুলচন্দ্রের মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

জাহাজ ঘাটে লাগিবামাত্র মহা ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি লাগিয়া গেল। আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিতে

ভরসা না করিয়া দোতলায় বসিয়াই রহিলাম। নীচে তাকাইয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য ফুলের মালায় ভূষিত করা হইতেছে। ছবি তুলিবার চেষ্টাও মন্দ হইতেছে না। মেয়েরা ভীড়ের ভয়ে নীচে নামিতে পারিতেছে না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ এবারে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই যে এসেছ দেখছি, আমি ভেবেছিলুম কাউকে জানতে না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে আসব।"

একটি উৎসাহী যুবক এখানেও ক্যামেরা হস্তে উপস্থিত দেখিয়া তিনি ভৎসনার স্বরে বলিলেন, "দূর, ও আবার কি!" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ছবি উঠিয়াছিল কি না জানি না।

অতঃপর সকলে মিলিয়া Outram ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম।

১৪ই মার্চ্চ বোধ হয় বিচিত্রা ভবনে তাঁহার ফিরিয়া আসা উপলক্ষ্যে ছোটখাট একটি সভা হয়; ৫টার সময় যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল, তখন গিয়া দেখিলাম, কেহই বিশেষ আসেন নাই। যাহা হউক, আগে গিয়া ঠকি নাই, দুইটি বালক-বালিকা আমাদের সারা বাড়ী কেমন সাজানো

হইয়াছে তাহা দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল এবং পাখীর কাকলির মত অনর্গল কথা বলিয়া চলিল। বালিকাটি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা, বালকটি মীরা দেবীর পুত্র নীতু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানী জিনিস আসিয়াছিল অসংখ্য, সেগুলিও তাঁহার বসিবার ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। এই সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিছু পরে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে "বিচিত্রা"র উপরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। নিমন্ত্রিতের দল ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেজদিদিকে এ সভায়ই দেখিয়াছিলাম। তাঁহার তখন বয়স অনেক হইয়াছিল, তবু দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল অসাধারণ।

গান অনেকগুলি হইয়াছিল। প্রথমে মেয়েরা অনেকে গান করিলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে দুইটি গান করিলেন। প্রোগ্রাম হিসাবে আর তেমন কিছু ছিল না, তবে গল্পস্বল্প অনেক হইল। ভোজনের আয়োজন প্রচুর ছিল, অতিথিরা তাহারও সদ্ব্যবহার করিলেন মন্দ নয়। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। ইহার দুই-তিন দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

বর্ষশেষে ও নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ইহার কয়দিন পরেই শান্তিনিকেতনে গেলাম। এবারের দলটি নেহাৎ ছোট, পুরুষ যদি বা দুই-চারজন ছিলেন, মেয়ে আমরা দুই বোন বাদে আর একজন মাত্র ছিলেন। তিনি প্রশান্তচন্দ্রের ভগিনী নীলিমা। গাড়ীতে ভীড় খুব বেশী ছিল না। বেলা চারটার সময় বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা যে যাইতেছি সে খবর সঠিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, সুতরাং আমাদের লইতে কেহ স্টেশনে আসে নাই। যাহা হউক, দিনের বেলা, ইহাতে কিছু অসুবিধা হইল না। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া যাত্রা করা গেল, ছেলের দল হাঁটিয়াই চলিল। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন নামটা গাড়োয়ানদের কাছে পরিচিত ছিল না, তাহাদের বলিতে হইত "কাঁচবাংলা"। শান্তিনিকেতনের মন্দিরটিকে তাহারা এই নাম দিয়াছিল। গাড়ীতে বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম আমাদের দেখিয়া সকলে কি রকম অবাক্ হইয়া যাইবেন, থাকিবার স্থান কোথায় জুটিবে, ইত্যাদি। শেষ সমস্যার উত্তর গাড়োয়ানই স্বয়ং সমাধান করিয়া দিল। তাহাকে রাস্তার উপর গাড়ী দাঁড় করাইতে বলা সত্ত্বেও সে গাড়ী হাঁকাইয়া সোজা রবীন্দ্রনাথের

তখনকার ছোট বাড়ীটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি বোধ হয় তখন চা খাইতেছিলেন, গাড়ীর চাকার শব্দে কেহ আসিয়াছে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীও বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। রবীন্দ্রনাথকে কিছু অসুস্থ দেখিলাম; গালে ও কানের কাছে eczema-র মত কি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেই চিরপ্রফুল্ল মূর্ত্তিকে কোনো রোগে ম্লান করিত না। আমাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি বড়মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বউমা, তুমি এঁদের ফলটল কিছু খাইয়ে দাও," বলিয়া নিজের খাইবার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অগত্যা খাইতে বসিতে হইল, কারণ তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করা যায় না। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা পদব্রজে আসিতেছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দলটিকেও নিজের খাইবার ঘরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। আমরা এই সুযোগে বাহির হইয়া বারান্দায় বসিলাম। অতিথিদল জলযোগ সারিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন নেপালবাবুকে সেই স্থানে দেখা গেল। তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া

বলিলেন, "দেখুন ত মশায়, আপনি কি কাণ্ড করেন! লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে তার পর আর আপনার দেখাই নেই। ভাগ্যে আমি ছিলুম, তাই এখনকার মত কোনো রকমে ফলমূল দিয়ে অতিথিসৎকার করলুম।" অন্যান্য নানা কথার পর নেপালবাবু আমাদের বলিলেন, "চল, তোমাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে আসি।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "জায়গা ওদের বেশ ভাল ক'রেই চেনা আছে।"

অতিথিশালার বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। সন্ধ্যার সময় বর্ষশেষের উপাসনা হইবে শুনিলাম। সুতরাং তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া, স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম উপাসনা আরম্ভ হইতে তখনও কিছু দেরি আছে। এই সময়টা অধ্যাপকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখাসাক্ষাৎ সারিয়া আসিলাম। নেপালবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ শালবীথিকার ভিতর দিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। আরও দুই-চারজন সঙ্গিনী আসিয়া পড়াতে আমাদের গতি একটু মন্থর হইয়া গেল, কবি চোখের অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। মন্দিরে পৌঁছিয়া আমরা আচার্য্যের আসনের পিছনে যে

বারান্দাটি, সেইখানে গিয়া বসিলাম। গায়কেরা যেখানে বসেন, সেইখানে একটু মৃদু মোমবাতির আলো, আর কোথাও আলো নাই। শিক্ষকরা, ছাত্রের দল, এবং স্বল্প-সংখ্যক অতিথি, একে একে সকলেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ আচার্য্যের আসনে আসিয়া বসিলেন।

প্রথম গান হইল, "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার।" দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী মিলিয়া গানটি করিলেন। উপাসনার সমস্ত কাজ একলা রবীন্দ্রনাথই করিলেন। মানবজীবনে দুঃখের যথার্থ স্থান কি সেই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পৃথিবী হইতে দুঃখকে দূর ত করা যায় না। তাহাকে নমস্কার করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে, কারণ সে শুধু আঘাতই করে না, সে অমৃতলোকের বাণীও বহন করিয়া আনে।

শেষেও দুইটি গান হইল। একটি দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী করিলেন, দ্বিতীয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা করিল।

উপাসনার পর একজন ভদ্রলোক আলো দেখাইয়া আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। তিন জনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। মীরা দেবী আসিয়া খানিক পরে আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। "দেহলী"র

দোতলার অতি ছোট ঘরখানিতে তখন কবি বাস করিতেন। লিখিবার স্থান ছিল তাহার পাশের একটি খুপ্‌রিতে। বসিবার ঘরের কাজ করিত সরু বারান্দা ও ছাদ। নীচে তখন মীরা দেবী সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপরে ডাকিতেছেন শুনিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ছাদও তখন অন্ধকার, কিন্তু আলোর অভাব কেহই অনুভব করিতেছিলেন না। অতিথিদের ভিতর অনেকেই আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম, আমরাও এক কোণে বসিয়া গেলাম। শুনিলাম Cult of Nationalism বিষয়ে কথা হইতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি তখন সদ্য ফিরিয়াছেন, সে দেশের যাহা কিছু তাঁহার ভাল লাগে নাই, তাহার উল্লেখ করিলেন। Collectivism ও Individua-lism সম্বন্ধে খানিক আলোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মাঝে মাঝে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন।

গানও একটি শুনিবার সৌভাগ্য হইল। তখনকার দিনে যখনই যে কারণেই রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সভা বসুক, অন্ততঃ একটি গান না শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতেন না। "হৃদয় মাঝে বিছাও আনি', তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি," গানটি সেদিন প্রথম শুনিলাম। আশ্রমের ছেলের দল তখন গানের

সুরে দিনের কাজ আরম্ভ করিত, গানেই শেষ করিত। তাহারাও এই সময় নীচে গান গাহিয়া চলিয়া গেল।

এই সময় খাওয়ার ডাক আসাতে আমরা বাধ্য হইয়া নামিয়া গেলাম। খাওয়া হইতেছিল দিনুবাবুর বাড়ী, শ্রীমতী কমলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। নামিয়া দেখি পুরুষ-অতিথির দল আহারে বসিয়া গিয়াছেন। আমরা অন্য দিকের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাদের সভা ভঙ্গ করিয়া এই সময় নামিয়া আসিলেন। আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি গো, তোমরা বুঝি পরের দলে? মেয়ে হওয়ার ঐ ত মজা, সকলকে পরিবেশন ক'রে পরে যা থাকে তাই খেতে হয়।" কিন্তু মেয়েরা যে পরে খাইবে ইহা তাঁহার ভালও লাগিল না। কমলা দেবীর কাছে গিয়া বলিলেন, "জায়গা ত অনেক রয়েছে, মেয়েদের এই সঙ্গে বসিয়ে দিলে ক্ষতি কি?" কমলা সেইরূপই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার এত বক্তৃতা মাটি হয়ে গেল।" বক্তৃতা মাটি করার ব্যবস্থাটা অবশ্য নিজেই করিলেন।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর নেপালবাবুর সঙ্গে আমাদের আড্ডায় ফেরা গেল। শুনিলাম ভোর সাড়ে চারটায় নব-বর্ষের উপাসনা হইবে। পাছে সময়মত না উঠিতে পারি

এই চিন্তায় খানিকটা এবং গরমেও খানিকটা, রাত্রে ঘুমই হইল না। অতিথিশালার চারি দিকে তখন বড় বড় গাছ ছিল, এখন কিছু কিছু কাটিয়া ফেলা হইয়াছে মনে হয়। ভোর হইতে-না-হইতেই এইখান হইতে অসংখ্য পাখীর বৈতালিক কাকলী শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম, এবং তাহার কয়েক মিনিট পরেই ছাত্রদের প্রভাতী গান কানে ভাসিয়া আসিল, "আমারে দিই তোমার হাতে, নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখি তারার আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের আভাস।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেই ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। এটি যে নূতন ঘণ্টা তাহা শব্দেই বুঝিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখিলাম উহা জাপানী গং। কবি ওটি জাপান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

"পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে," গানটি নববর্ষের উৎসবে হইয়াছিল মনে আছে। গান অনেকগুলি হইল, আশ্রমের ছেলের দলই বেশীর ভাগগান করিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ একটু দ্রুতপদেই মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া

গেলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাইয়া আমরা অনেকেই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলাম।

সকালের জলযোগ সারিয়া খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেখিলাম কবি পুরুষ-অতিথির দলকে লইয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। শৈলবালা অসুস্থ ছিলেন শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনও তঁহার খাইবার ঘরে বসিয়া আছেন, অতিথির দল চলিয়া গিয়াছেন। নববর্ষের প্রভাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাওয়ায় এতক্ষণ নিজেকে বড়ই বঞ্চিত বোধ করিতেছিলাম, এই সুযোগে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দুপুরে তোমাদের To Women লেখাটা শুনিয়ে দেব এখন।" এই লেখাটি বিদেশে কোনো মেয়েদের সভায় পাঠ করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন। বিকালে দিনুবাবুর বাড়ীতে ইহা পড়া হইবে স্থির হইল। আমরা নিজেদের দুদিনের ঘরের দিকে চলিতে চলিতে দেখিলাম একদল ছেলে শালগাছের তলায় বসিয়া মহোৎসাহে গান জুড়িয়াছে, "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।" একটি সাঁওতাল ছেলে মাথায় জবাফুলের মালা পরিয়া তাহাদের দলে বসিয়া বাঁশী

বাজাইতেছে। আমাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া ছেলেরা তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। আমরা সেখানে বসিয়া আরও কয়েকটি গান শুনিয়া চলিয়া আসিলাম।

স্নানাদি সারিয়া আবার কমলা দেবীর বাড়ীতেই গিয়া ওঠা গেল, কারণ সেখানেই আহারের ব্যবস্থা। বিকালে সেইখানেই পাঠাদি হইবে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং অত গরমে আর "শান্তিনিকেতনে" না ফিরিয়া গিয়া ঐখানেই কোথাও একটু গড়াইয়া লইবার চেষ্টা দেখিলাম। মীরা দেবী আহ্বান করাতে তাঁহার ঘরেই গিয়া জুটিলাম। দুটি বাড়ী প্রায় সামনাসামনিই ছিল।

খানিক পরে সন্তোষবাবু হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, "বাঃ আপনারা এখানে? গুরুদেব আপনাদের জন্যে শান্তিনিকেতনে অপেক্ষা করছেন, প্রবন্ধ পড়া হবে ব'লে। আর সকলেও সেইখানেই রয়েছেন।" আমরা ত শুনিয়া অবাক্, এমন ব্যবস্থা ত ছিল না? যাহা হউক, সন্তোষ-বাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলাম।

গিয়া দেখিলাম আমাদেরই অপেক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তখনও পড়া আরম্ভ করেন নাই। আমরা গিয়া বসিবামাত্র পড়া আরম্ভ হইল। লেখাটি বেশী বড় নয়, শেষ হইবামাত্র

তাহা লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রবন্ধটির ভিতর পুরুষদের উল্লেখ আছে "The big creatures" বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দিনু এই লেখাটা শুনলে বড়ই লজ্জা পায়।"

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী অতঃপর মেয়েদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে সেবিষয়ে অনেক কথা বলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ কথাগুলিকে খানিকটা হাল্‌কা করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ ত তোমাদের কি রকম নিন্দে করছে, ওকে আর নেমন্তন্ন ক'রে কখনও খাইও না।" বিলাতে একবার অসুস্থ হইয়া কবি একটি nursing homeএ ছিলেন, সেখানকার কয়েকটি নর্সের কথা বলিলেন এবং অজস্র প্রশংসা করিলেন।

তাহার পর Cult of Nationalism প্রবন্ধটি পড়া হইল। পড়া শেষ হইলে এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। উহা *Modern Review*-এ প্রকাশ করা চলে কিনা, সে প্রশ্নও উঠিল।

সন্ধ্যার সময় দিনুবাবুর বাড়ীর বারান্দায় গানের বৈঠক হইবে কথা দিয়া রবীন্দ্রনাথ তখনকার মত সভা ভঙ্গ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমরা খানিক বেড়াইতে বাহির হইলাম। যতক্ষণ না একেবারে অন্ধকার

হইয়া গেল, ততক্ষণ পথে ও মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলাম নেপালবাবুর সঙ্গে। তাহার পর ফিরিয়া গিয়া লাইব্রেরি দেখিতে ঢুকিলাম। গান শোনাটা নানা গোলমালে ঘটিয়া উঠিল না। একবার শুনিলাম গান হইবে না। পরে শুনিলাম গান হইয়াছে বটে, তবে আমাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পর দিন সুদসুদ্ধ আদায় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তখনকার মত শুইতে গেলাম। আগের রাত্রে গরমে ঘুমাইতে পারি নাই বলিয়া আজ আর ঘরে না ঢুকিয়া গাড়ী-বারান্দার ছাতে শুইলাম।

ভোরবেলা উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ভাবিয়াছিলাম সুরুলের দিকে যে "চীপ্ সাহেবের কুঠি" আছে, তাহাই দেখিয়া আসিব। কিন্তু বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোদও অতি প্রখর, কাজেই সেদিকে না গিয়া পারুলবনের দিকেই চলিলাম। সন্তোষবাবু মাঝপথে আসিয়া যোগ দিলেন। পথে একটি পীড়িত পথিককে ঘিরিয়া আশ্রমের ছেলেরা শুশ্রূষা করিতেছে দেখিলাম। পারুলবনটি আশ্রম হইতে কয়েক মাইল দূরে, পৌছিতে না-পৌছিতে বেশ রোদ উঠিয়া পড়িল। বনটি স্বাভাবিক কুঞ্জবনের মত, মাঝে খানিকটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। শুনিলাম কিছুদিন আগে

আশ্রমের ছেলেরা এখানে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় করিয়াছিল।

রোদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিলাম। দেখি দিনুবাবুর বারান্দায় গানের মজলিশ ইহারই ভিতর বসিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বসিয়া আছেন। আমরাও গিয়া জুটিলাম। গান বেশীর ভাগ দিনুবাবুই করিলেন, কবিও দুই-চারটি গাহিলেন। মধ্যে আর একবার আমাদের উঠিতে হইল প্রাতরাশ সারিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বৈশাখের "প্রবাসী" আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উহা সকলের হাতে হাতে ঘুরিতেছে। "রবিদাদা" নামক একটি গল্পের বইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, উহা দিনুবাবুকে দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ওরে দিনু, এই দেখ্, বিপদ্ হয়েছে।"

তখনকার নবীন বাংলা লেখকদের লইয়া অনেক আলোচনা হইল। কেহই বিশেষ পাতা পাইলেন না। শরৎচন্দ্রের নাম একবার হইল। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পরগাছা" উপন্যাসটির প্রশংসা করিলেন। কে একজন বলিলেন, "শরৎচন্দ্রকে নাকি তাঁহার এক স্তাবক বলিয়াছিলেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভাল লেখেন, তাহাতে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "আরে মশাই

আমি আফিং খাই ব'লে কি এতই বোকা ? নিজের দাম কত তা কি আমি জানি না ?"

সেই দিন বীরভূমের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর আশ্রমে আসিবার কথা ছিল। দিনেন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি জুড়িগাড়ী ছিল, তখন সেইটিই ওখানকার সেরা গাড়ী। সেই গাড়ীটি প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দিনেন্দ্রনাথ উঠিতে যাইবেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আরে তাঁরা দুজন আসবেন, তার উপর তুইও চলেছিস ? ওটাকে কি মালগাড়ী পেয়েছিস নাকি ?" দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার রবিদাদার রসিকতা সর্ব্বদাই হাসিমুখে উপভোগ করিতেন, বলিলেন, 'কি করি যেতেই হবে, উপায় নেই," বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহিত্য আলোচনা চলিতেই লাগিল। "ঘরে বাইরে"র কিছু সমালোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ওটা কেমন যেন একটু unfinished লাগে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে উহা অসম্পূর্ণ নয়। তখনও তর্ক থামে না দেখিয়া বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখছেন মশায়, কি রকম সাজ্ঘাতিক লোক, নাকের সামনে ব'সে সমালোচনা করে।"

মেয়ে লেখিকাদের কথাও উঠিল, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনাও কিছু হইল। রবীন্দ্রনাথ কোনো দলেই ঠিক ভিড়িলেন না। নিজের লেখা প্রসঙ্গে বলিলেন, "যখনই লেখা আরম্ভ করি, একটা যেন সংশয়ের মত থাকে, তারপর এক প্যারা লিখেই দেখি যে বেশ লিখতে পারছি।"

বাবা বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনার পক্ষে এক প্যারা লিখতে পারা একটা মস্ত achievement বটে।" শ্রোতারা সকলেই হাসিতে লাগিলেন। কয়েকটি গান হইয়া তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। আজই কোন-না-কোন সময়ে তাঁহার নূতন দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইবেন আশ্বাস দিয়া কবি চলিয়া গেলেন।

আমরা সবে স্নান শেষ করিয়াছি, এমন সময় তিনি "শান্তিনিকেতন" ভবনের দোতলার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়েরা তখনই আসিয়া জুটিলেন, পুরুষ-অতিথিদেরও ডাকিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। নেপাল-বাবু নিজে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, "নেপালবাবু, আপনি যেন যাবেন না, মশায়।" তাঁহার নাকি ভয় ছিল যে একবার নেপালবাবুকে যাইতে দিলে তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন। ছেলেরা

এ-সব প্রবন্ধ ভাল বুঝিবে না বলিয়া তাহাদেরও ডাকিতে বারণ করিয়া দিলেন। অতিথিরা কিছু পরে আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবন্ধটির নাম Second Birth। পাঠ সাঙ্গ হইবার পর খানিক আলোচনাও হইল। আর একটি প্রবন্ধ বেলা ২টায় পড়া হইবে শুনিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতী আসিতে পারেন নাই। দিনুবাবুর বাড়ীতেই পড়া হইবে।

দুপুরে আহারাদি সারিয়া দিনুবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম, তবে তখনই আসর বসিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথ উপরের ঘরে বসিয়া আছেন দেখিলাম, দুই-তিনজন ভদ্রলোক সেখানে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমরা নীচে বসিয়া মীরা দেবীর খোকাখুকীর সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ২টা বাজিয়া যাওয়ার পর নেপালবাবু আসিয়া একটি ছেলেকে ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ দিলেন। ঘণ্টা বাজিতেই উপরকার সভা ভাঙিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া দিনুবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরে তখন বিষম রোদের ঝাঁঝ, ঘরের ভিতরেই বসা হইল। দুইখানি খাট

পাতা ছিল, একটিতে রবীন্দ্রনাথ বসিলেন, আর-একটিতে মেয়েরা বসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য নীচে শতরঞ্চি পাতিয়া জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সেদিন Indian Nationalism শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হইল। পাঠ শেষ হইবার পর কেহ কোনো কথা বলিতেছেন না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেউ দু-চার কথা বল?" শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওহে ঐতিহাসিক, তুমিই কিছু বল।" কালিদাসবাবু তখনই কিছু বলিলেন না। অজিতবাবু প্রশান্তচন্দ্রকে নীচু গলায় কি যেন বলিতে লাগিলেন দেখিয়া কবি বলিলেন, "আবার দল বাঁধছ? বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক আর সাহিত্যিক, একেবারে ত্র্যহস্পর্শ!"

দেখিতে দেখিতে আলোচনা জমিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষাও যে তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্বাধীনতা বড় জিনিষ, এই মর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কথা বলিলেন। ভারতবর্ষের জল-হাওয়ার প্রভাব তাহার অধিবাসীদের উপর কতখানি পড়িয়াছে সেকথাও কিছু হইল। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিলেন, "আমার ইচ্ছে আছে, যেসব ছেলেরা ইংরেজী শিখতে পারছে না বলে ম্যাট্রিকের কোঠায় আটকে যায়,

এবং কাজেই আর কিছু শিখতে পারে না, তাদের জন্যে এমন একটা institution করি, যাতে তারা বাংলার ভিতর দিয়েই সব-কিছু শিখতে পারে।" সকলেই ইহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, শুধু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আইডিয়াটা ভাল বটে, কিন্তু এটা কি practical হবে?" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "ও কি সর্দ্দার, তোমায়ও বুড়োয় ধরেছে? আগে ত তুমি বেশ ছিলে হে!" প্রভাতবাবু "ফাল্গুনী" অভিনয়ে সর্দ্দার সাজিয়াছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সভা ভাঙিয়া গেল। আমরা দিনের আলোয় লাইব্রেরি আবার ভাল করিয়া একবার দেখিবার আশায় সেই দিকে চলিলাম। পথে দেখিলাম ছেলেরা এক "আনন্দ বাজার' খুলিয়া বসিয়াছে। জিনিষ তাহাতে খুব যে বেশী ছিল তাহা নয়, কিন্তু আনন্দটা ছিল প্রচুর। খাবার কয়েক রকম বিক্রী হইতেছে। সব দোকানে আলাদা আলাদা বিজ্ঞাপন, একটা গাছের ডালে কয়েকজন ছেলে চড়িয়া বসিয়া আছে, এবং নীচে তক্তপোষে আরও কয়েকটি ছেলে বসিয়া। গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন লাগানো, "এখানে বিনাপয়সায় বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করা যায়।" একটি চীনাবাদামের দোকানের বিজ্ঞাপন, "এই চীনাবাদাম খেলে চীনাদের মত ফরশা হবে,

জাপানীদের মত ছবি আঁকতে পারবে, দিনুবাবুর মত গান গাইবে, আর ফুটবল ম্যাচে prize পাবে। এক পয়সা দিলেই এত হবে।" আর এক জায়গায় কচালু বিক্রয় হইতেছে, সেখানে মহোৎসাহে নৃত্যগীত চালাইয়া ক্রেতা জোটানো হইতেছে। ছাত্রেরা নেপালবাবুকে আসিয়া একবার আক্রমণ করিল। তিনি পরে চার আনা দামের জিনিষ কিনিবার আশ্বাস দিয়া তখনকার মত নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

লাইব্রেরিতে গিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও Gardener-এর ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান এবং ডচ্ অনুবাদ দেখিলাম। জাপানী অনুবাদও একখানা দেখিলাম। প্রকাণ্ড একখানি জাপানী ছবি দেখিলাম, তাহা গোল করিয়া পাকাইয়া রাখা হইয়াছে। লাইব্রেরি দেখা শেষ করিয়া, বৈকালিক জলযোগ সারিতে মীরা দেবীর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর সন্তোষ-বাবুদের বাড়ী চলিলাম, সকলের কাছে বিদায় লইবার জন্য। সেই দিনই রাত বারটার গাড়ীতে আমাদের কলিকাতা ফিরিবার কথা। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ নিজের ছোটঘরের সামনের ছাদটিতে আসিয়া বসিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন ফিরিয়া আসিতেছি, তখনও দেখিলাম

তিনি সেই ছাদেই বসিয়া আছেন। রাত্রিকালে হয়ত দেখা হইবে না, তাই এখনই বিদায় লইয়া রাখিবার জন্ত উপরে গিয়া উঠিলাম। ছাদের উপরেই তাঁহার পায়ের কাছে সকলে গিয়া বসিলাম। কমলা দেবীকে তিনি নাতবৌ বলিয়া অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং দেখিলেই নানাপ্রকার রসিকতা করিতেন। পূজার ছুটিতে আশ্রমের মেয়েরা কি অভিনয় করিয়াছিলেন, কে কি সাজিয়াছিলেন তাহারই সব গল্প হইতে লাগিল। বাড়ীর সামনের পথ দিয়া দুইজন ছেলে কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল, তাহারা যে কে অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না। ভূতের গল্পই হইতেছিল বোধ হয়। এক জন বলিল, "কিছু না শুনলেও, অশথ কি বট গাছের তলায় এলেই—" শুনিতে পাইয়া উপর হইতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন গাটা ছম্ ছম্ করে না?" ছেলে দুইটি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

একটু পরেই দেখিলাম সন্তোষবাবু উপরে উঠিতেছেন, তাঁহার পিছন পিছন চার-পাঁচটি ছোট ছেলে। প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপার কি। সন্তোষবাবু কাছে আসিয়া তাহাদের হইয়া নিবেদনটা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। ছেলেদের দল নাকি একটি Icecream freezer

তৈয়ারি করিয়া increcam বানাইয়াছে, তাই গুরুদেবকে খাওয়াইতে আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহহাস্যে বালকদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আগে তোদের আইশ্-ক্রীমের দাম কত বল্, শেষে খেয়েদেয়ে যদি আবার দাম না দিতে পারি ?" বালকগুলি পাকা ব্যবসাদার, তখন দাম বলিতে কিছুতেই রাজী হইল না। গুরুদেবকে ও আমাদের সকলকেই তাহাদের আইশ্‌ক্রীম্ খাওয়াইয়া তখনকার মত বিদায় হইয়া গেল। আমরাও সন্তোষবাবুর কাছে দাম জানিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম না। পরে শুনিলাম ছেলের দল সমস্ত দামই তাহাদের গুরুদেবের কাছে আদায় করিয়া লইয়াছে। এই ছোট ছোট ছেলেগুলি তাঁহাকে ভক্তি করিত দেবতার মত, দিনে যতবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত, ততবার পদধূলি গ্রহণ করিত, অথচ মায়ের কাছে ছেলে যে ভাবে আবদার করে সেই ভাবেই তাঁহার কাছে আবদারও করিত।

সেদিন ছাদে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়াছিলাম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া অবর্ণনীয় এক শান্তি ও পূর্ণতার অনুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, নড়িবার যেন সাধ্যই ছিল না। তাঁহার

কাছে নীরবে বসিয়া থাকারও যে কি মূল্য ছিল তাহা ভাষা দিয়া কি বুঝাইব? তাঁহার গান, গল্প, কবিতা-পাঠ সবই ত আমরা উপভোগ করিয়াছি, এগুলি যে আমাদের কাছে কতখানি ছিল, তাহা যাঁহারা এসকলের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, কিন্তু শুধু তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিয়া যে পরমতম আনন্দ নিজে পাইয়াছি, তাহার সহিত কিসের তুলনা দিব? দেবতার সান্নিধ্যে ভক্তের যে আনন্দ, তাহারই সঙ্গে হয়ত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে।

অন্ধকারে অনেকেই পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিলেন, মেয়েরা বসিয়া আছেন দেখিয়া আবার সেই ভাবেই নামিয়া যাইতেছিলেন। কমলা দেবীর ডাক পড়িল নিজের বাড়ীতে, তিনি নামিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকান মেয়েদের কথা বলিতেছিলেন। অধিকাংশ মহিলার ধরণ-ধারণে যে কৃত্রিমতা ছিল, তাহা তাঁহাকে বড়ই পীড়িত করিয়াছিল। বলিতেছিলেন, "ওখানে যাঁরা আমার পুরুষ-বন্ধু ছিলেন, তাঁরা অনেকেই খুব উদার, মহৎহৃদয় লোক, কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে শেষে আমার আর যেতে ইচ্ছে করত না এই জন্যে। তাঁদের স্ত্রীরা কথায় কথায় 'Oh how nice, Oh how nice!' ক'রে

'হাউ হাউ' ক'রে আমাকে একেবারে জালিয়ে তুলতেন। ওদের অবিশ্যি খুব বেশী দোষ দিই নে আমি, অনেকটা ঐরকম হ'তে ওদের সমাজই ওদের বাধ্য করেছে।" কয়েকটি মহিলার নাম করিলেন, যাঁহাদের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। জাপানের মেয়েদের কথা খুব স্নেহের সহিত উল্লেখ করিলেন, বলিলেন, "ওরা অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মত।" তাহারা কবিকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিল। তিনি যখন জাপান হইতে চলিয়া আসেন, তখন জাহাজঘাটে আসিয়া এই দুদিনের চেনা বন্ধুর জন্য অনেকে অশ্রুপাত করিয়াছিল। ইহা কবিকে যতটা বিস্মিত করিয়াছিল, আমাদের ততটা কিছুই করিল না। তাঁহাকে যে একদিনও নিকটে পাইয়াছে, সে যে তাঁহাকে বিদায় দিতে অশ্রুপাত করিবে সে আর বিচিত্র কি? বাংলা দেশের নরনারীর হৃদয়ে এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যে তিনি অখণ্ড রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙালীর নিজগুণে নয়, তাঁহাকে ভাল না বাসা, সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই।

কলিকাতায় এই সময় কয়েকজন ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েকে লইয়া একটা ছোট club-এর মত গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রশান্তচন্দ্র হঠাৎ উপরে আসিয়া দিদিকে অনুরোধ করিলেন,

সেই ক্লাবের আদর্শের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু আলোচনা করিতে। আমরা, অর্থাৎ তখনকার মেয়েরা, আধুনিক তরুণীদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম মুখফোঁড় ছিলাম, বিশেষতঃ কবির সম্মুখে কথা বলিতে হইবে মনে করিলেই ত আমাদের কণ্ঠরোধ হইত। সুতরাং দিদি তখনই কিছু বলিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "শান্তা, তোমাদের কি প্রশ্ন আছে আমাকে বল ত?" দিদির হইয়া প্রশান্তচন্দ্র বলিয়া দিলেন, "শান্তা বলছিলেন যে পুরুষেরা জোর ক'রে মেয়েদের কতগুলো ideal খাড়া করে দিয়েছে—" তিনি শেষ করিবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর এখন তার ভার সামলানো দায় হয়ে উঠেছে।" তাহার পর মেয়েদের কি আদর্শ সর্ব্বদা তাঁহার মনে বিরাজ ক'রে, এই বিষয়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বলিয়া গেলেন। দেশের লোকের মনে নারীত্বের যে কি আদর্শ, কেন এই আদর্শ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, সব বিষয়েই আলোচনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার এক বৌদিদির (৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর) কথা উল্লেখ করিলেন।

মেয়েদের লেখা কেন প্রথম শ্রেণীর হয় না, সেই কথা উঠাতে বলিলেন, "পৃথিবীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব

তাদের পঙ্গু ক'রে রেখেছে। এই জন্যে আমি কখনও কোনো মেয়ের লেখাকে মন থেকে প্রশংসা করতে পারি নি। ওদের সবটাই যেন কল্পনা। প্রশংসা করতে পারলে কিন্তু আমি খুব খুসি হতুম। আমার পিতা যদি আমাকে জমিদারী দেখতে না পাঠাতেন, তা হ'লে আমার লেখাও ঠিক ঐ ধরণের হ'ত।"

প্রায় রাত সাড়ে ন'টা অবধি সেখানে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে আমরা বাধ্য হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। তখনও খাওয়াদাওয়া করা, জিনিষপত্র গুছানো, সবই বাকি। তাঁহাকে প্রণাম করাতে বলিলেন, "আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তোমরা ত সেই রাত্রের গাড়ীতে যাচ্ছ?" 'শান্তিনিকেতন' ভবনে ফিরিয়া জিনিষপত্র সব গুছাইয়া রাখিলাম। এই সময় খাইবার ডাক পড়িল। লণ্ঠনধারী ভৃত্যের সঙ্গে আবার মীরা দেবীর বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলাম। উপরে অনেকের গলা শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম অন্য অতিথিরা এতক্ষণে line clear পাইয়া কবির কাছে গিয়া বসিয়াছেন। এই উৎসবগুলির সময় রবীন্দ্রনাথ রাত্রিকালে ঘুমাইবার জন্য কয়েক ঘণ্টা ছুটি পাইতেন মাত্র, আর সমস্তটা সময় ছিল অতিথিদের জন্য। আমরা মেয়ে এবং বয়সে অন্যান্য অতিথিদের চেয়ে ছোট, আমরাই

প্রশ্রয় পাইতাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু কখনও সে প্রশান্ত ললাটে বিরক্তি বা ক্লান্তির চিহ্ন দেখি নাই। মুখের হাসির প্রসন্নতা এক তিল কমে নাই। দিয়াই তাঁর আনন্দ ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য তিনি আর আমাদের কাছেও সহজলভ্য ছিলেন না। কাছে যাইবার চেষ্টা করিলে অনেক সময়েই বাধা পাইতাম। মন ইহাতে ক্ষুন্ন ও পীড়িত হইত। বাধা যাঁহারা সৃষ্টি করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও মন প্রসন্ন থাকিত না। তখন সেই অতীত দিনগুলিকে স্মরণ করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা ত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও জোটে নাই। ইহাতেই কেন তৃপ্ত থাকি না? স্মৃতির ভাণ্ডারে যাহা অমূল্য, অক্ষয়, অনির্ব্বাণ হইয়া জাগিয়া আছে তাহা ত কেহ হরণ করিতে পারিবে না? এই স্মৃতিই এখন আমাদের চিরপাথেয়, চিরসম্বল। যাহা পাইলাম না, তাহার জন্য আর কোন ক্ষোভ রাখিব না।

কমলা দেবীর বিস্তৃত বারান্দায় খাইতে বসা গেল। দশ-বারো বৎসর ধরিয়া সমানে আমরা শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিয়াছি। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, কমলা দেবী, মীরা দেবী, স্বর্গীয়া সুকেশী দেবী, সকলেই সর্ব্বদা আমাদের একান্ত আত্মীয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন, ও

সেইভাবে আদরযত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদের আদরে কোন দিন কোনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই, নিজের মা-মাসী বা দিদির আদর-যত্ন মানুষে যেভাবে গ্রহণ করে, সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। তখনকার কথা যখন ভাবি, ইঁহাদের কথা, সেকালের অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নীদের কথা, নাম-না-জানা ছোট ছোট ছেলেদের কথা, স্মৃতির পটে যেন তারকার মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কমলা দেবী ও দিনুবাবুর কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া মীরা দেবীর খোঁজ করিয়া জানিলাম তিনি খুকীকে ঘুম পাড়াইতেছেন। তিনিও একটু পরে বাহির হইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথও নীচে নামিলেন। আর একবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। বলিলেন, "সবাই ত চ'লে গেল, কাউকেই ধ'রে রাখতে পারলুম না।"

ফিরিয়া আসিলাম, তবে ট্রেন বারোটায়, বারোটা বাজিতে বড় আর দেরি ছিল না। কাজেই শুইবার চেষ্টা না করিয়া কেহ বা বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, কেহ বা ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময়টা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কে এসেছিল?" তাকাইয়া দেখিয়া মনে হইল একটা লণ্ঠনের আলো সিঁড়ির

দিকে সরিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যে আবার এত রাত্রে আসিবেন, তাহা আমাদের আশার অতীত ছিল, কিন্তু খোঁজ লইয়া জানা গেল সত্যই তিনিই আসিয়াছেন। আমরা ব্যস্ত আছি মনে করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে আবার তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নীচে নামিলাম। আমাদের স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীও আসিয়া গিয়াছে দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথকে উপরে আসিয়া বসিতে বলাতে তিনি বলিলেন, "থাক্, এখুনি ত তোমাদের নামতে হবে, সময় হয়ে এল।" Cult of Nationalism সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে তাঁহার কিছু আলোচনা হইল। ইহা কাগজে প্রকাশ করা চলে কি না সেই প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে কাউকে কোন বিপদে না পড়তে হয়, সেটা দেখা দরকার।"

গাড়ীর সময় হইয়া আসিতেছে, আর দেরি করা গেল না। আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার স্পর্শের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ফিরিয়া চলিলাম। নিজেই হারিকেন্ লণ্ঠনটি হাতে করিয়া তিনি ফিরিয়া চলিয়াছেন, গাড়ী হইতে দেখিতে পাইলাম।

বলদের বস্‌টির spring ভাল ছিল না, প্রথমে আমরা তিনজন মেয়েই তাহাতে উঠিলাম। কিন্তু পরে অন্য সব

কয়জনকেও বলিয়া কহিয়া গাড়ীতেই তুলিয়া লওয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধরা অত পথ হাঁটিয়া যাইবেন, তাহা ভাল লাগিল না। বহু দূর হইতেও শান্তিনিকেতনের আলো দেখিতে পাইলাম।

ট্রেনে বিষম ভীড়। প্রভাতবাবুর সাহায্য না পাইলে গাড়ীতে উঠিতেই পারিতাম না বোধ হয়। তিনি একরকম গায়ের জোরেই আমাদের মেয়েদের গাড়ীতে ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিলেন। একটি বুদ্ধিমতী যাত্রিনী দুই পা দরজার উপর তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছিলেন, অনেক কষ্টে তাঁহার পা রক্ষা পাইল। সহযাত্রিনীরা ভদ্রগোছেরই ছিলেন, ঐ অসম্ভব ভীড়েও নড়িয়া বসিয়া, পালা করিয়া আমাদের এক-একবারের বসিবার জায়গা দিলেন। এই ট্রেনের কয়েকটি সহযাত্রিনীকে লইয়া দিদি কিছুদিন পরে "শিক্ষার পরীক্ষা" নামক একটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। সকালবেলা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে রবীন্দ্রনাথও কি একটা পারিবারিক কারণে কলিকাতা আসিলেন। সমাজপাড়ায় একটি 'বাল্য সমাজ' ছিল, ইহার ছেলেমেয়েরা মধ্যে মধ্যে গান, অভিনয় প্রভৃতি করিয়া বন্ধু-বান্ধবের মনোরঞ্জন করিত। এবার তাহাদের সখ হইল তাহারা "ডাকঘর"

অভিনয় করিবে। অমল সাজিবার উপযুক্ত একটি ছোট ছেলেও পাওয়া গেল, তাহার নাম আশামুকুল। রিহার্স্যালও বেশ জমিল। রবীন্দ্রনাথ কাহারও মুখে খবর পাইয়া প্রশান্ত-চন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে অভিনয়স্থলে তিনি উপস্থিত থাকিবেন। ইহাতে বাচ্চা অভিনেতা ও তাহাদের অভিভাবকবর্গ বিষম ভয় পাইয়া গেলেন। ভয় পাইলেও, তাঁহারা অভিনয় করিতে ও রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেও সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সময় আশামুকুলের মায়ের অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছানোতে সে গিরিধি চলিয়া গেল। আর কাহাকেও অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে রাজী করা গেল না, সুতরাং অভিনয়ই হইল না।

মেয়েদের দিক্ হইতে এক দিন রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করা হইল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য। স্থান স্থির হইল মেরী কার্পেণ্টার হল্। কথা ছিল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে স্কুলের মেয়েদের বেড়াইবার যে ছোট মাঠটি আছে, সেইখানেই সবাই বসিবেন, হঠাৎ ঝড়ঝাপটা আসিলে হলে ঢোকা যাইবে। দুই-তিনজন ছেলেমেয়ে গিয়া কবিকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিল।

২৪শে এপ্রিলই বিকালে সেই পার্টি হইবার কথা, সেই দিনই সকালে তিনি আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, "কি গো, বিকেলে ত তোমরা আমাকে তোমাদের ওখানে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?" বাবার সঙ্গে খানিক আলোচনা করিলেন তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধগুলি লইয়া। পরে শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

বিকালে আমাদের গিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ দেরি হইয়া গেল। বাহিরে দেখিলাম তাঁহার মোটরটি দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সকলে তখনও ছোট মাঠটিতেই বসিয়া আছেন, হলে প্রবেশ করেন নাই। প্রিয়ম্বদা দেবী তখন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। খানিক পরেই সবাই আসন গ্রহণ করিলেন, কথাবার্ত্তাও জমিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই আকাশের কোণে ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দেখা দিল। এই সময় মেয়েদের ডাক পড়িল গানের জন্য। শ্রীমতী সাহানা গুপ্ত "শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে" গানটি আরম্ভ করিবামাত্র বোঝা গেল যে ধারাবর্ষণ হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং

গান শেষ হইবামাত্র সকলকে লইয়া তাড়াতাড়ি হলের ভিতরে গিয়া বসা হইল। চায়ের ব্যবস্থা ছিল, সকলেই কিছু জলযোগ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও নিষ্কৃতি পাইলেন না। শতরঞ্চি পাতিয়া সকলে বসা গেল। আর একটি গানের পর রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিলেন। To Women বলিয়া যে প্রবন্ধটি তিনি শান্তিনিকেতনে পড়িয়াছিলেন অনেকটা সেই কথাগুলিই।

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র আবার আলোচনা সুরু হইল। আলোচনার সব ক'টা বিষয়বস্তুই যে খুব স্থান বা কালোচিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকিলে একটা বিধিমত ঝগড়া বাধিয়া যাইত বোধ হয়, তবে তিনি কথাটা ঘুরাইয়া ব্যাপারটা সেইখানেই থামাইয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবীও তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিলেন।

গান শুনিবার জন্য তখন সকলে মহা ব্যস্ত। "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে," গানটি তখন সবে রচিত হইয়াছে ও "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গানটি শুনিতে চাওয়ায় একটা প্রবাসীর খোঁজ পড়িল; ইতিমধ্যে কবি Canada & India বলিয়া একটি কাগজ হইতে তাঁহার একটি ইংরেজী কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর তিনি অনুরোধ করাতে সুকুমার রায় তাঁহার স্বরচিত "স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ" নামক একটি মজার কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর একটি গান গাহিলেন। ইহার পর সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও খানিকক্ষণ আমরা বাহিরের ছোট মাঠটিতে দাঁড়াইয়া গল্প করিলাম। বাসন্তী-দিদি (কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা) আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "জান, কাল আমাদের বাড়ী একটা বেশ মজার কাণ্ড হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কাণ্ড ?" তিনি বলিলেন তাঁহাদের বাড়ীতে একটি পাহাড়ী বালক ভৃত্য আছে। ইহার আগের দিন রবীন্দ্রনাথ একবার কৃষ্ণবাবুদের বাড়ী গিয়াছিলেন। উপরে খবর পাঠাইয়া তিনি নীচে মোটরেই বসিয়া ছিলেন। পাহাড়ী বালকটি হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাহাকে একবার মোটর গাড়ীতে বসিতে দিবেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বালককে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন ও অনেক-খানি ঘুরাইয়া আনিয়া আবার নামাইয়া দিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণবাবু বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুই ও গাড়ীতে কার হুকুমে চড়েছিলি ?" বালক বলিল "একজন খুব সুন্দর রাজা ভিতরে বসেছিলেন, তাঁকে বলেছিলাম।" গল্পটি শুনিয়া আমার শিশুকালের সেই "মহারাজে"র কথা মনে পড়িল। সেও রবীন্দ্রনাথকে 'রাজা' বলিয়া চিনিয়াছিল। কৃত্রিম শিক্ষা ও সভ্যতা এই দুটি মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তাই কি তাহারা কবিকে যথার্থই রাজা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল ?

পরের দিনও ঐ স্থানেই যুবক সমিতির উদ্যোগে আর একবার রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হইল। কবি প্রশান্তচন্দ্রকে বলিলেন মেয়েরা একেবারে কথা বলে না, ইহা তাঁহার ভাল লাগে না। কথা বলিবার জন্য অনেককেই আগে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়া রাখা হইল, কিন্তু কার্য্যতঃ ফল প্রায় একই রকম হইল।

আগের দিন দেরি করিয়া গিয়াছিলাম এবং সে কারণে একটু ঠকিয়াওছিলাম, তাই আজ সকাল সকাল গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও বিশেষ কেহই আসেন নাই। ক্রমে ক্রমে লোক বাড়িতে লাগিল, অধিকাংশই ছেলেমেয়ের দল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন "বুড়ো" হন নাই, এই জন্য যথার্থ "বুড়ো"র দল তাঁহাকে কোনোদিনই বেশী পছন্দ

করিতেন না। অবশ্য শারীরিক বার্দ্ধক্যের কথা আমি বলিতেছি না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমা দেবী ও এণা দেবীকে সঙ্গে করিয়া তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। আজ আকাশ পরিষ্কার ছিল, বাহিরেই চেয়ার পাতিয়া বসিবার আয়োজন হইল। মেয়েদের কাছে আসিয়া তিনি বসিলেন। কয়েকটি তরুণী ও বালিকার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। সকলেই পরিচয়ান্তে নীরবে বসিয়া রহিলেন, কথা বলিবার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সীতা, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না?"

অতঃপর ছেলেদের মধ্যে গিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিলেন। তাহার পর আজও আকাশে মেঘসঞ্চার দেখিয়া আগের দিনের মত হলের ভিতর গিয়া বসা হইল। ঘরের ভিতর বেশ গরম তখন, বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থাও ছিল না। আমিও আমার একটি সঙ্গিনী কাছে বসিয়া হাতপাখা দিয়া সারাক্ষণ তাঁহাকে বাতাস করিলাম।

প্রথমেই তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করা হইল, তিনি একটি গান করিলেনও। তাহার পর নানা বিষয়ে

আলোচনা চলিল। International Problems ছাড়িয়া শেষে ব্রাহ্ম সমাজের ঘরোয়া কথাও অনেক হইয়া গেল। নারীজাতির ভাগ্য নির্ণয় করিতে পুরুষরা সর্ব্বদাই তৎপর, সুতরাং কিছু পরে সে কথাও উঠিল। কয়েকজন যুবকের ভাব দেখিয়া মনে হইল, যে সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ বিধান করিবার জন্য একটি কমিশন বসিয়াছে, এবং তাঁহারা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন। সুকুমার রায় একমাত্র মেয়েদের পক্ষ লইয়া কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার মেয়েদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা কিছু বল!" দুই-চারজনের নাম ধরিয়াও আহ্বান করিলেন, কিন্তু খুব বেশী সাড়া পাইলেন না। দুজন মেয়ে দুই-চারটি কথা মিহিস্বরে বলিলেন। আলোচনাটা বিশেষ প্রীতিকর হইতেছে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কথার মোড় ফিরাইবার জন্য আবার গানের প্রস্তাব উঠিল। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটি খাতায় গুটিকতক নূতন গান তুলিয়া আনিয়াছিলেন, সেই খাতাখানি তিনি কবির দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। "এই ত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" এবং "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে," এই গান দুটি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহার পর সভা ভঙ্গ হইল। গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের একবার দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া আসার কথা ছিল, সেই বিষয়ে তিনি দুই-একজনের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। একটি সদ্য বাগ্‌দত্তা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, একদিনও যে গান শিখতে গেলে না?" তাহার এক ভগিনী বলিলেন, "ও এখন অন্য কাজে ব্যস্ত!" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমি সব খবর রাখি।"

পর দিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে আবার কবির সাক্ষাৎ পাইলাম। সেদিন যে উপলক্ষ্য কি ছিল তাহা ভাল করিয়া মনে পড়ে না। সরকার মহাশয়ের পরিবারবর্গ তখন অনেকেই কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ী প্রায় জনশূন্য। তবে নিমন্ত্রিত অনেকে আসিয়াছিলেন। হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌছিতেই রবীন্দ্রনাথের গাড়ী আমাদের পাশ দিয়াই চলিয়া গেল। আমরা খানিক পরে গিয়া পৌছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামে খানিক সময় কাটিয়া গেল। তাহার পর একটি বড়ঘরে সভা বসিল। একটু পিছন দিক্ ঘেঁষিয়া বসিলাম। জানিতাম আজও উৎসাহী যুবকবৃন্দ নারীপ্রগতির চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। এ ক্ষেত্রে সামনে না বসাই শ্রেয়। হইলও তাহাই। মেয়েদের

লইয়াই কথা উঠিল। কিন্তু আলোচনা আজ আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। এক পক্ষের পাণ্ডিত্য প্রকাশ এবং আর এক পক্ষের নীরব অসহযোগ দেখিয়া দেখিয়া রবীন্দ্র-নাথ বোধ হয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই অন্য বিষয়ে কথা তুলিয়া আলোচনার সুর ফিরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ, এই সব বিষয়ে কথা হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজ মানুষের মনের স্বাধীনতার উপরে যে বিভীষিকা বিস্তার করিয়া আছে, এবং মানুষকে যে মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত করিতেছে, তাহাকে কোনোরকমে এবং কোনো কারণেই সমর্থন করা যে অনুচিত, ইহাই জোর দিয়া বলিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ নেতার নাম উঠিল এই সম্পর্কে। রাত ন'টার পর রবীন্দ্রনাথ আলোচনা থামাইয়া দিলেন। অন্য দিনের মত সেদিনও গান গাহিয়াই সভা ভঙ্গ করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া বাবার কাছে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ একবার জাভা বলিদ্বীপ প্রভৃতি বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রমণের নেশা প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া থাকিত, আবার তাইারই সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জনে নিরালায় শান্তিতে বাস করিবার ইচ্ছাটাও

সমানে বিরাজ করিত। ইহার দুই-এক দিন পরে তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

তখনকার দিনে তাঁহাকে কাছে পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। নিজেদের হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিত, আমরা যে কি অমূল্য সম্পদ বিনামূল্যে পাইতেছি, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতাম কি না জানি না। আলো, বাতাস, আকাশের নীলিমা না চাহিয়া না জানিয়াই মানুষ যেমন করিয়া পায়, তেমনই করিয়াই তাঁহার স্নেহ, তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াছি। ইহার যে কোনোদিন অবসান হইতে পারে, সে কল্পনাও করি নাই। আমরা আছি, আর তিনি নাই, ইহা অনুভব করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শেষ নিদারুণ বিচ্ছেদের দিনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল চিত্তে ভাবিয়াছি তিনি এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না, অলৌকিক কিছু ঘটিয়া এখনও তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া যাইবেন। এই যে বুদ্ধির অতীত একটা কিছু আমাদের তাঁহার অমরত্বে বিশ্বাস করাইয়াছিল, তাহাই কি সত্য নয়? মৃত্যুতে তিনি শেষ হইতে পারেন না, এ বিশ্বাস, না হইলে কেন মনে আসিল? মৃত্যু ত প্রিয় অনেককেই হরণ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ত এমন ধারণা এমন দৃঢ় করিয়া মনে আসে নাই?

কথাটা অন্য দিকে চলিয়া আসিল। আমরা ত তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ ছিলাম, কিন্তু তিনি এই অবিশ্রাম অত্যাচার সহ্য করিতেন কি করিয়া? তাঁহার কি শ্রান্তি আসিত না, বিরক্ত বোধ হইত না? সত্যই হইত না, যদিও আজকার অনেকের পক্ষে সে কথা বিশ্বাস করা সম্ভব হইবে না। বিধাতা তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন সকল দিকেই অতিমানবের শক্তি দিয়া, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল যেমন বিরাট, দানে অকার্পণ্য ছিল তেমনই বিস্ময়কর। নিজেকে দুই হাতে বিলাইয়া দিয়াই তিনি খুসি ছিলেন। এই সময়ে বাবার কাছে এণ্ড্রুজ্ সাহেব একখানি চিঠি লেখেন, তাহার শেষের দুইটি লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "Gurudev spoke so happily of your visit here with your daughters. He enjoyed it very much." তাঁহার খুসি হইবার কি ঘটিয়াছিল জানি না। স্নানাহার ও কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন সারাক্ষণ এই অতিথিরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। কথাও বিশেষ কেহ বলিত না, তাঁহাকেই সারাক্ষণ কথা বলাইত। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। ছোটদের সঙ্গে ছোট হইয়া মেশা, ইহা ছিল তাঁহার খেলা। বাক্যে যাহার পরিচয় নাই, সেই ভালবাসা, সেই ভক্তিও

তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির অগোচর ছিল না, তাই যথার্থ অনুরাগী যাহারা ছিল, তাহারা চিরকাল তাঁহার স্নেহ পাইয়া আসিয়াছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা এমনই তাঁহার সুগভীর ছিল যে, কাহাকেও তুচ্ছ করিতে, অবিশ্বাস করিতে, উপেক্ষা করিতে সহজে তিনি পারিতেন না।

এই বৎসর (১৯১৭) কবির জন্মদিন শান্তিনিকেতনেই হয়। অনেকেই এই উপলক্ষ্যে সেইখানে উপস্থিত হইলেন, আমরাও বাদ পড়িলাম না। যত দূর মনে পড়িতেছে, মা, বাবা, ভাই, বোন সকলেই গিয়াছিলাম। ট্রেনের ভীড়ে অনেক দুর্গতি হইয়াছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আনন্দে সে-সব সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। সুকুমারবাবু এবং তাঁহার পত্নীও এই ট্রেনে আমাদের সঙ্গেই গেলেন। রথীবাবু ও প্রতিমা দেবীকেও এই ট্রেনে দেখিলাম। মেয়েদের গাড়ীতে ভীড়ের আতিশয্যে বেশীক্ষণ টিকিতে পারিলাম না। মাঝের একটা স্টেশনে নামিয়া পড়িয়া ছেলেদের গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এখানেও ভীড় ছিল, তবে গাড়ীটা বড়, নিঃশ্বাস ফেলা গেল। বর্দ্ধমানে সর্ব্বদাই খাবার কেনা ও খাওয়ার ধুম পড়িত, এবারেও সেটা বাদ গেল না।

বোলপুর স্টেশনে নামিয়া দেখা গেল যে, দ্বিপুবাবুর

জুড়িগাড়ী এবং ছোট একটি মোটর বস্ হাজির আছে। মোটর বস্-এ একটা তক্তা বেঞ্চির মত করিয়া পাতিয়া আমরা পাঁচ-ছয় জন মহিলা তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। পুরুষরাও জন-দুই উঠিলেন। জুড়িগাড়ীতে কয়েকজন চড়িলেন, বাকি সকলে হাঁটিয়াই চলিলেন। আমাদের কিন্তু মোটর চড়াটা বিশেষ কাজে লাগিল না। মাইল খানেক গিয়া সেটি বেশ কায়েমী ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। অগত্যা মেয়েরা নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িলেন। এবারেও সোজা রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং তিনিই বাহির হইয়া আসিলেন সর্ব্বাগ্রে। যাহা হউক, এবার অতিথিসৎকার করিবার জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে নেপালবাবু এবং ছেলের দল হাজির ছিলেন, সুতরাং কবিকে আর উদ্বিগ্ন হইতে হইল না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও আরও দু-এক জনের সঙ্গে দেখা করিয়া আমরা আগের মত শান্তিনিকেতন ভবনে :গিয়া উঠিলাম। বিশ্রাম করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে আসিতেছিল, সেগুলির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে জিনিস আসিয়া পৌঁছিল। স্নানাদি সারিয়া ও জলযোগ করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। সন্তোষবাবু অসুস্থ আছেন শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীর

দিকে চলিলাম। পথে মীরা দেবী, কমলা দেবী, দিনুবাবু প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। সেখানে খানিক কথাবার্ত্তার পর উঠিয়া পড়িতে হইল, দেখিলাম আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলাম তিনি ও বাবা দোতলার ছাদে বসিয়া আছেন। এই বাড়ীর প্রায় সামনাসামনি, মাঠের মধ্যে একটি বাঁধানো বেদীর মত ছিল, সেইখানে বসিয়া সকলে গল্প করিতে লাগিলাম। ট্রেনের কষ্টে মাথাটা অত্যন্ত ধরিয়া উঠিয়াছিল, বেশীক্ষণ বসিতে না পারিয়া, একলাই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর গোটাকয়েক খাটিয়া পাতা ছিল, তাহারই একটায় শুইয়া পড়িয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতে যদি মাথাটা ছাড়ে। অল্পক্ষণ পরেই মীরা দেবী ও আমার সঙ্গিনীরা আসিয়া জুটিলেন, এবং শুশ্রূষার ধুম লাগিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, তাই সকলকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। নিজের মাথা লইয়া এত কাণ্ড করার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। বিশ্রাম করিয়া খানিকটা সুস্থও হইয়াছিলাম।

সকলে মিলিয়া আবার বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল যে "বাঙাল সভা" হইবে, আমাদের সেখানে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সকলেই উৎসুক হইয়া চলিলাম, 'বাঙাল সভা'র নাম ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে কোনো অধিবেশনে কখনও উপস্থিত থাকি নাই। শুনিলাম অন্যান্য অতিথিরাও আসিতেছেন এবং স্বয়ং কবিও উপস্থিত থাকিবেন। পথেই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে খোঁজ করিলেন যে আমার মাথা ধরা কেমন আছে, তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা চল বাঙাল সভায়, তাদের কথা শুনলে বোধ হয় তোমার মাথা ছেড়ে যেতে পারে।"

খোলা মাঠেই সভা হইতেছিল। মেয়েরা ও মান্যগণ্য অতিথিবর্গ তক্তপোষে বসিলেন, ছেলের দল বসিল মাটিতে শতরঞ্চি বিছাইয়া। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুকুমারবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে সুকুমারবাবুর পত্নী শ্রীমতী সুপ্রভাকেই সভানেত্রী করা হোক, কারণ আজন্ম কলিকাতা বাস করিয়া সুকুমারবাবুর বাঙালত্ব খানিকটা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা রাজী না হওয়াতে সুকুমারবাবুই সভাপতির পদে বাহাল রহিলেন। সভার কার্য্য-তালিকা বেশী বড় ছিল না।

একটি গল্প, একটি বিজ্ঞাপন ও একটি রিপোর্ট পড়া হইল, সবই বাঙাল ভাষায়। দুইটি গান হইল, একটি বাঙাল ভাষায়, অন্যটি সাধারণ বাংলা ভাষায়। সভার কার্য্য যথাসম্ভব বাঙাল ভাষাতেই হইতেছিল। অনেকে উঠিয়া ছোট ছোট বক্তৃতা দিলেন, বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক, "তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।" বক্তাদিগের ভিতর নাম মনে পড়ে দুইজনের, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকেও তাঁহার মামার বাড়ীর (মালদহ) ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথকেও সভাপতি অনুরোধ করিলেন তাঁহার মামার বাড়ীর ভাষায় কিছু বলিতে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, খুলনার ভাষার মাত্র দুইটি কথা তিনি জানেন, তাহাতে বক্তৃতা দেওয়া চলে না। সে কথা দুইটি হইতেছে "কুলির অম্বল ও মুগির ডাল।" অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দিলেন অতি কষ্টে। বেশ পূরাপূরি বাঙাল ভাষা হইল না।

সভাভঙ্গের পর সকলে শান্তিনিকেতন ভবনে ফিরিয়া গাড়ী-বারান্দার ছাদে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন বাঙাল সভায় গিয়া আমার মাথার কিছু উপকার হইয়াছে কিনা। বীরভূমের ভাষার খানিক নকল করিয়া শুনাইলেন। মাকে একবার বাঁকুড়ার ভাষা বলিতে অনুরোধ করিলেন, মা সঙ্কোচবশতঃ কিছু বলিলেন না। What is Art? নামক একটি প্রবন্ধ কিছুদিন আগে লিখিয়াছিলেন, সেইটি আমরা শুনিতে চাহিলাম। তিনি রাজী হইলেন, তবে কার্য্যগতিকে সেটি শোনা হইল না। অন্য অনেক জিনিষ শুনিলাম। শ্রীমতী সুপ্রভা অতি সুগায়িকা, কবি তাঁহাকে নূতন গান শুনাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলের দল রাত্রির খাবার বহন করিয়া এই বাড়ীতেই উপস্থিত হইল। মীরা দেবীর কন্যাটি তখন একান্তই ছোট, তবু অতিথিদের খাওয়ার তদারক করিতে তিনি সঙ্গে আসিলেন। কিন্তু আমরা খাইতে বসিতে বেশ খানিক দেরি করাতে, বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অতিথিদের খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়াই রহিলেন। এবার দেখিলাম খাবারের সঙ্গে মাছ দেওয়া হইয়াছে। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও কবি কিছুক্ষণ ছিলেন, বাবার সঙ্গে ইয়োরোপীয় পলিটিক্স্ লইয়া খানিক আলোচনা করিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন।

ভোরবেলা বালকদের বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। "নূতন করে নূতন প্রাতে, আমারে দিই তোমার হাতে" গানটিই তাহারা সকালে বেশীর ভাগ গাহিত। উঠিয়া পড়িয়া, মুখ হাত ধুইয়া লাল মাটির পথ ধরিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। বেশী দূর যাইতে ভরসা হইল না, কারণ জানিতাম অল্পক্ষণ পরেই সকালের জলযোগের জন্য হাঁকডাক পড়িয়া যাইবে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ছেলেরা জলখাবার লইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জলযোগ সারিয়া কমলা দেবীর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পুরুষ-অতিথির দল সেইখানেই চা খাইতেছেন। দিনুবাবুর বাড়ীটি চায়ের আড্ডার সময় অবারিত-দ্বার ছিল, কখনও সেখানে লোকের অভাব দেখিতাম না ; খোলা বারান্দাতেই এই আড্ডাটি বসিত। চা খাওয়া, গান, গল্প, সমানভাবে চলিতে থাকিত।

রবীন্দ্রনাথ বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিলাম। প্রতিমা দেবীর এখানে আসিয়াই অসুখ করিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কবি শান্তিনিকেতন ভবনে যাইতেছেন মেয়েদের নূতন গান শুনাইবার জন্য। শুনিয়াই সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম।

দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ আগেই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাণপণ জোরে হাঁটিয়াও তাঁহার সঙ্গ ধরিতে পারিলাম না। পুরুষ-অতিথিদের ভিতর যে ক'জনের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ ছিল, তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। দোতলার মাঝের ঘরটিতে কবি বসিয়া সকালের ডাকের চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করিতেছেন দেখিলাম। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "কি গো এসেছ? আমি ভাবছিলুম যে তোমরা আসবে না, আর আমি খালাস পাব এই ব'লে যে আমার কথা আমি রেখেছি।" গান শিখিতে বসা গেল, তবে শ্রোতা এত বাড়িয়া গেল যে শেখা বিশেষ হইল না। অনেকগুলি নূতন গান শোনা হইল বটে। ইহার পরে The Nation বলিয়া একটি নূতন প্রবন্ধ তিনি পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠের পর খানিকক্ষণ আলোচনাও চলিল, প্রবন্ধটি এ দেশে প্রকাশ করা চলে কি না সেবিষয়ে কথাও হইল। বৈঠক ভাঙিয়া যাওয়ার পর আমরা স্নানের চেষ্টা দেখিলাম। মানুষ জুটিয়াছিল অনেকগুলি, স্নানের ঘর মাত্র দুইটি, কাজেই অনেকটা দেরি হইল। কলিকাতা হইতে ছুটি উপভোগ করিতে আসিয়াছি, সুতরাং আলস্যচর্চ্চাও চলিতেছিল প্রচুর। অনেকক্ষণ পরে সকলে স্নান সারিয়া মীরা দেবীর ওখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেহলীর পাশে এক সার

মাটির ঘর আছে, কয়েকজন অধ্যাপক তখন সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। এই ঘরগুলির সামনের বারান্দায় আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। সুকেশী দেবীকে এইখানে এবার প্রথম দেখিলাম। তিনি খুব যত্ন করিয়া আমাদের নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আর একবার প্রতিমা দেবীকে দেখিতে গেলাম। তিনি তখন কিছু সুস্থ হইয়াছেন। পর দিন "অচলায়তন" অভিনয় হইবে, বাড়ীময় তাহার সরঞ্জাম ছড়ানো। কবি একবার আসিয়া দিনুবাবুর সঙ্গে অভিনয় সম্বন্ধে আলাপ করিয়া গেলেন। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগ্‌ড়ি বাঁধিবেন, না খালি মাথায়ই রঙ্গমঞ্চে নামিবেন এই ছিল তাঁহার জিজ্ঞাস্য। দিনুবাবু কিছু মত প্রকাশ করিলেন না। রবীন্দ্রনাথ কমলা দেবীকেও একবার পাগ্‌ড়ির বিষয় প্রশ্ন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমরা সেখান হইতে ফিরিবার মুখে আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি শ্রীমতী সুপ্রভাকে গান শিখাইবার আশ্বাস দিয়া, তাঁহার খাওয়া হইয়া যাইবার পর তাঁহার ঘরে আসিতে বলিলেন। খাওয়ার পরেই গান শিখাইতে বসিলে তাঁহার কষ্ট হইবে, আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি যা খাই, তাতে

আমার পেটে বিশেষ জায়গা নেয় না, আমার বিশ্রামের কোনই দরকার হয় না, তোমাদের যখন খুসি এস।" এই বলিয়া তিনি নিজের উপরের ঘরে উঠিয়া গেলেন। আমরা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইলাম।

বেলা তিনটার পর গান শিখিবার আশায় চলিলাম। গান অনেকগুলি শেখা ও শোনা হইল। গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ একজন অধ্যাপককে ডাকিয়া পরের দিনের অভিনয় সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। একজন অন্তরীণ ছাত্রের মা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি আমার সামনে বেরতে আপত্তি করবেন না?" আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই ত মানুষ বাঁচিয়া যায়, আপত্তি আবার করিবে কিসের জন্য? গান শেখা শেষ করিয়া আমরা ত বাড়ী ফিরিলাম, এবং বিকালে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এমন সময় সন্তোষবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র ইংরেজী অনুবাদ পড়া হইবে, গুরুদেব এইখানে আসিতেছেন। তখনকার আশ্রমে বড় ঘর বলিতে শান্তিনিকেতন ভবনের এই

দোতলা ঘরটিই ছিল, সুতরাং সভা করিয়া বসিতে হইলে, এইটিতেই বসিতে হইত। আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের বিছানাপত্র সরাইয়া ঘরটি পরিষ্কার করিলাম, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আরও দু-চার জনের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তিনটি অপরিচিতা মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন অবগুণ্ঠিতা প্রৌঢ়া চৌকাঠের কাছে নতজানু হইয়া কবিকে প্রণাম করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন। শুনিলাম ঐ প্রৌঢ়া মহিলাই সেই অন্তরীণ ছাত্রটির মা। ইহার পর পড়া আরম্ভ হইল। মূল বাংলা নাটিকাটির চেয়ে ইংরেজী তর্জ্জমাটি অনেকের বেশী ভাল লাগিল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে আরও একদল মহিলা অতিথি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সভা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের উপর এঁদের সব ভার রইল, তোমরা এঁদের খাইয়ে দাইয়ে বেণুকুঞ্জে নিয়ে আসবে, সেখানে "বিসর্জ্জন' পড়া হবে।" বলদের বস্‌টিও আসিয়া পড়িয়াছে দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিথি নামিলেন অনেকগুলি। সকলের এখানে স্থান-

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে
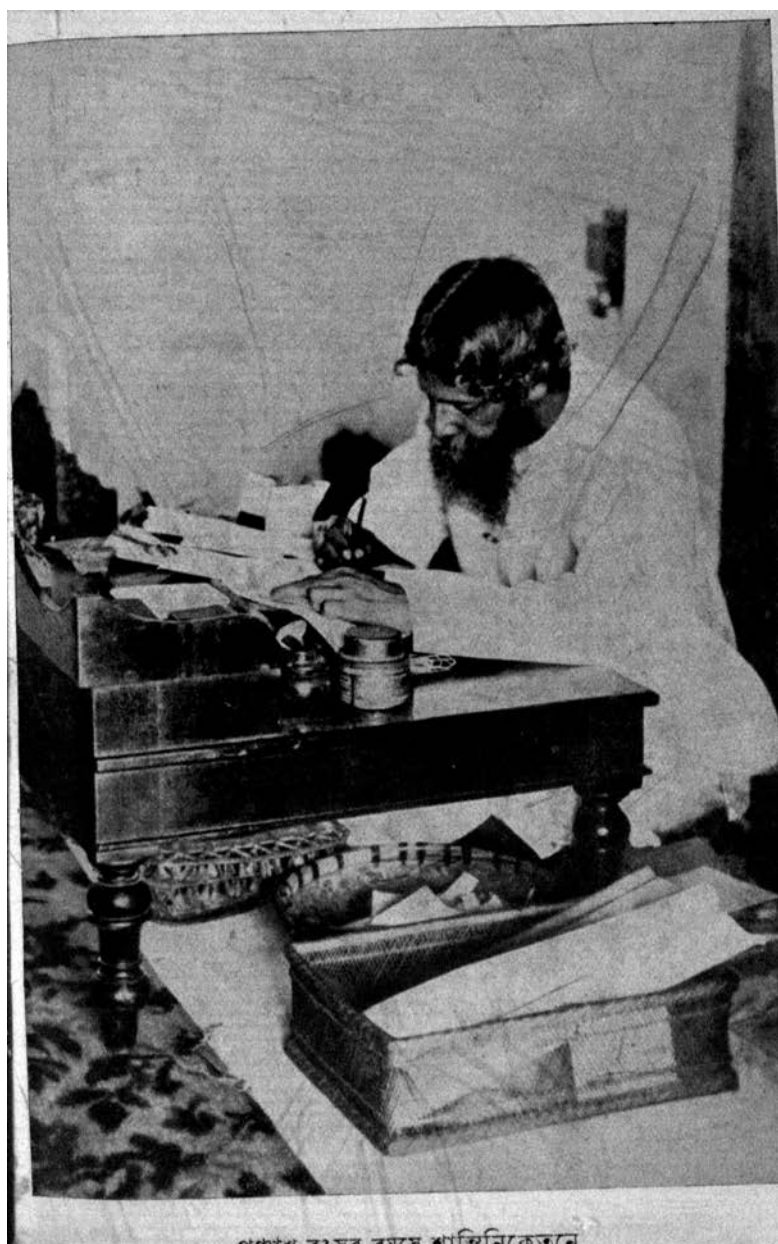
সংকুলান না হওয়াতে কয়েকজন নীচু বাংলায় চলিয়া গেলেন। কবির আদেশমত সকলকে জলযোগ ইত্যাদি করাইয়া সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। ইঁহাদের ভিতর অনেকেই এই প্রথম শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন, কাজেই চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে দেরি হইয়া গেল। কিন্তু "বিসর্জ্জন" পাছে শোনা না হয়, সে ভয়ও ছিল, সুতরাং অনেক তাড়া লাগাইয়া কোনোমতে সকলকে টানিয়া লইয়া পাঠের জায়গায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কবি আসিয়া বসিয়া আছেন, এবং শ্রোতাও অনেক জুটিয়াছেন। কলিকাতা হইতে এবার অতিথি-সমাগম মন্দ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ "বিসর্জ্জনে"র ইংরেজী অনুবাদটি পাঠ করিলেন। পড়া শেষ হইবার পর সামনে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া সহাস্য মুখে প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, কেমন লাগল ?" কেহ কিছু উত্তর দিবার আগে বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এরা সব শুনবার আগেই বললে 'যেমনই হোক, আমরা জোর করেই বলব যে বাংলার চেয়ে খারাপ হয়েছে'।" অতিথি-দের ভিতর অনেকেই তখন বিনীতভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করিলেন। পড়া শেষ হইবার পর সকলে বাহির হইয়া আবার একটু বেড়ানো গেল।

শুনিলাম সস্ত্রীক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তখনই আসিবেন। কমলা দেবীরা সকলেই তাঁহাদের জন্য সেই বাঁধানো চাতালে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন দেখিলাম। কবি তাঁহার ঘরের সামনের খোলা ছাদে বসিয়া। আমরা আশ্রমের সামনের লাল মাটির পথটি ধরিয়া অনেক দূর বেড়াইয়া আসিলাম, নূতন শেখা গানগুলিরও কিছু চর্চ্চা হইল।

রাত্রে একটি সংস্কৃত অভিনয় হইবে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং খুব বেশী দূর না গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয় আসিলাম। গুরুসদয় দত্ত ও সরোজনলিনী আসিয়াছেন দেখিলাম।

অভিনয় মুক্ত আকাশের নীচে হইবে বলিয়া প্রথমে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আকাশে সামান্য একটু মেঘ-সঞ্চার দেখিয়া, নাট্যঘরের ভিতরেই অভিনয়ের আয়োজন হইল। "বেণীসংহার" নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হইল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে নাটকের আখ্যানবস্তু বাংলায় বলিয়া গেলেন। ছাত্রেরা, বিশেষ করিয়া শিশু বিভাগের দল "সাধু, সাধু" করিয়া প্রচুর সাধুবাদ দিল। সঙ্গীতাচার্য্য ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় সূত্র-ধররূপে দেখা দিলেন। তিনি সংস্কৃত গান গাহিয়া, রঙ্গ-

মঞ্চে ফুল ছড়াইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আসল অভিনয়টুকু হইল। ইহাতে বেশী সময় লইল না দেখিয়া সভাস্থ সকলের অনুরোধে, সুকুমারবাবু তাঁহার "শব্দকল্পদ্রুম" নামক কৌতুক-নাট্যটি পাঠ করিলেন। ইহার গানগুলিও হইল বটে, তবে তাঁহার দলের লোকেরা এখানে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে গান গাহিলেন।

ইহার পর ফিরিয়া গিয়া রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করা গেল। আমাদের আড্ডাটিতে সেদিন বেজায় ভীড়, তাহা রবীন্দ্রনাথও দেখিয়াছিলেন। খাওয়ার পর আমরা যখন নিদ্রার চেষ্টায় ফিরিয়া চলিয়াছি, তখন আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ভীড় বেশ হয়েছে, দেখো যেন ঝগড়া কোরো না।" রাত্রিটা বারান্দায় শুইয়া ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল, কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিবার প্রয়োজন হইল না।

ভোরবেলা বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। আজ গান শুনিলাম, "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।" অন্য সকলে উঠিবার আগে, আমরা কয়জন উঠিয়া পড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিলাম, তখনও তিনি ছাদে উপাসনায় বসিয়া আছেন।

খানিক বেড়াইবার পর ফিরিয়া আসিলাম যখন, তখন আর তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। আজ তাঁহার জন্মদিন, আম্রকুঞ্জে ছেলের দল তখন ফুল, পাতা, আলপনা দিয়া সভাস্থল সাজাইতেছে। ইহার ভিতর আবার আমাদের জলযোগ-পর্ব্বও সারিতে হইল।

উৎসবের সময় হইতেই দুইটি ঘণ্টা একসঙ্গে বাজিয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। দলে, দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা গিয়া আম্রকুঞ্জে সমবেত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেনে আরও অতিথি আসিয়াছেন দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। পদ্মপত্র ও পদ্মফুলে সজ্জিত একটি মাটির বেদীর উপর তাঁহার আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। আশ্রমের কয়েকটি ছেলে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বেদ-গান করিল। ক্ষিতিমোহনবাবু উপনিষদের মন্ত্র পাঠ ও নেপালবাবু তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভীমরাও শাস্ত্রী মিলিয়া তাহার পর সম্বর্দ্ধনাসূচক কতক-গুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনটি বালক কবিকে চন্দন, মাল্য ও দূর্ব্বাদলের সূত্র

উপহার দিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিলেন। পরে গান আর হইল না। কবি উঠিয়া সভা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রণাম করিতে উৎসুক অতিথি ও ছাত্রদলের হাত ছাড়াইয়া বেশী দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার ঘরের সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত সকলে আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ইহারই অল্প পরে মেয়েদের তিনি গান শিখাইতে ডাকিতেছেন শুনিয়া তাঁহার দোতলার ঘরে গিয়া দেখিলাম ইহারই মধ্যে সভা বসিয়া গিয়াছে, গানও গোটাকতক হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। ছোট ঘরটিতে ক্রমেই লোক বাড়িতে লাগিল, শেষে যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা ঘরে স্থান না পাইয়া বাহিরে সিঁড়িতেই বসিয়া পড়িলেন। গান বেশ অনেকগুলিই হইল।

রবীন্দ্রনাথ আর দুই-একদিন পরেই দার্জ্জিলিং যাইবেন শুনিতেছিলাম। গানের মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিলেন বিদায় লইতে, তিনি সেই দিনই কোথায় যাইতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ছুটির মধ্যে দার্জ্জিলিং যাইবেন কিনা। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, "কাছাকাছি যেতে পারি, একবার কালিম্পং যাব বোধ হয়।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে একবার দার্জ্জিলিঙেও

আসুন না ?" ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, "সেখানে গিয়ে কি আর ব্রজের রাখালদের মথুরার রাজার সঙ্গে দেখা হতে পারবে ?" কবি হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক হবে। আপনি গিয়ে পড়লেই হবে।" ক্ষিতিমোহনবাবু তখনই চলিয়া গেলেন।

উপস্থিত মহিলাদের ভিতর একজন "ধীরে বন্ধু গো, ধীরে ধীরে," গানটি শুনিতে চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনই সেটি গাহিয়া শুনাইলেন।

বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। ফিরিয়া গিয়া স্নানাদি সারিতে অনেক দেরি হইয়া গেল। তাহার পর দুপুরের খাওয়া খাইতে গিয়া, সেই-খানেই দুপুর কাটাইয়া আসিলাম। অতিথিদের ভিতর একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের খুকী ছিল, সে পাঁচ-ছয় মিনিট পরে পরে গিয়া উঁকি মারিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বেশী আদর করেন নাই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনেক-খানি অতৃপ্তির সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। এ খবরটা কবির কানেও গিয়াছিল এবং তিনি প্রচুর আদর করিয়া খুকীটির দুঃখও ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন।

রোদ পড়িবার পর সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাঁহারা এখানে নূতন আসিয়াছেন, তাঁহারা সারা আশ্রম মাঠ, খোয়াই, বন সব ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন, আমরা একটু এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া, ভুবনডাঙ্গার সেই বাঁধের ধারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঁধটির চার পাশেই তখন তাল গাছের সারি, দেখিতে সুন্দর লাগিত। এখন অনেকটাই ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া, একেবারে রাত্রির খাওয়া খাইয়া, "অচলায়তন" দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল ইহার মধ্যে।

প্রথম বার "অচলায়তন" যেমন দেখিয়াছিলাম, এবার ঠিক সেরকম বোধ হইল না। অদীনপুণ্য এবং পঞ্চকের ভূমিকা আগেকার মত রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ আগের বার যেরকম পোষাক করিয়াছিলেন, এবার আর তাহা করেন নাই, শুধু গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরিয়াই রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। দর্শকদের গান এবার তেমন জমিতেছে না দেখিয়া তিনি পিছন হইতে "ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি," গানটিতে যোগ দিলেন। দর্শকরা সচকিত হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ যেন অদৃশ্য স্বর্ণবীণার ঝঙ্কারে অভিনয়ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল।

নূতন আগন্তুকরা বিস্মিতভাবে এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। অভিনয় শেষ হইল "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি হইয়া।

নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া দেখা গেল যে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ প্লাবিত। খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ চুকিয়া গিয়াছে, তখনই শুইতে যাইবার ইচ্ছা কাহারও ছিল না। মস্ত এক দল বাঁধিয়া সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলাম। দুই-এক জন রাত্রের ট্রেনে ফিরিবার জন্য স্টেশনের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের টানিয়া ফিরাইয়া আনা হইল। সুরুলের দিকের মাঠ ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলাম। মাঝে একবার মাঠেই বসিয়া গানের আসর জমানো হইল। যে যাহা নূতন শিখিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা দিলেন। আবার একবার গভীর কালো মেঘে আকাশের এক দিক্ ঢাকিয়া গেল, আর এক দিকে তখনও উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সে এক অপূর্ব্ব শোভা! যাহা হউক, বৃষ্টিতে ভিজিবার ইচ্ছা বিশেষ কাহারও ছিল না। সুতরাং যাঁহারা এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, হাঁক ডাক করিয়া তাঁহাদের সকলকে একত্র করা গেল। বৃষ্টি নামিবার আগেই তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া কোনোমতে আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর

আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রায় চৌকাঠ মাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। রাত অনেক হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর দেরি না করিয়া বিছানা পাতিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। মহিলা-অতিথিদের মধ্যে অনেকেই প্রস্থান করিয়াছেন দেখিলাম, সুতরাং আজ আর জায়গার টানাটানি পড়িল না।

২৬শে বৈশাখ নীরবেই দেখা দিল। বিদ্যালয় ছুটি হইয়া গিয়াছে, অনেক ছেলে রাত্রের ট্রেনে চলিয়াও গিয়াছে, কাজেই আজ আর বৈতালিক গান হইল না। আমরা নীচে নামিয়া দেখিলাম, চারিদিক্ আজ নিস্তব্ধ। নিজেদেরও আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিদায় লইতে হইবে ভাবিয়া কেমন যেন মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন বুধবার, আশ্রমের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। আজ আর গান হইল না। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন এবং অবশিষ্ট ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। ন'টার সময় আর একটি ট্রেন, কলিকাতা-যাত্রী একদল সেই ট্রেন ধরিতে প্রস্থান করিলেন। আমাদের তখনও ঘণ্টা-কয়েক দেরি ছিল, আমরা গিয়া মীরা দেবীর বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ একবার নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই-সব যাওয়ার হাঙ্গাম চুকে গেলে

শান্তিনিকেতনে একটা বৈঠক হবে, তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে।"

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের যাত্রা দেখা গেল, তাহার পর ভগ্নাবশিষ্ট দলবল লইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন অল্পক্ষণ পরেই। "রাজা ও রাণী"র ইংরেজী তর্জ্জমাটি পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর খানিকক্ষণ এই নাটকটি সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটা মানুষের অত্যাচারে স্বাভাবিক থাকিতে পারে নাই, তাহা অত্যুক্তির দ্বারা ভারাক্রান্ত ও বিকৃত হইয়াছে অনেক স্থলেই। প্রেম যখনই কেবল মাত্র কামনা হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার ভিতর কল্যাণ থাকে না। Age of chivalryকে তিনি এই-সব আপদের জন্য অনেকাংশে দায়ী করিলেন।

কে একজন Cult of Nationalism প্রবন্ধটি শুনিতে চাহিলেন, কিন্তু সেটি পড়িতে অনেক সময় লাগিবে বলিয়া তখন তিনি সেটি পড়িলেন না। একটু পরেই সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। কবি চলিয়া গেলেন। একবার শুনিলাম তিনি আমাদের সঙ্গেই কলিকাতা যাইবেন, আবার শুনিলাম পরের দিন যাইবেন।

স্নানাদি সারিয়া খাইতে গেলাম নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটিতে। আজ খাওয়া হইতে একটু দেরি হইল। ভাঙাহাটে কাহারও কোনো কাজে উৎসাহ নাই। যে ক'টি ছাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের খাইতে আরও দেরি হইল, কারণ তাহারা যে আছে তাহা বিশেষ কাহারও মনে ছিল না এবং নেপালবাবু তাহাদের চাল বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুলুকে লইয়া আমাদের শান্তিনিকেতনে ঘর বাঁধিয়া থাকার একটা প্রস্তাব কিছুকাল হইতে চলিতেছিল। সে রুগ্ন ছিল বলিয়া তাহাকে বোর্ডিঙে রাখার ইচ্ছা কাহারও ছিল না, অথচ এইখানে পড়াইবার ইচ্ছা সকলেরই ছিল। থাকা যে হইবে ইহা এইবার পাকাপাকি স্থির হইল। তখন যে বাড়ীটিকে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলা বলা হইত, তাহারই অল্প দূরে একটি মাটির বাড়ী ছিল। কে একজন উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করিবার জন্য, কিন্তু কি একটা দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহারা বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীটিই আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল। এখানে থাকিবার প্রস্তাবে যে আনন্দের প্রবাহ মনের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল, তাহা এতকাল পরেও অনুভব করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ একবার নীচে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "শুনলুম তোমরা নাকি আমার প্রতিবেশিনী হবে, তাহ'লে তোমাদের অনেক কাজে লাগাতে পারব।" আমি বলিলাম, "আমরা আর কি কাজে লাগব?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ঢের কাজ আছে। দেখো তখন।" বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে উপরে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। জিনিষপত্র যাহার যা গুছাইবার ছিল গুছানো হইয়া গেল। কমলা দেবী আসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করিয়া গেলেন। তাহার পর যান-বাহন সব আসিয়া জুটিল। আর একপালা সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া ও রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ীগুলি পথে যত রকম তামাশা দেখাইতে পারে, কিছুর ত্রুটি রাখিল না। সুকুমার-বাবু সঙ্গে থাকাতে সারাপথ হাসির খোরাক জুটিল বিস্তর। এবার সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনে ভীড় ছিল না। একটা কামরা একদম খালি পাওয়া গেল, কাজেই বেশ আরামেই কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকালটা দার্জ্জিলিঙে কাটাইবেন একথা শান্তিনিকেতনে থাকিতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম আমরা ফিরিবার পরদিনই তিনি সপরিবারে কলিকাতায়

আসিলেন। তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ আগে চলিয়াও গেলেন। পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং যাইবেন না, তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া চলিয়াছেন।

মাঝে একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। উপরে ছিলাম, নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি বাবার ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছেন। মাটির বাড়ীটি তখনও একটু মেরামত হইতেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ মাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ছুটির মধ্যে কিছুদিন গিয়া অধ্যাপকদের কাহারও বাড়ী অধিকার করিয়া থাকিয়া আসিতে। ছুটিতে তখন প্রায় সব ক'টি ঘরই খালি। মা যাইতে আনন্দের সঙ্গেই রাজী হইলেন।

পাশের বাড়ীতে গান হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার সেদিকে মন দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের পাশের বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চ্চা হচ্ছে? আমারই যেন কি একটা হচ্ছে, ঠিক ধরতে পারছি নে।"

তাঁহার উপন্যাসগুলিতে কি কি chronological ভুল আছে সেই বিষয়ে এক ব্যক্তি একটি গবেষণাপূর্ণ চিঠি পাঠাইয়াছেন বলিলেন। তখন আমরা সবে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতনে গেলে গল্প

লেখার কি রকম স্থবিধা হইবে, সে বিষয়ে একটা লোভনীয় চিত্র আঁকিয়া দিলেন। মা বলিলেন, "শুধু আপনি ওখানে থাকলেই ওদের খুব আনন্দ হবে।" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হঁ্যা, গান শুনবার স্থবিধে হবে বটে।"

বাবার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ European politics and war বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে ত আবার বোলপুরেই দেখা হবে।"

মে মাসের শেষের দিকে আবার কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া আসিলাম। বিকালের গাড়ীতে যাত্রা করা গেল। পথে দারুণ বৃষ্টি, কামরার ভিতরে পর্য্যন্ত জল পড়িতে লাগিল। গন্তব্যস্থানে পৌছিলাম রাত দশটার পর। নেপালবাবু আসিয়াছিলেন আমাদের লইতে, বস্‌খানিও হাজির ছিল, স্থতরাং ভালয় ভালয়ই আসিয়া পৌছিলাম। তখনকার মত শান্তিনিকেতন অতিথি-শালাতেই আশ্রয় গ্রহণ করা গেল, পরদিন উঠিয়া দরকার বোধ হইলে অন্য ব্যবস্থা হইবে, ইহাই স্থির রহিল। নেপালবাবু বলিলেন, "কবি বোধ হয় তিন-চার দিনের মধ্যে

তিন্‌ধরিয়া যাচ্ছেন, তাঁর গরমে বড় কষ্ট হচ্ছে।" শুনিয়া ভাবিলাম তাহা হইলে আর আমাদের আসার কি প্রয়োজন ছিল ?

সঙ্গেই খাবার ছিল, খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়া গেল। সকালে উঠিয়া আশ্রমের এক নূতন রূপ দেখিলাম, নির্জ্জন নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও যেন নাই। তবু সবই যেন পরিপূর্ণ, শূন্যতার কোন অনুভূতি মনের মধ্যে আসিল না।

মুখ হাত ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর দিকেই চলিলাম। পথে নেপালবাবু ও শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন। মা ও বাবা তখনও উঠেন নাই শুনিয়া তাঁহারা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। কমলা দেবীকেও দূর হইতে তাঁহার বারান্দায় দেখিতে পাইলাম।

দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছাদের উপর তখনও উপাসনার আসনে বসিয়া আছেন। কমলা দেবীর বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে কবি নামিয়া আসিলেন। আমরা গিয়া প্রণাম করাতে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া চা খাইবার জন্য নীচের ছোট খাইবার ঘরটিতে প্রবেশ

করিলেন। আমরা সারা সকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াই কাটাইয়া দিলাম। অন্যান্যবার গল্প করিবার মানুষ পাওয়া যাইত প্রচুর, এবার ছুটির সময় বিশেষ কেহ এখানে ছিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিলাম।

মা স্থির করিলেন অতিথিশালায় না থাকিয়া নেপালবাবুর বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন। নেপালবাবুর পরিবারবর্গ তখন দেশে, তিনি নিজে ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন, সুতরাং আমরা গিয়া তাঁহার ঘরদুয়ার দখল করিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ঐ কয়দিন আমরা তাঁহার অতিথিরূপে বাস করি, তবে মা নিজে যা ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তিনি কিছু বাধা দিলেন না। তবে আমাদের আলাদা সংসার করাটা নামে মাত্রই হইল। তিনবেলা তাঁহাদের কাহারও না কাহারও বাড়ী হইতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পৌছিতে লাগিল, চাকর ও বামুনও তাঁহারাই দিলেন। অধ্যাপকদের কুটীরগুলিতে প্রবেশ করিতে হইত একটি মধুমালতীলতার গেট দিয়া, উঠানে এবং বারান্দায় সর্ব্বদাই দু-একখানি তক্তপোষ পাতা থাকিত। বাড়ীটির প্রধান আকর্ষণ এই ছিল যে সেটি রবীন্দ্রনাথের ঘরের ঠিক পাশেই। মা সংসার পাতিতে

লাগিলেন, আমরা বেড়াইয়া, ঘুমাইয়া এবং বারান্দায় বসিয়া আলস্যচর্চ্চা করিয়া বিকাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম অত্যন্ত কড়া রকমই ছিল, কিন্তু তখনকার দিনে গরমে কষ্ট হইত না।

বিকাল হইয়া আসিলে সেই ফুলগাছের বেড়ার ওপাশে তক্তপোষের উপর গিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও কমলা দেবী আসিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুরানো চাকর উমাচরণের কিছুদিন আগে মৃত্যু হইয়াছিল। এ লোকটিকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। এখন আর ভাল চাকর কিছুতেই পাওয়া যাইতেছে না, বড়মার কাছে শুনিলাম। সেক্রেটারী রাখার চেষ্টাও হইয়াছে শুনিলাম, তাহাতেও সুবিধা হয় নাই। ভদ্র-লোকেরা কবির স্নেহে এমনই আত্মহারা হইয়া যান যে নিজেদের অধিকারের সীমা কোথায় তাহা তাঁহাদের মনে থাকে না। সাধারণ চাকরগুলি হয় অধিকাংশই বোকা, এবং বোকামি রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারেন না।

কবিকে সেই সকালের পর আর দেখি নাই, শুনিয়া-ছিলাম তিনি সবুজ পত্রের জন্য গল্প লিখিতে বসিয়াছেন, এবং দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর স্কুলে মীরা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত ফিরিলেন না

দেখিয়া সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে মাঝপথে হয় ত মোটরটার কল বিগ্‌ড়াইয়াছে। এই কথা উঠিতে না-উঠিতেই দেখা গেল মাঠের মধ্যের রাস্তা দিয়া মোটরখানি ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, দুই ধারে সার দিয়া চলিয়াছে সাঁওতাল শিশুর দল। মোটরকার তখনও বোলপুরে একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল।

গাড়ী শালবীথিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া পড়িয়া নিজের ঘরের দিকে না আসিয়া দ্রুতপদে শান্তিনিকেতনের দিকে চলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। কমলা দেবী তখনও সেখানে বসিয়া। আমার দিকে চাহিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি, কমলের সঙ্গে ভাব করছ?" পাশের একটি তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ বলিলেন, "আজ দার্জ্জিলিং থেকে আমার এক বকুনি এসেছে।" বকুনি যে কে দিয়াছেন ঠিক বুঝিলাম না, একটা আন্দাজ অবশ্য করিলাম। একখানি চিঠি বাহির করিয়া তিনি পড়িয়া শুনাইলেন, "আপনার ও ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের ভরসাতেই Prof. Geddes এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, যদি জানতেন যে আপনারা এমনি ক'রে desert করবেন তা হ'লে অমন কাজে

ছাতই দিতেন না।" চিঠিখানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, "তাই ভাবছি এত বকুনি খাওয়ার চেয়ে যাওয়া ভাল। যাওয়াই ঠিক করলুম।" তাঁহার যাত্রার সংবাদে সকলেই খানিকটা মুষড়াইয়া গেলাম।

তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, আমরাও সভা ভঙ্গ করিয়া ভিতরে ঢুকিলাম জলযোগ করিতে ও বৈকালিক বেশভূষা করিতে। শ্রীমান্ অশোক তখনও বারান্দায়ই বসিয়াছিলেন, তিনি কয়েক মিনিট পরে ভিতরের দিকে মুখ বাড়াইয়া খবর দিলেন, "রবিবাবু আসছেন।" কবি অন্য কোথাও যাইতেছিলেন বোধ হয়, তবু আমাদের বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া ফুলের গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শান্তিনিকেতনের গরমের সঙ্গে কৈশোরে গাজীপুরে যে গরম উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা করিয়া কয়েক মিনিট গল্প করিলেন, তাহার পরে চলিয়া গেলেন।

বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইলাম। পথে আর একবার কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। নিজের ঘরের সামনের ছোট ছাদটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত এখান থেকে আশ্চর্য্য সুন্দর দেখায়। আমার এই ছাতটি যদি না থাকত, তা হলে আমি হয় ত আরও

কিছুকাল আমেরিকায় থেকে আসতে পারতুম। আমার ছাতটাকে তোমরা মাঝে মাঝে কাজে লাগিও।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কবে যাবেন?” বলিলেন, “কালই যাব ভাবছি। তোমাদের অনুমতি দিয়ে গেলুম, আমার ছাত, ঘর, বই, সব ব্যবহার করতে পার।”

“প্রবাসী”তে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের এক সম্পাদক তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, “আর আমি তোমাদের কাগজে কবিতা লিখব না, বিক্রমপুরের বাঙাল শুদ্ধ, বলে কি না আমি ‘ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্’ করি।” কথা বলিতে বলিতে তাঁহারই সঙ্গে খানিক দূর বেড়ানো হইয়া গেল। বাবা এবং নেপালবাবুও এই সময় আসিয়া জুটিলেন। নেপালবাবু আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা বেড়াইতে যাইতে চাই কি না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “হ্যাঁ, শীগ্‌গির ঠিক ক’রে ফেল, বেড়াতে যাবে, না আমার ছাতে যাবে।” ঠিক করিতে অবশ্য আমাদের বেশী সময় লাগিল না, তিনি উপরে উঠিয়া যাইবার কয়েক মিনিট পরেই আমরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের দেখিয়া তিনি চাকরকে আদেশ করিলেন একটা মাদুর বা শতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া

দিতে। আমি বলিলাম, "থাক না, দরকার নেই।" হাসিয়া বলিলেন, "আছে যখন, তখন শুধু শুধু অনাদর করব কেন ?" তাঁহার পায়ের কাছের মাটির আসন আমাদের কাছে সম্রাটের সিংহাসনের চেয়েও মূল্যবান্ ছিল, অবশ্য তিনি যে আদর করিয়া বসিবার আসন দিতে বলিলেন, তাহারও মূল্য কিছু কম ছিল না।

ক্রমে ক্রমে অনেকেই ছাদে আসিয়া বসিলেন। বাংলা দেশের জমিদারদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অভিযোগ করিলেন। জমিদারীতে নিজে যখন বাস করিতেন, কত রকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হইত, তাহার গল্পও অনেক হইল। ব্রাহ্ম মেয়েদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গও একবার উঠিল। অনেক রাত্রে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম।

পরদিন বুধবার। আশ্রমের মন্দিরে সর্ব্বদাই বুধবারে উপাসনা হইত, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে তিনিই প্রায় আচার্য্যের কাজ করিতেন। ভোরবেলা উঠিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, পূর্ব্বাকাশের দিকে মুখ করিয়া ছাদের উপর ধ্যানের আসনে বসিয়া আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম রৌদ্রের আভা আসিয়া তাঁহার মুখে না পড়িত, ততক্ষণ এই ভাবেই বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু মন্দিরে উপাসনা সেদিন হইলই না। তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না বোধ হয়।

চা খাওয়ার পর একবার বাহির হইয়া আসিলেন। গরম এবং মশার কামড় কেমন উপভোগ করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর নিজের লেখার খুপ্‌রিটিতে উঠিয়া গিয়া বসিলেন। শুনিলাম সবুজ পত্রের সেই গল্পটি তখনও শেষ হয় নাই। যাত্রার আগে যদি শেষ করিতে পারেন, তাহা হইলে পড়িয়া শুনাইয়া যাইবেন। কমলা দেবীরাও কলিকাতা যাইতেছেন শুনিলাম। মীরা দেবী বোধ হয় কলিকাতাযাত্রীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পুত্র-কন্যাসহ এই সময় স্কুল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ হইয়াছে শুনিলাম। দিনুবাবুর হল ঘরে সেটি পড়া হইবে শুনিয়া একে একে সকলেই সেখানে গিয়া জুটিলাম। লোক তখন আশ্রমে খুব বেশী ছিল না। কবি খানিক পরে তাঁহার উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিলেন। খাতাপত্রের সঙ্গে তাঁহার হাতে এক জোড়া জাপানী জুতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া গেলাম। পরে বুঝিলাম যে তিনি তাহা দান করার উদ্দেশ্যেই লইয়া আসিয়াছিলেন। মায়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, "মেয়েদের পায়ে যে এটা হবে না তা দে'খেই বুঝতে পারছি। অতএব পদমর্য্যাদায় আপনিই যখন এ সভায় বড় তখন এটা আপনারই প্রাপ্য। ব্রাহ্মণ কন্যা

পরবেন।” মা প্রণাম করিয়া তাঁহার উপহার গ্রহণ করিলেন। জুতা-জোড়াটি কখনও পরেন নাই, তবে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেদিন যে গল্পটি রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন, তাহা পরে “তপস্বিনী” নামে সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পড়া শেষ হইলে পর, গল্পটির অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি লইয়া খানিক হাসাহাসি হইল। নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ গল্প হইল। সভা ভঙ্গ হইলে পর বেশ রোদ উঠিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় বাহিরে গরুর গাড়ীর চাকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বুঝিলাম যে এইবার যাত্রার আয়োজন হইতেছে। বাহির হইয়া দেখিলাম নানা রকমের ব্যাগ ও স্যুটকেস্ গাড়ীতে তোলা হইতেছে। কত যে দেশ-বিদেশের ছাপমারা সেগুলির উপর তাহার ঠিকঠিকানা নাই। সেগুলির অবশ্য অনেক ভ্রমণ তখনও বাকি ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে বিদায় দিতে আশ্রমের যে যেখানে ছিলেন সকলেই আসিয়া জুটিলেন। মীরা দেবী তাঁহার শিশুকন্যাকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মোটরকারখানি এবং দ্বিপুবাবুর জুড়ী গাড়ীটিও আসিয়া

দাঁড়াইল, কারণ তখনকার দিনে মোটরটির উপর সকলের পুরাপুরি আস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সময় উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। সাধারণ ধুতি চাদরই পরিয়াছেন, পাঞ্জাবীর গলার বোতাম দু-তিনটি খোলা, মাথায় একটি কাল মখ্‌মলের টুপি। ধুতির সঙ্গে টুপি তখনকার দিনে কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহাকে ইহাতেও আশ্চর্য্য সুন্দরই দেখাইল। বিধাতা তাঁহাকে রূপ দিয়াছিলেন অলোকসামান্য। তাঁহার নিখুঁত আর্টিষ্টের দৃষ্টি এবং রুচিও সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত, কখনও তাঁহাকে এমন পোষাক পরিতে দেখি নাই, যাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একটুও হানি হয়।

তাঁহার কন্যা তাঁহার পোষাকের কি একটু ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে বলিলেন, "যাক্ গে, ওর জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই।" নাতনীকে আদর করিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখাইলেন। শিশু ঘড়ির দিকে না তাকাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার টুপির দিকে চাহিয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার এখনও অনেক শিক্ষা বাকি আছে, বুদ্ধি সুদ্ধি থাকলে দামী জিনিষটার দিকেই আগে তাকাতে।"

আমি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করাতে বলিলেন, "আমি

ফিরে আসা পর্য্যন্ত থেকে যেও।" তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কমলা দেবীর বারান্দায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প হইল। মীরা দেবী স্কুলে ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমরা যেন পালিও না, আমি স্কুল থেকে আসছি।"

আরও কয়েকটা দিন থাকিয়াই গেলাম। খাইয়া, ঘুমাইয়া, বেড়াইয়া এবং মীরা দেবীর সঙ্গে গল্প করিয়া দিনগুলি কাটিয়া গেল। দার্জ্জিলিঙে বক্তৃতাদি হইতেছে এ-সব খবরও মাঝে মাঝে পাইতাম। কয়েক দিন পরে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

এই সময় "নিরেট গুরুর কাহিনী" নামক একটি ছোট ছেলেদের গল্পের বই লিখিয়াছিলাম। বই বাহির হইতেই রবীন্দ্রনাথকে একখানি পাঠাইয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং হইতে তাহার উত্তর পাইলাম। কপাল-দোষে সে চিঠিখানিও হারাইয়াছে। তিনি রসিকতা করিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন বইটি আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছি কিনা। গল্পগুলি হইতে তিনি নাকি একটি সদুপদেশ পাইয়াছেন যে পা কখনও ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্য তিনি স্বয়ং সর্ব্বদাই খুব গরম মোজা পরিয়া থাকেন।

এই সময় কবি কিছুদিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার

মহাশয়ের বাড়ী Glen Edenএ ছিলেন। নীলরতনবাবুর এক ভাইঝির বিবাহে এই সময় তাঁহার মেয়েরা দুই-তিন দিনের জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু খবর পাইলাম। কবি ওখানে গিয়া কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিলাম। এই সময় তাঁহার প্রথমা কন্যা বেলা দেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা কবির ঘোরতর উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল। বেলা দেবীর অসুখ বেশী বাড়িয়া যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং হইতে অল্প কিছুদিন পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

৩০শে জুন একবার আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। দার্জ্জিলিঙে অসুখে ভুগিয়া অনেকটা রোগা হইয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। আমাকে আবার সেই গল্পের বই লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যে তোমার বই সম্বন্ধে অত সন্দেহ প্রকাশ ক'রে চিঠি লিখলুম, তা কই তুমি ত আমায় কোনো রকম আশ্বাস দিলে না যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে লেখ নি? এত লোক থাকতে তুমি গুরুদের আক্রমণ কর কেন?"

তাহার পর বাবার সঙ্গে কাজের কথা পাড়িলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন এক series বই তাঁহার তৈয়ারি

করার ইচ্ছা আছে, সেগুলি সঙ্কলন ও সম্পাদনে সাহায্যের জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দরকার। কাহাকে রাখা যায় সে বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরাই বা সেক্রেটারি হতে পারবে না কেন? তোমাদের কি terms আমাকে গোপনে ব'লো, আমার যদি ক্ষমতায় কুলোয় তাহ'লে তোমাদেরই রাখব।" কথাটা তিনি যে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, না সত্যই বলিলেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কারণ তখনকার দিনে নিজের বিদ্যা বা বুদ্ধির উপর বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না; পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে কথাটার সবটাই অন্ততঃ ঠাট্টা ছিল না। অল্প পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

বোলপুরে কিছু দিন গিয়া থাকা আমাদের স্থির হইয়া গেল। বাবা সেই ছোট মাটির বাড়ীটি কিনিয়া লইলেন। এখানে আমরা দুই বৎসর ছিলাম। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতাম, আবার ফিরিয়া যাইতাম। বাবা, দিদি, আমি ও মুলু এইখানে থাকিতাম, মা শ্রীমান্ অশোককে লইয়া কলিকাতায় থাকিতেন, তিনিও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন। দাদা তখনও বিলাত হইতে ফিরেন নাই।

৩রা কি ৪ঠা জুলাই আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। মা ও অশোক সঙ্গেই ছিলেন, তবে দিন-দুই পরে তাঁহারা ফিরিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাড়ীটির চারধারে বারান্দা, মাঝে তিনখানি ঘর। রান্না-ঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি ঐ বারান্দা ঘিরিয়াই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে তৈয়ারি হইয়াছিল। বাড়ীখানির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল এই যে সেটি রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর অতি নিকটে। চোখে ত সারাক্ষণই দেখা যাইত, জোরে কথা বলিলে এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী শোনা যাইত। সামনের বারান্দায় ও বারান্দার নীচে, সবুজ ঘাসের উপর এক-একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল, আমরা ছেলেমেয়ের দল ত পারতপক্ষে এখান হইতে নড়িতাম না। তবে মা কলিকাতায় থাকায়, অবসর কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ঘরসংসার আমাদেরই দেখিতে হইত। তবে অল্প বয়সের উৎসাহে ঐ ছোট সংসারের কাজ আমাদের অতি অল্প সময়েই সাঙ্গ হইত, বাকি সময়টা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কাটাইতে পারিতাম। তখন আশ্রমের গণ্ডি ছোট ছিল, মানুষও অল্প ছিল, এই দুই বৎসরের নৈকট্যের ফলে অনেকে যেন আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। চলিয়া যখন আসিলাম, তখন বাহিরের দিক্ হইতে যোগসূত্র

ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু অন্তরের ভিতরে সেই আত্মীয়তা চিরকালের জিনিষ হইয়াই আছে।

প্রথম যখন আসিলাম তখনও রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায়ই আছেন। আমরা আসার দিন-দুই পরে তিনি শান্তি-নিকেতনে আসিলেন। আমি আসিয়াই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। নেপালবাবু বলিলেন ছোট ছেলেদের ইতিহাস পড়াইতে, আনন্দের সঙ্গে রাজী হইলাম।

ছোট ছেলেগুলি ভারি মজার ছিল। আমার তখন সবে নিজের পড়া শেষ হইয়াছে, পড়া জিনিষটার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন ছিলাম। কিন্তু আমার ছাত্র-গুলির কাছে পড়া এবং খেলার মধ্যে বেশী তফাৎ ছিল না। গল্প শোনার মত করিয়া তাহারা ইতিহাসের কাহিনী শুনিত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এমন অত্যাশ্চর্য্য সব উত্তর দিত, যাহা কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন কল্পনা করেন নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভারতবর্ষের উত্তর দিকে ত হিমালয় পাহাড়, আক্রমণকারীরা তাহলে ওদিক্ দিয়ে আসত কি ক'রে?" একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "কেন, সিঁধ কেটে?" ক্লাসে আমাকে যাইতে হইত না, তাহারাই বই, আসন, খাতা লইয়া আসিত

এবং দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া পড়া পড়া খেলা খেলিত। এক-এক দিন মাঝপথে কেহ কেহ বা গাছে চড়িয়া বসিত, অন্যরা অনেক টানাটানি করিয়া তাহাদের নামাইয়া আনিত।

ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলেকেও কিছুদিন ইংরেজী অনুবাদ করাইয়াছিলাম। জীবনময় রায় তখন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই বোধ হয় তাহাদের ইংরেজী পড়াইতেন। আমাকে একদিন বলিলেন, "ওদের এই উপকারটা ক'রে দে, ওরা চিরকাল তোকে মনে রাখবে।" উপকার করিবার চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছিলাম, মনে কেহ রাখিয়াছে কিনা জানি না।

আমরা আসিলাম বুধবারে, রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শুক্রবারে। তখন বিদ্যালয় খুলিয়াছে, সকলে ফিরিয়াছেন, কাজেই লোকের ভীড়ে প্রথম দিন দেখাই করিতে পারিলাম না। তবে দেখিতে তাঁহাকে সারাক্ষণই পাইতাম, সেই ছিল আমাদের এক অফুরান আনন্দের সঞ্চয়।

পরদিন সন্ধ্যার সময় তিনি নিজেই আসিলেন দেখা করিতে। বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কি গো, সব ঘরে আছ?" বাবা ছিলেন না, আমরা দুই বোনে বাহির হইয়া প্রণাম করিলাম। কুশল-প্রশ্ন করিয়া ও ঘরগুলি ঘুরিয়া দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রবিবারে সকালের দিকে কমলা দেবীর বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কবি আসিতেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে বেড়াতে যাও না?" নাতবৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, হরিশ মালী আর তোমাকে ফুল দেয় না?" কমলা বলিলেন, "না।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তার এমন মনের পরিবর্ত্তন হ'ল যে?"

হরিশ মালীর কমলা দেবীর প্রতি পক্ষপাত সম্বন্ধে কবি একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা এখন মনে পড়িতেছে না, তখন উহা অফুরন্ত হাস্যরস যোগাইয়াছিল।

বুধবারে মন্দিরে তিনি উপাসনা করিলেন, ছেলেরা গান করিল। বিকালে তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বাড়ী ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু উপরে বা নীচে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথাও বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন ভাবিয়া আমরাও মাঠে ও পথে এবং দুই-একজন অধ্যাপকের বাড়ী ঘুরিয়া আসিলাম। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে যখন, তখন ফিরিয়া আসিলাম। কমলা দেবীর বারান্দায় যেন রবীন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনিতে পাইলাম। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম সত্যই তিনি, পায়ের কাছে দিনুবাবুর পোষা ছোট কুকুরটি

শুইয়া আছে। নির্ব্বাক্ পশুও তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিত, ইহা তখনও দেখিয়াছি, পরেও দেখিয়াছি। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আজ যে এখানে তোমাদের 'ডাকঘরে'র রিহার্সাল হবে গো।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কমলা বাড়ী নেই?" হাসিয়া বলিলেন, "না, অপেক্ষা ক'রে তাই ব'সে আছি। কমলাও নেই, কমলাকান্তও নেই।" আরও দুই-একজন অধ্যাপক বসিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহারা কাজের কথা বলিতেছেন মনে করিয়া আর সেখানে না বসিয়া চলিয়া আসিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন সাপ ছিল খুব, তাই অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়া বিনা আলোয় পথ চলিলে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হইতেন। এই ক্রটির জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে বকুনিও খাইতাম। সেদিন অবশ্য বিনা বকুনিতেই পার হইয়া গেলাম। "ডাকঘরে"র রিহার্সাল আরও খানিক পরে হইল, সে আর আমাদের দেখা ঘটিয়া উঠিল না।

পরদিন বিকালে আমরা দুই বোন কমলা দেবীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথ ঘাট লাল কাদায় ভর্ত্তি। তাহারই ভিতর দিয়া তিন জন মহানন্দে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। কমলা দেবীর বাড়ী ও রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর

মাঝখানে তখন একটি মেহেদী পাতার বেড়া ছিল। হঠাৎ সেই বেড়ার পাশ হইতে একটি নীলাভ ধূসর রঙের পোষাকের একাংশ দেখা গেল। আমাদের গলা সপ্তমে চড়িয়াছিল, একেবারে নীরব হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে আসিয়া বলিলেন, "এই যে তোমরা। আমি ভাবি রাস্তায় শুধু কমলের গলা শোনা যায় কেন? কমল, তুমি ত এখানকার বাসিন্দা, নূতন লোকদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।" কাদায় খালি পায়ে বেড়াইতেছি বলিয়া আমাকে একটু বকিলেন। ইতিহাসের ক্লাশ কেমন হইতেছে তাহার খোঁজও করিলেন।

শুনিলাম কন্যার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার খবর পাইয়া তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন। সারাদিন তাঁহাকে ব্যস্ত দেখিয়াছিলাম। অনেকবার উপর নীচ করিলেন, একবার গাড়ী চড়িয়া বাহির হইয়াও গেলেন। সন্ধ্যার সময় দিনুবাবুর বারান্দায় গানের ক্লাস হইত। সেইখানে গিয়া বসিলাম। গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বসিলেন। একটি নূতন গান শিখাইলেন।

তাহার পর দিন সকালে তাঁহাকে তাঁহার ধ্যানের আসনে দেখিলাম বটে, তবে চাকরেরা জিনিষপত্র গুছাইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম সকালের ট্রেনেই যাইবেন।

দেখা করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি তখন স্নানের ঘরে। নীচে বসিয়া কমলা দেবীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। কিছু পরে তিনি নামিয়া আসিলেন। দু-জনে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিতেই কৌতুকচ্ছলে তাঁহার কানটা ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিলেন। আমার মাথায় মৃদু করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শিবাজী আর বিক্রমাদিত্যের কি খবর ?" ছোটদের যে আমি ইতিহাস পড়াইতেছি, তাহা তিনি আমার কাছেই শুনিয়াছিলেন। নেপালবাবু এই সময় আসিয়া পড়ায়, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নেপালবাবু মশায়, আপনারা কিছু দেখেন না, সব অনার্য্যরা সিঁধ কেটে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ছে, আমি ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি।" বাবার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "চললুম মশায়," তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইহার পর এক মাসেরও বেশী তিনি কলিকাতায়ই ছিলেন বোধ হয়, শান্তিনিকেতনে আসেন নাই। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' প্রবন্ধটি এই সময় লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় উহা বার-দুই পাঠ করিলেন, আমরা শান্তিনিকেতনে বসিয়া বসিয়া খবর পাইলাম। "দেশ দেশ

নন্দিত করি' মন্ত্রিত তব ভেরী" গানটিও এই সময়কার কলিকাতার সভায় ঐ গানটি হইবে বলিয়া দিনুবাবুকেও তিনি টেলিগ্রামে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাবাকেও সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করিলেন, তবে পারিবারিক কারণে বাবার যাওয়া হইল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দন এই সময় দেওয়া হইল, আমরা শান্তিকেতনে বসিয়াই শুনিলাম।

রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকায় সকলেই একটু মুষড়াইয়া ছিলাম, তবে শান্তিনিকেতনে দিনগুলি মন্দ কাটিত না। দূরে বসিয়া বিদ্যালয়ের ছেলেদের জীবনযাত্রা দেখিতাম, গানের ক্লাসগুলিতে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতাম, ফুটবল ম্যাচ্ হইলেও গিয়া জুটিতাম। মাঠে, বনে ও রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানো ত নিত্যকর্ম্মের ভিতর ছিল। প্রায় সমবয়স্কা বন্ধুও অনেকগুলি ছিলেন, সুতরাং সময় কাটিয়াই যাইত।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। বিকালের ট্রেনে আসিবেন বলিয়া শোনা গেল, তাঁহার জন্য স্টেশনে গাড়ীও পাঠানো হইল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। সকলে পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, শূন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া নিরাশাক্লিষ্ট মন লইয়া ফিরিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময়

দিনুবাবুর গানের আড্ডায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। দিনুবাবু বলিলেন আমাদের বালক-ভৃত্য রাখালের অকস্মাৎ 'গান পাওয়া'তে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বালকটি আমরা যখনই বেড়াইতে বাহির হইতাম তখনই সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে বসিত। এইরূপ আশ্রম-পীড়া ঘটানোর জন্য তাহাকে কিছু শাসন করার সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইতেই দেখিলাম সামনের বাড়ীর দোতলার ঘর খোলা, ভিতরে মশারি ঝুলিতেছে, বুঝিলাম রাত্রের ট্রেনে কবিবর আসিয়া পৌছিয়াছেন। কয়েক মিনিট পরেই তিনি বাহির হইয়া আসিয়া উপাসনায় বসিলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে। গৃহকর্ম্মের তাড়ায় আবার আমাকে ঘরে ঢুকিতে হইল। খানিক পরে আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে আসিতেছেন, হাতে একখানি প্লেটে কি যেন খাবার। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। কবির পাশের কুটীরগুলিতে তখন অধ্যাপকেরা কয়েকজনে সপরিবারে বাস করিতেন, আগেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম ক্ষিতিমোহনবাবুর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বালকবালিকার দল ছুটিয়া আসিয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল, পরক্ষণেই বাড়ীর গৃহিণী ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে খাবারের প্লেট নামাইয়া লইলেন। কবি নিজের খাবার ঘরে ফিরিয়া গিয়া ঢুকিলেন, এবং আর একটা কি হাতে করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিলেন। মনে হইল আমাদের বাড়ীর দিকেই আসিতেছেন। কাছে যখন আসিয়া পড়িলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার হাতে বড় একখানি পাঁউরুটি। দুই বোনে ছুটিয়া বাহির হইলাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে। দিদির হাতে রুটিখানা দিয়া বলিলেন, "শান্তা, আমি তোমাদের ঘর-করনার একটু সাহায্য করতে এসেছি, ওটা কিন্তু যবনের তৈরি।"

যাঁহারা তাঁহাকে কেবল শেষ জীবনের ভগ্নস্বাস্থ্য মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন, তাঁদের নিকট কবির এই চিত্র হয়ত বা অবিশ্বাস্য লাগিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার মধ্য-জীবনের অলোকসামান্য দীপ্তরূপে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই চিত্রে সে যুগের রবীন্দ্রনাথকে আবার স্মৃতির মধ্যে ফিরিয়া পাইবেন। কোহিনুর হীরককে আলোয় তুলিয়া ধরিলে যেমন সহস্র মুখ দিয়া তাহার জ্যোতিঃ ঠিকরাইয়া পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিতা ছিল সেইরূপ। অতি ঘরোয়া সাধারণ একটা কাজও

তাঁহার মধ্যে অসাধারণ রূপ লইত ! যৌবনে গান রচনা করিয়াছিলেন, "আমারে কর তোমার বীণা," ভগবান্ সে প্রার্থনা তাঁহার পূর্ণই করিয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বর্ণবীণার কোনো তারে কখনও বেসুরা কিছু বাজে নাই। ইহার পর কিছুক্ষণ বাহিরের সেই তক্তপোষটিতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতনে যে মেয়েরা তখন ছিলেন, তাঁহাদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল, "শ্রেয়সী" বলিয়া হাতে লেখা কাগজও একটি কিছুদিন বাহির হইয়াছিল। "শ্রেয়সী" নামটি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন। এই সাহিত্য সভায় ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সব মেয়েরাই লেখা পড়িত, গান করিত, আলোচনা করিত। রবীন্দ্রনাথ আসিবার আগের দিনই বোধ হয় একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে হুটু (সন্তোষবাবুর বালিকা ভগিনী) ছোট একটি লেখা পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সে গল্প কাহার কাছে শুনিয়া-ছিলেন জানি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন হুটু তোমাদের কি উপদেশ দিয়েছিল ?" আরও দুই-চারিটি কথা বলিয়া তিনি অন্য এক বাড়ীতে দেখা করিতে গেলেন। অনেক বাড়ীতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা করিয়া আসিলেন, তাহা বারান্দায় বসিয়া দেখিতে পাইলাম।

দুপুরে শুনিলাম কিছুক্ষণ পরেই "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধটি পড়িয়া শোনানো হইবে। কিন্তু দুপুরে প্রবন্ধ পড়া আর হইল না, তাহার বদলে হইল আশ্রম সম্মিলনীর অধিবেশন, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই সভাপতির কাজ করিতে গেলেন। আশ্রমে যাহা কিছু হইত, সব তাতেই আমরা যোগদান করিতে গিয়া উপস্থিত হইতাম, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যদি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে ত কথাই ছিল না। "বীথিকাগৃহ" বলিয়া যে ঘরটি ছিল সেইখানে সভা হইতেছিল, গিয়া দেখিলাম এত ভীড় যে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ছেলেরা বাহিরেই আমাদের জন্য একটি তক্তপোষ পাতিয়া দিল একটা জানলার ধারে। সেইখানেই বসিয়া খানিক সভার কার্যকলাপ দেখা গেল, তাহার পর ফিরিয়া গেলাম। বাড়ীতে বসিয়াই দেখিলাম সভান্তে রবীন্দ্রনাথ মোটরে করিয়া স্রুলে বেড়াইতে গেলেন। বুঝিলাম প্রবন্ধ পাঠ যদি হয়ও ত সন্ধ্যার সময় হইবে। নিজেরা বৈকালিক জলযোগাদি সারিয়া নেপালবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাস্তা দিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম বোলপুর হইতে দলে দলে লোক শান্তি-নিকেতনের দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য

দাঁড়াইলাম, বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছেলেও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা খুব উৎসাহ সহকারে খবর দিল যে বোলপুরের অনেক লোককেই তাহারা বক্তৃতা শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে, এমন কি স্থানীয় ইংরেজ পাদ্রীকেও। নেপালবাবু শুনিয়া বিশেষ খুসি হইলেন না, বলিলেন, "করেছিস্ কি ?" যাহা হউক, বেড়াইতে যখন বাহির হইয়াছি তখন বেড়ানোটা সারিয়া আসা যাক, মনে করিয়া রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। ঠিক সেই সময় মোটরের শব্দ শুনিলাম এবং গাড়ীটাও দেখিতে দেখিতে আসিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াইয়া গেল। রবীন্দ্র-নাথ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন এমন "উদারভাবে" লোক নিমন্ত্রণ করা হইতেছে কেন ? মুখে দেখিলাম স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমরাও তাড়াতাড়ি বেড়ানো সারিয়া আসার চেষ্টায় জোরে জোরে পা চালাইয়া চলিলাম। কিন্তু একবার মাঠের ভিতর বা খোয়াইয়ের ভিতর নামিয়া পড়িলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফেরা কঠিন হইয়া পড়িত। বেশ কয়েক মাইল ঘুরিয়া খেয়াল হইল যে ফিরিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ শুনিতে হইবে। Short cut করিবার চেষ্টায় রেললাইনে এক

level crossing gate-এর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেটি তালা বন্ধ। গেটের পাশে একটু ফাঁক দেখিয়া দুই বোনে তাহারই ভিতর দিয়া গলিয়া পার হইয়া গেলাম। নেপালবাবুও খানিক ধস্তাধস্তি করিয়া পার হইয়া আসিলেন। তাহার পরও রাস্তা হারাইয়া খানিক ঘোরাঘুরি করিতে হইল। সেদিন আবার ছিল অমাবস্যার রাত, একেবারেই যদি পথ খুঁজিয়া না পাই, তাহা হইলে কি হইবে সে ভাবনাও যে দু-একবার না হইল তাহা নয়। অবশেষে একটা পায়ে-চলা পথের সন্ধান পাইলাম, এবং তাহা ধরিয়া প্রাণপণ জোরে হাঁটিয়া যখন বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছানো গেল, তখন ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আশ্রমের প্রবেশ-পথে বেশ একটি ভাল স্প্রীং-ওয়ালা গদিআঁটা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নেপালবাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ!" বুঝিলাম অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নাট্যঘরের কাছাকাছি আসিতেই শুনিতে পাইলাম গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।" তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িলাম। শুনিলাম আমাদের দেরি দেখিয়া দিক্-বিদিকে লোক পাঠান হইয়াছে খুঁজিবার জন্য।

গান শেষ হইবামাত্র সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলাম কবির দিকে, এইবার "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" শুনিব। রবীন্দ্রনাথ সামনে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বসিলেন, আরম্ভ করিলেন, "আজ আপনাদের আমার অনেক দিন আগের রচিত একটি কবিতা প'ড়ে শোনাব, এর বেশী আর কিছু আজ আমার কাছে আশা করবেন না।" বলিয়া বই খুলিয়া, "গান্ধারীর আবেদন" পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনেককে ফিস্‌ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার?" সকলে সেই রকম স্বরেই বলিল, "পরে বলব।" কবিতা পাঠ শেষ হইলে পর "জনগণমন-অধিনায়ক" গাহিয়া সভা ভঙ্গ হইল। বোলপুর হইতে প্রায় দেড় শ' দুই শ' লোক আসিয়াছিল, তাহারা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ অত জনসমাগম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" পড়েন নাই।

যাহা হউক, ইহার পরের দিন সত্যই "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" পড়া হইল। সেদিন আর বাহিরের কেহ খবর পাইল না। আশ্রমের সকলে সমবেত হইলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে সভাপতি করা হইল।

প্রবন্ধটি বেশ বড়, পড়িতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিল। গান আজ আর হইল না, প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটির এক লাইন ধরিলেন, কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। সভা ভঙ্গ হইবার পর অধ্যাপকদের একজনের একটি খোকাকে কোলে করিয়া দুই বোনে খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘুরিলাম, রবীন্দ্রনাথ একবার নিকটে আসিয়া খোকার গাল টিপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি তোমাদের pet?" তাহার পর নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন প্রায়ই বাহির হইতে ফুটবলের টীম আসিত ম্যাচ্ খেলিতে। আমার ফুটবল ম্যাচ্ দেখার বাতিক ছিল, কারণ শৈশবে নিজেও ভাইদের সঙ্গে ফুটবল খেলিতাম। একলা ত মাঠের মধ্যে যাওয়া ভাল দেখায় না, তাই সঙ্গী খুঁজিবার জন্য মীরা দেবীর বাড়ী গেলাম। তিনি তখন কাজে ব্যস্ত, যাইতে পারিলেন না, বলিলেন, "আমার আয়ার সঙ্গে যাও।" রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে বলিলেন, "আয়া কি ওকে রক্ষা করবে নাকি?" যাহা হউক, খানিক পরে মীরা দেবী নিজেই গেলেন। ম্যাচ্ দেখিয়া ও খানিক বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর দিনুবাবুর বারান্দায় গিয়া বসিলাম, গান শুনিবার আশায়। হঠাৎ পিছনে জাপানী খড়মের শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, "আরে বোসো, বোসো, তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু দরকার নেই। একটু গল্প করা যাক্।" তিনি নিজেও আমাদের পাশে সেই তক্তপোষে বসিয়া গেলেন। কমলা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন, "কমল, তুমি এইখানটিতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার যে খুব ভাব, তা না-হয় ওরা দেখতেই পাবে, না-হয় কল্‌কাতায় গিয়ে ব'লেই দেবে।" আমরা ত হাসিয়া মরি। নাতবৌ কমলা দেবীর সঙ্গে কবির সম্বন্ধটি বড় মধুর ছিল, নিজেও ইহা স্বীকার করিতেন। বাবা তাঁহাকে একদিন "চিরকুমার সভা" ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "আপনিও যেমন মশায়, ওরা এর রস কি বুঝবে? শালী-ভগ্নীপতির যে মধুর সম্পর্ক, তা ওদের সমাজেই নেই। এই ধরুন আমার সঙ্গে কমলের যে সম্পর্ক, সেই বিষয়ে গল্প লিখলে ওরা এক বিন্দুও তার রস গ্রহণ করতে পারবে?"

এবারেও রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীদিন শান্তিনিকেতনে থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতা হইতে খবর আসিল বেলা দেবীর অসুখ আবার বাড়িয়াছে। কবি আগষ্টের ত্রিশ তারিখেই বোধ হয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। সেদিনটা বুধবার ছিল। যাহাতে ট্রেন ধরিতে তাঁহাকে হুড়াহুড়ি করিতে না হয়, সেই জন্য মন্দিরে ভোর থাকিতেই উপাসনা হইল।

উপাসনান্তে বাড়ী আসিয়া দেখিলাম সামনের বাড়ীতে জিনিষপত্র গোছানো হইয়া গিয়াছে, গাড়ীও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া আসিলেন অল্প পরেই। আমি প্রণাম করিলাম, আশীর্ব্বাদ করিয়া আশ্বাস দিলেন যে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। বলিলেন, "তোমরা ত রইলেই, আবার এসে দেখব।" নাতনী নন্দিতা তাঁহার একটি আঙুল ধরিয়া আকর্ষণ করাতে বলিলেন, "একে বলে পাণিগ্রহণ।" নাতনীদের সম্বন্ধে এই ঠাট্টাটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন, বৃষ্টি আসিতেছিল, ট্রেন আসিতেও বিলম্ব ছিল না।

তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনে ছাত্র, অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত অনেকে, আমাদের মত স্থায়ী বাসিন্দা দু'চার জন, সকলে মিলিয়া যেন একটি বিরাট্

পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও পর বলিয়া মনে হইত না। সকলের সুখে দুঃখে সবাই অংশ লইতে ছুটিয়া যাইত। ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতি বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন। অসুস্থ শরীরে নিজে বিশেষ কোথাও যাইতেন না, কিন্তু তাঁহার বারান্দাটি সর্ব্বদাই একটি বড় ক্লাবের কাজ করিত! সকলের খবর লওয়াও তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। তাঁহার বাড়ী হইতে এত ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহার আসিত যে আমরা সে-সব খাইয়াই শেষ করিতে পারিতাম না।

আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ অশোক একবার বলিয়াছিলেন যে শান্তিনিকেতনের সব ভাল, সব চেয়ে ভাল দ্বিপুবাবুর পান্তুয়া। দ্বিপেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়াছিলেন; ইহার পর অশোক আসিয়াছেন শুনিলেই দ্বিপেন্দ্রনাথ পান্তুয়া পাঠাইয়া দিতেন। বাবা মিষ্টান্নাদি বিশেষ খাইতেন না, কিন্তু কিছু না খাওয়াইতে পারিলে বন্ধুবৎসল দ্বিপেন্দ্রনাথ খুসি হইতেন না, সুতরাং তিনি বাবার জন্য মস্ত এক ঝুড়ি ডাব আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেন এই বিরাট্ পরিবারের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতি একান্ত ভালবাসাই ছিল আমাদের মিলনের সূত্র। তিনি যদি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক

হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার লোকের কোন অভাব হইত না। চুম্বক যেমন করিয়া লৌহকে টানে তেমনই করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার এমন অসামান্য পরিমাণে ছিল, যাহা আর কোন মানুষের ভিতর কোনদিন দেখি নাই। হয় ত বা বুদ্ধদেব কি খ্রীষ্টের মধ্যে ছিল।

কবি চলিয়া যাওয়ার দুই-তিন দিন পরে আমাদেরও চলিয়া আসিতে হইল। মা কলিকাতায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন, সুতরাং কিছুদিনের জন্য সকলেই আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও কলিকাতায়, প্রতিমা দেবীও কলিকাতায়ই ছিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর বিকালে একবার তাঁহারা আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব অমনি পালিয়ে এলে?" বাবাকে বলিলেন, "আসুন মশায়, একটু পলিটিক্‌স্ চর্চ্চা করা যাক্।" আমাকে তখন কি কাজে অন্য ঘরে যাইতে হইল, কাজেই কি আলোচনা হইল শুনিতে পাইলাম না। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে মানুষ দাঁড়াইয়া গেল তাঁহাকে দেখিবার জন্য।

১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে আর একবার আসিলেন বাবার

সঙ্গে পরামর্শ করিতে। সে বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কি একটা গোলমাল ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করিয়া সেই সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টা হইতেছিল। ঘরে আরও অনেকে থাকাতে তখন সেখানে গেলাম না। কি মীমাংসা হইল জানিতে পারিলাম না। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে আবার পদত্যাগ করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হন। বক্তা ছিলেন, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী। এই সভাতেও বিষম ভীড় হয়। বেলা তিনটা হইতে মন্দিরে ঢুকিবার জন্য ঠেলাঠেলি সুরু হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে মন্দিরের বেদীর পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। ঠেলাঠেলি ও গোলমালে সীতানাথবাবুর বক্তৃতা কেহ শুনিতেই পাইল না। তিনিও বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। অন্য দুই জনের বক্তৃতার সময় অত গোলমাল হয় নাই। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের বাড়ী আসিলেন। সঙ্গে অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, প্রশান্তচন্দ্র প্রভৃতি অনেক লোক দেখিয়া যে-ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন, সে-ঘরে আর ঢুকিলাম না। হঠাৎ বাবা আমাকে ডাকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া কবিকে প্রণাম করিলাম, তিনি বলিলেন, "বিচিত্রায় আজ বিকেলে Western music হবে, তোমরা যেও সব। Piano, violin ইত্যাদি আছে। আমাকে সবাই ধরেছে জর্ম্মান গান গাইতে, অনেক কাল ওসব ছেড়ে দিয়েছি, কি হবে জানি না। আমার সকাল থেকে মন খারাপ হয়ে আছে। যা হোক্, তোমরা যেও, গেলেই আমার exhibition দেখতে পাবে।" তিনি অতঃপর চলিয়া গেলেন।

বিকালে যখন বিচিত্রার হলে পৌছিলাম, তখন সেখানে স্বজাতীয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মেয়েদের খোঁজে অন্দরের দিকে চলিলাম। দোতলায় রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম, তিনি বলিলেন, "এদিকে তোমাদের দলের

দু' চারজন আছেন।" ঢুকিয়া দেখিলাম সত্যই আমাদের দলের অনেকেই এখানেই বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া প্রতিমা দেবীর সঙ্গে গিয়া বিচিত্রায় ঢুকিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আসিয়া পৌঁছিবামাত্র গান-বাজনা আরম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও নলিনী দেবী একটি duet বাজাইলেন। বাজনা তাহার পর অনেকগুলিই হইল পর পর, গানও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ও জর্ম্মান, সব রকম গানই গাহিয়া শুনাইলেন। হিন্দী গান দুইটিতেই তাঁহার গলা খুলিয়াছিল সব চেয়ে বেশী। একজন বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলা গুটি-দুই ইংরেজী গান গাহিয়া শুনাইলেন, তাঁহার নাম বোধ হয় শ্রীমতী বীণা আড্ডি। অনেক রাত হইয়া গেল, সুতরাং সভা অন্তে আর কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার জন্য না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

দিন-দুই পরে একটি পার্টিতে আবার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধানে কলেজের মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল তখন ছিল, সেই হোস্টেলের মেয়েদের নিমন্ত্রণে কবি সেখানে গিয়াছিলেন। গান এবং কবিতা পাঠ হইয়াছিল ইহা মনে আছে, এবং রবীন্দ্রনাথকে

অসংখ্য autograph book-এ নাম লিখিতে হইয়াছিল। মেয়েগুলি অত্যন্ত বেশী কথা বলায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও তখনও তাঁহার সামনে ভাল করিয়া মুখ খুলিতে পারিতাম না।

এই সময় বিচিত্রায় উপরি উপরি দুই দিন "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় হইয়া গেল। একদিন শুনিলাম শুধু মেয়েদের জন্যই হইল। কার্ড না পাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্তই মর্ম্মাহত হইলাম।

২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনিই সভাপতি ছিলেন। সভা যতদূর মনে পড়িতেছে রামমোহন লাইব্রেরির হলে হইয়াছিল। ঐটুকু ঘরে সেদিন যে কি বিষম ভীড় হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। বসিবার জায়গা ত পাইলামই না, উপরে galleryতে দাঁড়াইয়া গলা বাড়াইয়া নীচের platform দেখার চেষ্টায় ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। গানের ব্যবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সামনে ঐ রকম গান যে কেহ গাহিতে পারে সে ধারণাই আমাদের ছিল না। সভায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন, স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর গোলমালে শোনাই গেল না। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। একজন পণ্ডিতগোছের ভদ্রলোক হিন্দীতে বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন। শেষে আর একটি গান হইল, সেটি তবু ভাল।

সভা শেষ হইবার পর গ্যালারি হইতে নীচে নামিলাম, কিন্তু লোকের ভীড়ে দরজার কাছেই আটকাইয়া গেলাম, বাহির হইতে পারিলাম না। পরে দেখিলাম যে লোকেরা আমার উপকারই করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও এই পথেই বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল যে কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই যে সীতা, কাল যাও নি কেন?" অভিমানটা আর প্রকাশ করিলাম না, বলিলাম, "আমি ঠিক খবর পাই নি।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই দেখ কি কাণ্ড! আমি —কে বললাম তোমাদের কার্ড পাঠাতে, সে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি,' তার পর ভুলে গেছে আর কি? আমি ভাবলাম তোমরা এলে না কেন। কাল আবার হচ্ছে, কাল কিন্তু নিশ্চয় যেও।" বলিলাম, "আচ্ছা।" মাকে নমস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"আপনি কাল যাবেন, রামানন্দবাবুকেও ধরে নিয়ে যাবেন।" আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যেও কিন্তু নিশ্চয়, না নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে হবে?" আমি বলিলাম, "না দরকার নেই, নিশ্চয়ই যাব।" রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। বিস্মিত জনতা এতক্ষণ আমাদের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ছিল, আমরাও পলাইয়া বাঁচিলাম।

কোন্ সৌভাগ্যের গুণে বা পূর্ব্বজন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে এই মহাপুরুষের এতখানি স্নেহ পাইয়াছিলাম জানি না। জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ত আমার এই স্নেহের স্মৃতি। নিজের কোনো গুণে পাই নাই, তাহা ত বুঝিতে ভুল হয় না।

পরদিন যথাসময়ের কিছু পূর্ব্বেই জোড়াসাঁকো গিয়া উপস্থিত হইলাম, ভয় ছিল পাছে ভাল জায়গা না পাই। গিয়া কিন্তু দেখিলাম তখনও বিচিত্রায় দর্শক-সমাগম আরম্ভ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের দোতলার বসিবার ঘরে খানিক-ক্ষণ বসিয়া বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিলাম। প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে একবার তিনতলায় চড়িলাম। তাহার পর লোক দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জুটিতেছেন দেখিয়া বিচিত্রায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

"বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় সত্যই আশ্চর্য্য সুন্দর হইয়াছিল। সাজসজ্জাও যা হইয়াছিল চমৎকার। কেদারের ভূমিকায় সুকুমারবাবুর বিকট মুখভঙ্গী এখনও যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। বৈকুণ্ঠ সাজিয়াছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন "তিন্‌কড়ে"। অভিনেতারা বইয়ে যা নাই, এমন দু-চার কথা বলিয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টাও দুই-চারিবার করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠকিবার পাত্র কেহই ছিলেন না, সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ stage manager ছিলেন। দুই-তিনবার ঐকতান বাদ্য হইল। দর্শকদের ভিতর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ছিলেন।

২রা অক্টোবর Workingmen's Institute-এর prize দেওয়া উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি ছিলেন। কন্যার সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় তখন তিনি অতিশয় উদ্বেগের ভিতর দিন কাটাইতেছিলেন, তবু উদ্যোক্তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কার্ডে দেখিয়াছিলাম য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্ হলে সভা হইবে, সেখানে উপস্থিত হইয়া কিন্তু দেখিলাম হলের দরজা জান্‌লা সব বন্ধ, চারিদিক চুপচাপ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় একজন দরোয়ান বাহির হইয়া

খবর দিল যে meeting এখানে হইবে না, Overtoun-Hall-এ হইবে। গাড়ী ঘুরাইয়া আবার চলিলাম সেইখানে। ঘোরাঘুরির ফলে সভাস্থলে পৌঁছিতে দেরি হইয়া গেল, গিয়া দেখিলাম সভাপতি আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তবে সভার কাজ তখনও আরম্ভ হয় নাই। যাহা হউক, বসিবার জায়গা বেশ ভালই পাইলাম। রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বড়ই বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাইতেছিল, সোজা সামনের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন, কাহাকেও যে দেখিতেছেন বা চিনিতেছেন তাহা মনেই হইল না।

গোটাদুই গান হইবার পর সেক্রেটারি রিপোর্ট পাঠ করিলেন। Workingmen's Institute এর ছেলেরা আবৃত্তি ও ড্রিল্ করিল। সেগুলি ভালই হইয়াছিল। তাহার পর প্রাইজ্ দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রারম্ভে বলিলেন, "যদিও আমার অবকাশ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং আমি নানা উদ্বেগের ভিতর বাস করছি, তবুও কয়েকটি কারণে আজ আমি এখানে সভাপতির কাজ করতে সম্মত হয়েছি।" শ্রম-জীবীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিই তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু উচ্ছ্বসিত ভাষায় সভাপতিকে ধন্যবাদ

জানাইলেন। শ্রমজীবীদের স্কুলের কতকগুলি ছেলে প্ল্যাট-ফর্মে উঠিয়া কবির চারিদিক্ ঘিরিয়া বসিয়াছিল এবং স্থানে অস্থানে প্রাণপণে হাততালি দিয়া যাইতেছিল। সভার কাজ যখন শেষ হইয়া গেল তখন তাহারা উঠিয়া পড়িয়া মহোৎসাহে নিজের নিজের প্রাইজ্ গামছায় বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের দিকে তাকাইয়া এতক্ষণ পরে রবীন্দ্র-নাথের মুখে একটু যেন হাসি দেখা দিল। সভা ভঙ্গ হইতেই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

৩রা অক্টোবর বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবারেও কি একটা বিভ্রাট ঘটিল এবং নিমন্ত্রণের কার্ড পাইলাম না। সেই দিনই সুকুমারবাবুদের বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ ছিল, সেইখানেই চলিয়া গেলাম। বাড়ী ফিরিলাম ৭॥টার পর। আসিয়া শুনিলাম যে আমাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য। আমরা ছিলাম না, শুধু বাবাই গিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র তাহার পরদিন বলিলেন, "তোমরা কাল গেলে না ব'লে রবিবাবু আমাকে বকতে লাগলেন, বললেন, 'তুমি কেন ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এস না'?"

এই সময় শান্তিনিকেতনে মুলুর জ্বর হওয়ায় মা ও দিদি

তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া গেলেন। আমি তখনকার মত কলিকাতায়ই থাকিয়া গেলাম। একটা গুজব শুনিলাম যে বিচিত্রায় পড়া সেই প্রবন্ধটি অধিকসংখ্যক লোককে শুনাইবার জন্য আবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হলে পড়া হইবে। গুজবটা সত্যই হইল, তবে কর্ম্মকর্ত্তারা এবার এতই সাবধান হইলেন যে জনসাধারণ প্রায় খবরই পাইল না। তবুও হলটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল, তবে দরজা ভাঙা বা মারামারিটা বাদ পড়িল। মেয়েরা খবর পায় নাই, অল্প দুই-চার জন মাত্র আসিয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু মনে নাই, "ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারই হউক জয়," গানটি গাহিয়া তিনি বেদী হইতে নামিয়া গেলেন।

বাহিরে তখন বিষম কাদা, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। চারিদিক্ হইতে ভক্তবৃন্দের প্রণামের চোটে অনেকক্ষণ তাঁহাকে সেই কাদার মধ্যেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমি যখন প্রণাম করিতে গেলাম, আমার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কি সীতা, তোমরা যে দেখছি আমাকে ত্যাগ করলে। সেদিন, খাতায় তোমাদের নাম লেখা নেই, না কি নিয়ে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ডাকঘর অভিনয়ের সময় নিশ্চয় যেও।

আমি ভাবলুম মুলুকে নেব, না ওরা দুটো পার্টই আমার ঘাড়ে চড়িয়ে দিলে, আমাকে প্রহরী আর ঠাকুর্দ্দা দুই-ই সাজতে হবে।" আর একদল ভক্তের আহ্বানে, সেই কাদার ভিতর দিয়া উত্তরীয় লুটাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

"ডাকঘর" নাটিকাটি বিচিত্রায় অভিনয় হইবার আগেই সমাজপাড়ার বাল্য সমাজ দ্বারা মেরী কার্পেণ্টার হলে একবার অভিনীত হয়। মুলু তাহাতে ঠাকুর্দ্দা এবং আশামুকুল অমলের ভূমিকায় অভিনয় করে। অভিনয় সত্যই খুব ভাল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ছিলেন না, পরে এই অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া মুলু এবং আশামুকুল দুই জনকেই অভিনয়ে পার্ট দিতে চাহিয়াছিলেন। আশামুকুল অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিল, সকলের আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর্দ্দার ভূমিকায় কবি স্বয়ং নামিলেন।

১০ই অক্টোবর বিচিত্রায় "ডাকঘর" অভিনয় দেখিতে গেলাম। জায়গার পক্ষে ভীড় হইয়াছিল অসম্ভব রকম। পুরুষ-দর্শক সেদিন অল্পই ছিলেন, মহিলাদেরই ছিল প্রাধান্য। কোনমতে বসিবার জায়গা করিয়া ত বসা গেল। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" এতদিন কবিতায়ই

পড়িয়াছিলাম, সেদিন প্রথম সুরসংযোগে গীত হইতে শুনিলাম। ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণী গানটি গাহিলেন।

গগনেন্দ্রনাথ মাধব দত্ত সাজিয়াছিলেন, অবনীবাবু কবিরাজ ও মোড়ল দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করিয়াছিলেন। অসিতকুমার হালদার দইওয়ালা এবং রথীন্দ্রনাথ রাজকবিরাজ সাজিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা 'সুধা' সাজিয়াছিল, মেয়েটিকে ভারি সুন্দর দেখাইয়াছিল। বাঁশীর সুরের মত মিষ্ট গলায় তাহার সেই, "আহা, ফুলের খবর তুমি নাকি আমার চেয়ে বেশী জান?" এই কথাগুলির সুর এখনও যেন কানে বাজিতেছে। শেষের দৃশ্য দুটি এখনও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। রঙ্গমঞ্চের চন্দ্রতারাখচিত আকাশ ও চাঁদের আলো যেন সত্যকার আকাশ ও চাঁদকেও সৌন্দর্য্যে হার মানাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা কিছুই করেন নাই, মাথায় শুধু গেরুয়া রঙের পাগড়ী। আলোকের মুকুটের মত যে কুঞ্চিত কেশদাম তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিত, তাহা পাগড়ীর আড়ালে চাপা দেওয়াতে আমরা সকলেই মনে মনে আপত্তি অনুভব করিতেছিলাম। নাটকে গান কোথাও নাই, তবু একবার বাউল সাজিয়া, "গ্রাম

ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে," গাহিয়া, নৃত্য করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আর একবার যবনিকার অন্তরাল হইতে গাহিয়া উঠিলেন, "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে, শূন্যঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।"

অভিনয় শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ আটকাইয়া রহিলাম। মহিলাদের মজলিশ সহজে ভাঙিতে চায় না। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, গল্প করিতে করিতে ঘণ্টা-খানিক কাটিয়া গেল। মাঝে একবার রবীন্দ্রনাথকে সামনে পাইয়া প্রণাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সীতা, সব শুনতে পেয়েছিলে ত? ভারি নাকি আস্তে হয়েছিল?" বলিলাম সবই শুনিয়াছি, কোন অসুবিধা হয় নাই। ভীড় কমিতে ও গাড়ী জোগাড় করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। কয়েক-জন মহিলা অভিভাবকশূন্য হইয়া ঘুরিতেছিলেন, তাঁহাদেরও পার করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময় তিনি অনেক দিন ধরিয়া একটানাই বোধ হয় কলিকাতায় ছিলেন। মধ্যে মধ্যে দর্শন পাইতাম। এক-একদিন এমন অতর্কিতে আসিতেন যে অপ্রস্তুতে পড়িতে হইত। দুপুরবেলা একদিন দুই বোনে তিনতলার

ঘরে শুইয়া উপন্যাস পড়িতেছি, ছোট দুই ভাই সদ্য শোনা, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী," অতি বেসুরায়, প্রাণপণে চীৎকার করিয়া গাহিতেছেন। এমন সময় আমাদের চাকর সতীশ নীচ হইতে একটুকরা কাগজ হাতে করিয়া উপরে আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, একটা চিঠি আছে।" চিঠি পড়িয়া ভ্রাতার মুখের ভাবটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত হইয়া গেল দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া পড়িয়া দেখিলাম, "মুলু, নীচে রবিবাবু এসেছেন, গানটা একটু থামাও।" হস্তলিপি চারুচন্দ্রের।

চাকরকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সত্যই রবীন্দ্রনাথ নীচে আসিয়া বসিয়া আছেন। একরকম ছুটিয়াই নীচে নামিলাম। অনিচ্ছাকৃত অসৌজন্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলাম, "আপনি কখন এসেছেন, আমি খবর পাই নি।" আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমার খোঁজখবর ত কিছু নাও না, কি ক'রে জানবে?"

আমরা যেদিন "ডাকঘর" দেখিয়া আসিলাম, তাহার কয়েক দিন পরে আবার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে দেখাইবার জন্য আর একবার অভিনয় হইল। আমাদের

স্নেহ করিতেন বলিয়া, কবি আর একবার যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাইবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া প্রস্তুতও হইলাম, এমন সময় শোনা গেল বড়বাজারে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। মা ভয় পাইয়া আমাদের আর যাইতে দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ আমরা সেদিন যাই নাই কেন জিজ্ঞাসা করাতে বাবা যথার্থ কারণটা বলিয়াই দিলেন। কবি দিদির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা সব modern women, এইটুকু সাহস তোমাদের নেই ? কোথায় বড়বাজারে দাঙ্গা হচ্ছে আর তোমরা ভয়ে জোড়াসাঁকো গেলে না ?" এই প্রসঙ্গ লইয়া খুব খানিক হাসাহাসি হইল। বলিলেন সেদিন অভিনয় সবদিনের মধ্যে ভাল হইয়াছিল, আমরা দেখিতে পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করিলেন। শীঘ্রই শান্তিনিকেতন যাইতেছেন বলিলেন। তখন কলিকাতায় "রাজা" অভিনয় করার একটা কথা উঠিয়াছিল অভিনয় শিখাইবার জন্য হয়ত আবার কয়েক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন, ইহাও শুনিলাম। দিদিকে বলিলেন, "শান্তা, feminism সম্বন্ধে একটা বই লেখ ত।" লণ্ডনে দু-চারজন ভারতীয়া মহিলা suffragette procession-এ পতাকা হস্তে বাহির

হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটু সংশয় প্রকাশ করিলেন। বাবার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মাঝে এক রবিবারে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ হইল। অবনীন্দ্রনাথের কন্যা করুণা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহার স্বামী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিমন্ত্রণ করেন। মেয়েদেরই মজলিশ, বসিয়া বসিয়া অনেক গল্প হইল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব ঘরগুলি দেখিয়া আসিলাম। একেবারে খাঁটি ভারতীয়, পাশ্চাত্য সজ্জার কোন চেষ্টা দেখিলাম না। মেঝের উপর সুন্দর গালিচার আসন পাতিয়া খাওয়া-দাওয়াও পুরা বাঙালী মতেই হইল। খাওয়ার পর একবার ৫ নম্বর ছাড়িয়া ৬ নম্বরে আসিলাম, যদি একবার কবির দর্শন পাই সেই আশায়। দেখিতে পাইলাম বটে; তবে তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন দেখিয়া কাছে আর গেলাম না।

আমার এই স্মৃতিকথা সেকালের কয়েকটি ডাইরীর খাতা অবলম্বন করিয়াই লিখিতেছি। বালিকা বয়সের লেখা, কোন ঘটনাকে কতখানি মূল্য দিতে হয় তাহা জানা ছিল না। সব ঘটনার তারিখ নাই, যেখানে আছে

সেখানে উল্লেখ করিয়াছি। দুই-চারটি ঘটনার উল্লেখ দেখি, কিন্তু সময় কিছু লেখা নাই। যাহা হউক, সময়ের খোঁজ না থাকিলেও চিত্রহিসাবে মূল্য সেগুলির সমানই আছে। এইরূপ একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। শান্তিনিকেতনেই তখন আছি। মেয়েদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল, তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। এটিতে প্রধানতঃ প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও গানই হইত। প্রতি বুধবারেই ইহার অধিবেশন হইত। একবার সকলে স্থির করিলেন যে এই বুধবারে নূতন রকম কিছু করা যাক্। একটি fancy dress party হইবে, ইহাই ঠিক হইল। শান্তিনিকেতনে fancy dress করিবার মত সাজসজ্জা পাওয়া তখন কঠিন ছিল, কারণ আমরা সকলেই এখানে আটপৌরে বেশভূষার জিনিষ লইয়াই থাকিতাম, মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদ যাহার যাহা ছিল কলিকাতাতেই থাকিত। ঠাকুর-পরিবারের অনেক মহিলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না, কারণ তখনকার শান্তিনিকেতনে উই এবং ইঁদুর দুইয়েরই উৎপাত অসাধারণ ছিল। কাজেই বেশী দামী জিনিষ সেখানে কেহ রাখিতে চাহিতেন না। কিন্তু আমাদের উৎসাহের কাছে কোনো বাধাই টিঁকিল না। বুধবার সকালে মন্দিরের উপাসনার পর হইতেই সাজ-

সজ্জার আয়োজন চলিতে লাগিল। মেয়েরা কে কি সাজিবে ইহা লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা চলিল। ছেলেরা শাসাইতে লাগিল, তাহারা rain-water pipe বাহিয়া উঠিয়া শান্তিনিকেতনের দুতলায় উঁকি মারিয়া দেখিবে।

আমি দময়ন্তী সাজিয়াছিলাম, অনেকটা রাজা রবি বর্ম্মার ছবি অনুকরণ করিয়া। তবে হংস জোটানো যায় নাই। কমলা দেবীর বাড়ী হইতে অর্দ্ধেক সাজ সমাপ্ত করিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শান্তিনিকেতনের দুতলার গাড়ী-বারান্দার ছাতে আসিয়া বসা গেল। মাঝে মীরা দেবীর শিশুকন্যাকে বোল্‌তায় কামড়াইয়া দেওয়াতে বিভ্রাট বাধিয়া গেল। যাহা হউক, বেশী কিছু না হওয়াতে আবার সাজ-সজ্জা চলিতে লাগিল। তখন দারুণ গরম, সাজের চোটে আরও যেন প্রাণ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। দিদি এবং ঠান্‌দি সাজিলেন রাম এবং কচ। পুরুষের বেশে দুই জনকেই খুব ভাল দেখাইয়াছিল। সন্তোষবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী বাসু, এবং ক্ষিতিমোহন বাবুর দ্বিতীয় কন্যা লাবু, লব ও কুশ সাজিয়াছিল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা এনাক্ষী দেবী সাজিয়াছিলেন সীতা।

গাড়ীবারান্দার ছাদে ত সকলকে যথাযোগ্যভাবে দাঁড় করানো গেল। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বলিলেন,

"কাকামশায় আর রামানন্দবাবুকে দেখাতে হবে।" একটু আপত্তির গুঞ্জন শোনা গেল, তবে প্রবল নয়। তিনি স্বয়ং গিয়া দর্শক দুইজনকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এই প্রকার বিচিত্র বেশে বাহির হইতে লজ্জা করিতেছিল বটে, কিন্তু উপায় ছিল না। একটু-খানি অন্ধকার কোণ খুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সন্তোষ-বাবুর তৃতীয়া ভগিনীই বোধ হয় "রাত্রি" সাজিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। আশা করিতেছিলাম, "রাত্রির" অঞ্চলের আড়ালে আমাকে ভাল করিয়া দেখা যাইবে না। কমলা দেবী "দেবযানী" সাজিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। "দেবযানী" একটু লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একেবারে সামনে আনাইয়া দেখিলেন। "লব" ও "কুশ"কে দেখিয়া বলিলেন, "ইস্, আমারই যে দেখে ভয় করছে।" দিদির এবং ঠান্দির পোষাকের প্রশংসা করিলেন। যাইবার আগে আর একবার কমলা দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমাকে কচ সাজালে কার কি ক্ষতি হত বল ত?" তিনি এবং বাবা চলিয়া যাইবার পর আমরা ছদ্মবেশ ছাড়িয়া আবার নিজমূর্ত্তি ধরিলাম এবং যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

পরদিন সকালে দিনুবাবুর বাড়ী রবীন্দ্রনাথ আসিলেন এবং খুব একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া নিজেও সেখানে গেলাম। আগের দিনের ছদ্মবেশের কথাই হইতেছে দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য কাণ্ড দিনু! কালকে এনাকে একেবারে হুবহু এনার মত দেখাচ্ছিল, একেবারে ঠিক এনা।"

আরও হয়ত আগে কিছু বলিয়াছিলেন, সেটা আমার আর শোনা হইল না। দুপুরে মীরা দেবীর বাড়ী একবার বেড়াইতে গেলাম। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ স্নান করিয়া নীচে নামিলেন, দ্বিপ্রহরের খাওয়ার জন্য। মীরা দেবী আমাকে সুদ্ধ খাইবার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথের খাওয়া তখন অতি সাদাসিদা ছিল, খাইতেনও অতি সামান্য। দু-তিন চামচ ভাত বড় জোর পাতে লইলেন, অধিকাংশ ব্যঞ্জনাদি কন্যার দিকে ঠেলিয়া দিলেন, নিজে স্পর্শও করিলেন না। Fancy dress এর কথা আবার উঠিল, বলিলেন, "তোমাকেও ঠিক তোমার মতই দেখিয়েছিল, একটু কিছু নূতন রকম করা উচিত। আমরা একবার fancy dress করেছিলুম, আমি ময়দা দিয়ে এমন একটা নাক বানিয়েছিলুম যে কেউই চিন্‌তে পারে নি, শেষে গলার স্বরে ধরা পড়ে গেলুম।"

একটি ছাত্রের এক মাসী তাঁহাকে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক চিঠি লিখিয়াছেন বলিলেন। রাগের কারণ, ছোট ছোট ছেলেদের কেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ পড়ানো হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যেগুলো পড়ানো হচ্ছে তাতে এমন ত কিছু আপত্তি করবার দেখি না, এক 'কচ ও দেবযানী'তে একটু প্রেমের আমেজ আছে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল কি কি আমোদ করতে পারবে না, সেইটেই ঠিক ক'রে দিচ্ছেন, কি রকম করা যেতে পারে তার কোনো খোঁজই দেন না, কাজেই তাঁদের নিষেধটায় ফল হয় না। তাঁদের উচিত, তাঁদের মতে যা নির্দোষ আমোদ, তার একটা standard খাড়া ক'রে দেওয়া। শুধু একটা negative দিক্ নিয়ে লাভ নেই, কারণ অল্প বয়সের স্বভাবই এই যে তারা আমোদ চাইবেই।" খাওয়া শেষ হইয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিলেন। উপরে উঠিয়া যাইবার সময় আমাকে একখানা Englishman কাগজ দিয়া বলিলেন, "এটা তোমার ভাইকে দিও, বিক্রী ক'রে তার night schoolএর পুঁজি বাড়াবে।" মুলু তখন একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিল ভুবনডাঙ্গার ছেলে-মেয়েদের জন্য। বাবার এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে পুরানো খবরের কাগজ জোগাড় করিয়া ও বোলপুর শহরে

যোগিয়া বিক্রয় করিয়া বালক এই নৈশ বিদ্যালয়ের খরচ চালাইত।

সেইদিনই বিকালে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ী আসিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নাম দিয়া কতকগুলি বই বাহির করার কথা হইতেছিল। সেই বিষয়েই তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিলাম। একটি পুস্তকের তালিকা হাতে করিয়া আসিয়াছিলেন, আমাকে পাশের ঘর হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া বাবাকে বলিলেন, "এইবার আমার সেক্রেটারিকে বলুন এটা নকল ক'রে দিতে, কোন্‌টি যে সেক্রেটারি তা ত ঠিক জানিও না।"

আমাদের সাহিত্যসভা হইতেই আবার একদিন প্রস্তাব উঠিল, শুধু মেয়েদের লইয়া একটা অভিনয় করিতে হইবে। ছেলেদের অভিনয় ত নিত্যই হইতেছে, মেয়েদের একটা কিছু করা উচিত। স্থির হইল "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় করা হইবে, কারণ সবই মেয়ের ভূমিকা। আমার অভিনয় করা জিনিষটা কোনোদিন ধাতে নাই, কাজেই বড় কোনো পার্ট লইতে রাজী হইলাম না। অতএব যত ঝি বা বাঁদীর পার্ট ছিল, সবই আমার ঘাড়ে চাপিল। দিন-কতক খালি কে কি সাজিবে, কে কি পরিবে, কে কি করিবে ইহা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই হইল

না। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"খানা হাতে হাতে ঘুরিতেও লাগিল। হঠাৎ কেমন করিয়া জানি না খবর গিয়া পৌঁছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। দোতলার ঘরে সকলের ডাক পড়িল রিহার্সাল দিবার জন্য। আদেশ অমান্য করা যায় না, যাইতেই হইল, যদিও অতিশয় শঙ্কিতভাবে। একটু দেরিতে পৌঁছিলাম, গিয়া দেখি রিহার্সাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের লিখিবার টেব্‌লের সামনে বসিয়া সকলের পার্ট বলা শুনিতেছেন এবং সংশোধন করিতেছেন। বড় পার্ট না-নেওয়ার জন্য আমি সেদিনকার মত বাঁচিয়া গেলাম। উপরি উপরি আরও দুই-তিন দিন গিয়া কবিবরের সময় নষ্ট করিয়া আসা গেল, এবং কাতর ভাবে দু-চার লাইন মুখস্থও বলা গেল। তিনি রোজই বইখানি পড়িয়া শুনাইতেন, এবং সেই পাঠ শুনিবার লোভেই সকলে নিত্য গিয়া হাজির হইতাম। মালতীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি, তিনি অতিশয় ভালমানুষ, অমন ঝাঁঝাল, ধারাল কথা-গুলির ঠিক সুর তাঁহার মুখে আসিত না। রবীন্দ্রনাথ দুই দিন শুনিয়া, তিন দিনের দিন আমাকে বলিলেন, "সীতা, তোমাকে মালতী হ'তে হবে। ও কাজের জন্যে বেশ চট্‌পটে ধারাল লোকের দরকার।" আমি হাসিয়া

ফেলাতে বলিলেন, "ভেব না যে আমি তোমার স্বভাবের সমালোচনা করছি, কিন্তু কি জানি কেন তোমার একটা reputation দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সবাই আশা করছে যে তুমি পারবে। যা act করতে হবে, সেই রকমই যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। এই দেখ না, আমাকে ভাল পার্ট কেউ কখনও দেয় না, এমন কি 'অলীকবাবু' পর্য্যন্ত সাজিয়েছিল, অথচ মিথ্যা কথাটা যে স্বভাবতঃই আমার মুখ দিয়ে বেরয় তা নয়।"

রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা যখন খাইতে বসিতেন, তখন অনেক সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতাম; এক-একদিন অনেকে গিয়া জুটিতাম, ছোট ঘরখানিতে চেয়ারের অভাব ঘটিয়া যাইত। কেহ আসিয়া বসিবার জায়গা না পাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং চাকরদের তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করিতেন। পাছে তাঁহার বিরক্তি-উদ্রেকের কারণ হই, এই জন্য ঘরে ঢুকিবার আগে প্রায়ই উঁকি মারিয়া দেখিতাম চেয়ার ক'খানা আছে, এবং মানুষই বা ক'জন।

একদিনের কথা মনে পড়ে সেদিন কবি নানাবিষয়ে গল্প করিতেছিলেন। তখন সামান্যই খাইতেন, উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলিতেই সময় কাটিয়া যাইত।

মাড়োয়ারীরা ঘিয়ে কি ভেজাল দেয়, মান্দ্রাজের লোকে কেন নারিকেল তৈল দিয়া রন্ধন করে, মাথার চুলে কে কি তেল মাখে—কত বিষয়েই কথা হইল। সাঁওতাল মেয়েদের জীবন যাপন, জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে মানুষের চেহারার সম্পর্ক বিষয়েও আলোচনা হইল।

ঘিয়ের বিষয় গল্প হইতে হইতে একপালা ঝগড়াও হইয়া গেল, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয়। একজন তরুণী আর একজনের নাম করিয়া বলিলেন, "সে ত এই-সব ভেজালের কথা শুনে ঘিই খায় না।" বলিতে না বলিতে দ্বিতীয়া তরুণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এই যে, তোমার কথাই হচ্ছিল, তুমি নাকি জাত যাবার ভয়ে ঘি খাও না?" তরুণীটি কিছু সরল প্রকৃতির ছিলেন, তিনি তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেন কতই শঙ্কিত হইয়াছেন এমন মুখ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বোসো, বোসো, এইখানে ব'সে ভাল ক'রে ঝগড়া কর।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ উপরের ঘরে চলিয়া গেলেন। ঘিয়ের তর্ক সেদিন সন্ধ্যা অবধি চলিল।

বিকাল বেলা কবি ছাদে বসিয়া একলাই গান ধরিয়াছেন

দেখিয়া মীরা দেবীর সঙ্গে উপরে উঠিলাম গান শুনিতে। কিন্তু গান শোনা কপালে ছিল না, সেই সময় দিনেন্দ্র-নাথের গান শেখানোর ঘণ্টা পড়িল ও গান আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথের মনে হইল একটি গানের সুরে কি যেন গোলমাল হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে নামিয়া গানের ক্লাসে চলিয়া গেলেন। আর একদিন তাঁহাকে মেয়েদের সাহিত্যসভায় ডাকা হইল কিছু উপদেশ দিতে। শুধু ত সভাপতির অভিভাষণ দিয়া সভা হয় না, তাই বালিকা মুটু সেক্রেটারি হিসাবে মস্ত এক রিপোর্ট লিখিয়া রাখিল। সেইটি পড়া হইবে, তাহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য বলিবেন। সভা সচরাচর নীচু বাংলাতেই হইত, সেদিন কিন্তু সভাপতি সকলকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা গিয়া দোতলায় উঠিতে না উঠিতে ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিল, সভা ভালই হইল। মেয়েদের কাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। অন্যান্য অধিবেশনে গান হইত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে গান করিতেও সেদিন কেহ রাজী হইলেন না। রিপোর্টটা অবশ্য পড়া হইল।

এ ঘটনাগুলি সবই প্রায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর

মাসের। একদিন দিনুবাবুর গানের ক্লাসের পর সেই-খানেই বসিয়া রবীন্দ্রনাথ "সঙ্গীত" নামে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। অনেকগুলি গান তাহাতে ছিল, সব ক'টি নিজেই গাহিয়া শুনাইলেন। আর একদিন ছেলেদের সাহিত্যসভায় সভাপতির কাজ করিতে গেলেন। ছেলেরা লজ্জা পায় না মেয়েদের মত অত সহজে, তাহারা গানও গাহিল, আবৃত্তিও করিল, কবিতা ও গল্পও পড়িয়া শুনাইল। সতীশ রায় নামক একটি ছেলে বেশ ভাল একটি কবিতা পড়িয়াছিল। সভাপতি সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। শেষে "জনগণমন-অধিনায়ক" গাহিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

আমাদের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। রবীন্দ্রনাথও এই সময় কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি আর একবার শান্তি-নিকেতনে আসিলেন এবং কলিকাতায় ফিরিলেন নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে।

১৪ই নবেম্বর বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেদিন আমার নিজের ছিল অসুখ এবং বাবা ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। তবুও অনেক কষ্টে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত

হইলাম। মেয়েদের জন্য একটি আলাদা প্রবেশ-পথ খোলা হইয়াছে দেখিলাম। তখনও বেশী কেহ আসেন নাই, দুই-চারিজন পরিচিত যাঁহারা ছিলেন, বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। অন্যান্য বারে মেঝের উপর ফরাশ পাতিয়া দিশী দস্তুরে বসা হইত, এইবার কি জন্য জানি না, দেখিলাম চেয়ার সাজাইয়া বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রবন্ধটি বড় ছিল, পড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। গান হয় নাই। শ্রোতাদের ভিতর উপন্যাসলেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখিলাম। বেশভূষা, ধরণ-ধারণ সবই অত্যন্ত সাদাসিদা।

রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আবার কবে শান্তিনিকেতনে যাইতেছি। "শ্রেয়সী"র খোঁজও একবার করিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শান্তার বিবাহ ছিল তাহার পরের দিন। শান্তার জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনী এই সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কবিকে বিবাহে যাইতে অনুরোধ করায় তাঁহাদের সঙ্গে একটু হাস্য-পরিহাস করিলেন, বিবাহ-সভায় তাঁহার কিরূপ অভ্যর্থনা প্রয়োজন সেই বিষয়ে। গাড়ী আসিতে দেরি 'ছিল, সে সময়টা

বিচিত্রার একতলায় রক্ষিত নানা রকম বই ও ছবি দেখিয়া কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন শ্রীমতী শান্তার বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। বর-কন্যার আসনের সম্মুখেই তাঁহাকে আনিয়া বসানো হইয়াছিল। তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়। দুই বন্ধুতে খুব গল্প করিতেছিলেন। বিবাহান্তে গায়িকাদের কাছে গিয়া গানের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন।

২১শে নবেম্বর আবার বিচিত্রায় ডাক পড়িল। বিষয় দেখিলাম, "সঙ্গীত ও সদালাপ"। সঙ্গীত অনেকগুলি শুনিলাম, কয়েকটি গাহিলেন দিনেন্দ্রনাথ, বাকিগুলি অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তী। সদালাপ যাহা হইল তাহা এত মৃদুকণ্ঠে যে বেশীর ভাগ শুনিতেই পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্তক্ষণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া সময় কাটাইয়া দিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার ছিটা-ফোঁটা যাহা কানে আসিল তাহাতে বুঝিলাম যে সাহিত্যের ভাষা সাধু হওয়া উচিত, না কথ্য হওয়া উচিত এই বিষয়ে কথা হইতেছে। ভাল করিয়া কিছু শুনিতে না পাওয়ার দুঃখে, শেষ অবধি না বসিয়া মাঝপথে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। দুই-তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। প্রতিমা দেবী অতিথিশালার বাড়ীতে রহিলেন, কবি নিজের ছোট বাড়ীটিতেই আসিয়া উঠিলেন।

পৌঁছিয়াই এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার আভাস পাইলাম। আশ্রমের এক অধ্যাপক-পত্নী কিছু অসাবধান ছিলেন। বাসন-কোসন রাত্রেও বাহিরে ফেলিয়া রাখিতেন। তাঁহাকে একটু জব্দ করিবার জন্য কয়েকজন মহিলা যুক্তি করিয়া রাতারাতি বাসনগুলি সরাইয়া রাখেন। গিয়া দেখিলাম এই ভয়াবহ চুরি লইয়া ঘোর আলোচনা চলিতেছে প্রতি বাড়ীতে। সখীদের কাছেও আসল ব্যাপার জানিতে পারিলাম শীঘ্রই, এবং বাসনও একদিন অদৃশ্য থাকিয়া পরের দিন যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। শুক্লপক্ষ তখন, চারিদিকে চাঁদের আলোর জোয়ার, এ হেন সময়ে কোন্ চোর ভরসা করিয়া চুরি করিতে আসিল, ইহা আশ্রমের অনেকেই ভাবিয়া পাইল না।

রবীন্দ্রনাথ যেদিন আসিলেন, সেদিন বিকালে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা হইল। বলিলেন, "সীতা, তোমরা

কখন সব পালিয়ে এলে, এদিকে কত কি হয়ে গেল। আমি জানতুমও না যে তোমরা এখানে চ'লে এসেছ, পরে খোঁজ ক'রে জানলুম।"

সন্ধ্যার সময় অনেকদিনই দেখিতাম আশ্রমের পথগুলিতে বা সামনের রাঙা মাটির পথে বেড়াইতেছেন। সেদিনই সন্ধ্যায় যখন আমরা বেড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন দেখিলাম আশ্রমের অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সামনের রাস্তাটিতে বেড়াইতেছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "বেড়ানো ভাল, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগানো ভাল নয়।"

একদিন বিকালে চা খাইবার সময় হঠাৎ গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন, চা খাইতেও বলিলেন, অবশ্য সে অনুরোধটা পালন করিলাম না। তাঁহার সাম্‌নে খাওয়া তখন আমার কাছে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। দৌহিত্রীর আমাশা হইয়াছিল, একখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক খুলিয়া তাহার জন্য ঔষধ বাছিতেছিলেন। আর একখানা বই দরকার হওয়ায় চাকরকে উপর হইতে সেই বইখানি লইয়া আসিতে বলিলেন। সে বার পাঁচ-ছয় ওঠা-নামা করিয়াও ঠিক বইখানি আনিতে পারিল না। চাকরশ্রেণীর জীবদের বিষয় কিছু কথা বলিলেন। আমার গল্প লেখা সম্বন্ধেও খোঁজ করিলেন।

আমার সাহিত্য-চর্চ্চার খবর প্রায়ই লইতেন, তবে কোন লেখা কখনও পড়িয়াছেন কি না ইহা আমি কোনদিনই জিজ্ঞাসা করি নাই। তাঁহার সম্মুখে নিজের লেখার উল্লেখ করিতেই লজ্জা করিত। আমি প্রথম যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তখন "পথের দেখা" নামে ছোট একটি গল্প লিখিয়াছিলাম। এই গল্পটির তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, "অত শাড়ীর বর্ণনা ত আমি হ'লে দিতে পারতুম না।" নিজে একদিন "পাত্র ও পাত্রী" বলিয়া একটি গল্প পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটিতে এক শ্রেণীর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু তীব্র মন্তব্য ছিল। পড়া শেষ হইলে আমাকে বলিলেন, "সীতা, তোমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক remarks আছে, ওগুলো seriously নিও না যেন।"

বুধবারে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ছেলেরা গান গাহিল। এই কয়েক দিন তাঁহাকে লেখার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতাম। শুনিলাম কলিকাতা হইতে গগনেন্দ্রনাথ তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে Montague সাহেব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চান। বুঝিলাম দুই-চারি দিনের মধ্যেই কবি আবার কলিকাতা চলিয়া যাইবেন।

সন্ধ্যার সময় একদিন কমলা দেবীদের বাড়ী গিয়া দেখি সেখানে খুব গল্প হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে বসিয়া আছেন। কয়েক দিন আগে কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, কমলা দেবী তাহারই গল্প করিতেছিলেন, কারণ তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বসু মহাশয়ের ছাত্রেরা খুব করতালি দিয়াছিল, এবং একজন জগদীশচন্দ্রকে নিজের গলার মালা খুলিয়া পরাইয়া দিয়াছিল শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাততালিই যদি না দেবে ত ছাত্র কিসের? এই আমার ছেলেরাই বড় হোক না তখন দেখবে।" কমলা দেবীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমিও ভাবছি শীগ্‌গিরই এখানে একটা মালা বদলের আয়োজন করব, কিন্তু সেটা ছাত্রের সঙ্গে নয়, আমি অত বোকা নই।"

বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে দিনেন্দ্রনাথ অনেক দেরিতে কার্ড পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহা লইয়াও কবি খানিক রসিকতা করিলেন। দিনেন্দ্রনাথ সচরাচর মেয়েদের মজ্‌লিশের ভিতর আসিতেন না, কিন্তু এইবার বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিলেন, "রবিদাদা মিথ্যে আমার বদনাম রটাচ্ছেন।"

"শ্রেয়সী"র কথা উঠিল। কোন একটা লেখায় বানান

ভুল ছিল, তাহার উল্লেখ করাতে একটি তরুণী বলিলেন, "আমরাও এবার ছেলেদের লেখার সমালোচনা করব।" রবীন্দ্রনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বেশী কিছু লিখতে যেও না, তাতেও বানান ভুল হবে।"

৭ই ডিসেম্বর বিকালের ট্রেনে তিনি কলিকাতা গেলেন। সকালে আমরা একদল অধ্যাপকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছিলাম একটা কাজের ব্যাপারে। ৭ই পৌষের উৎসবের সময় মেয়েদের একটি আনন্দবাজার হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহাতে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় করার কথা আর একবার উঠিল। তবে এবার আর তরুণী বা মহিলাদের ডাক পড়িল না, স্থির হইল বালিকাদের দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে। সকলের বাড়ী ঘুরিয়া তাই অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে পড়িলাম। তিনি দাঁড়াইলেন দেখিয়া আমরাও সেখানে দাঁড়াইয়া গেলাম। অদূরে গাছতলায় বসিয়া সন্তোষবাবু ক্লাস পড়াইতেছিলেন, তিনিও উঠিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ খবর দিলেন যে আগামী সোমবারে Montague সাহেব, Lady Chelmsford প্রভৃতি জোড়াসাঁকোয় ভারতীয় সঙ্গীত শুনিতে আসিবেন, সুতরাং তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

দিনেন্দ্রনাথকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। মীরা দেবী আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "দিনুর যে ক্লাস আছে।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তার কাজটা সীতা ক'রে দেবে।" ক্রমাগত যাওয়া-আসা করা অতি বিরক্তিকর, এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুপুরবেলা অধ্যাপকদের সভা হইতেছে দেখিলাম, সেখানেও কবি উপস্থিত। বিকালে তাঁহার বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া বিদায় লইবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। অগ্রসর হইয়া প্রণাম করাতে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "চললুম সীতা। আশ্রমের শাসন-কার্য্যের যাতে কোন ত্রুটি না হয়, সে-বিষয়ে তোমার উপর ভার রইল। শান্তার উপর আমার তেমন ভরসা নেই, এ তুমিই ঠিক পারবে, আমি আমার সর্ব্বাধ্যক্ষকে ব'লে যাচ্ছি।" গাড়ীতে উঠিবার আগে পর্য্যন্ত এই রসিকতাই নানাভাবে করিলেন, উপস্থিত সকলে ত হাসিয়া অস্থির। এমন সময় একটি অতি ক্ষুদ্র বালিকা, বোধ হয় সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়ী, আসিয়া পরম গম্ভীর ভাবে দিনেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সকলের হাসির স্রোতটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিল।

দিনেন্দ্রনাথ যে ছেলেদের কি রকম বিদ্যা দান করিয়াছেন, তাহা এইবার সীতার কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেপাইতেও কবি ছাড়িলেন না। অতঃপর সদলে প্রস্থান করিলেন। সমরেশ, বুনী প্রভৃতি কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলেও তাঁহাদের সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যাবেলাটা একান্ত শূন্য ঠেকাতে ভুবনডাঙা গ্রাম দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল। মীরা দেবী আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদেরই পরিবারের এক পুরাতন ভৃত্যের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। গ্রামটি মন্দ লাগিল না। যে বাড়ীতে ঢুকিলাম, তাহারা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাটির দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল। অন্ধকার ঘরের ভিতরে নূতন ষ্টীলট্রাঙ্ক অনেকগুলি চকচক্ করিতেছে দেখিলাম। মীরা দেবী পরে বলিয়াছিলেন শুধু ট্রাঙ্ক নয়, রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর অনেক তৈজসপত্রই ভৃত্যবর নিজের ঘরে আনিয়া তুলিয়াছেন। বাড়ীর দুইজন বউ পান সাজিয়া আনিয়া দিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া গ্রামেরই একটি বালকের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

১৩ই ডিসেম্বর কবি আবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ৭ই পৌষের উৎসব শেষ হওয়া পর্য্যন্ত

আশ্রমে থাকিলেন, তাহার পর কলিকাতায় আসিলেন কংগ্রেসে যোগ দিতে। ১৯১৭র ডিসেম্বরের শেষে এই অধিবেশন হয়।

বহুদিন ধরিয়া শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা থাকিলেও ৭ই পৌষের উৎসব এতদিন দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। তখন প্রচণ্ড শীত, বাহির হইলে মনে হইত ঠাণ্ডা বাতাস যেন তীরের মত দেহকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া বিঁধিতেছে। শৈশবে এলাহাবাদে ছিলাম, সেখানে প্রচণ্ড শীত সহ্য করা অভ্যাস ছিল। কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া সে অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনের শীতে বড়ই কষ্ট হইত, কিন্তু রক্তের জোর ছিল তখন, কষ্টটা সহজেই উপেক্ষা করিতাম।

কলিকাতা হইতে উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। আমরা এবার আর আগন্তুকের দলে নয় মনে করিয়া বড়ই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম। ৭ই সূর্য্যোদয়েরও আগে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিয়াছিলাম, তাই প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িলাম। যথাসাধ্য শীতবস্ত্রে নিজেকে আবৃত করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তখনও ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় না। একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া সময় কাটাইলাম। যখন দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ

উপরের ঘর হইতে নামিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। তিনি অবশ্য এত জোরে হাঁটিতেন, যে, বেশীক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিলাম না, পিছাইয়া পড়িলাম। পথে নেপাল-বাবু ও অন্যান্য দু-চার জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মেয়েদের বসিবার স্থান এবার আচার্য্যের সামনের দিকে হইয়াছে, এতকাল পিছনেই হইত। ঠাণ্ডা কনকনে পাথরের মেঝের উপর বসিয়া মনে হইল যেন সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া গেল। কয়েকজন পরিচিতা মহিলা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন দেখিলাম। প্রথম গান হইল, "বিমল আনন্দে জাগ রে"। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী একলাই গানটি গাহিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন। অন্য গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ ও ছেলেরা মিলিয়া করিলেন। উপাসনা আজ পূর্ণাঙ্গ হইল, উদ্বোধন, স্বাধ্যায়, ও উপদেশ। উপাসনান্তে বিদ্যালয়ের ছেলেরা ও অতিথিরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম এখন তাঁহার কাছে যাইবার পথ পাইব না, অন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে পরিচিতা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

ভীড় কমিয়া যাইবার পর ফিরিয়া চলিলাম। দেখিলাম কবি তখনও তাঁহার উপরের ঘরে উঠেন নাই, নীচেই দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাইলে কখনও কোনো উৎসবকে উৎসব বলিয়া বোধ হইত না। সুযোগ দেখিয়া দুই বোনে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম।

বাড়ী আসিয়া জলযোগাদি সারিয়া অতিথিশালায় চলিলাম, কলিকাতা হইতে আগত মানুষগুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে। মাঝপথে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সেইখান হইতেই ফিরিতেছেন, আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েরা কোথায়?" আমি তাঁহাদের খোঁজ জানিতাম না, সুতরাং দিতেও পারিলাম না। তিনি ফিরিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অতিথিদের সন্ধানে চলিলাম নীচু বাংলায়। সেখানেও তাঁহাদের পাইলাম না। হেমলতা দেবী তখন অত্যন্ত ব্যস্ত, কলিকাতা হইতে তাঁহার নাতী-নাতনীর দল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেখানে খানিকক্ষণ বসিয়া বাড়ী ফিরিলাম, দেখি অতিথির দল আমাদেরই ঘরে বসিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিলেন শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তখনই কবির কাছে যাওয়া যায় কিনা তাহার খোঁজ লইতে আরম্ভ

করিলেন। যাহা হউক, এই সময় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ আসিয়া খবর দিলেন যে খাওয়া-দাওয়ার পর কবি আবার শান্তিনিকেতন ভবনে যাইবেন। মেয়েরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। খানিক গল্প হইল, খানিক মেলায় ঘোরা হইল। ১৩৪৬ সালে মেলা যেমন দেখিলাম, তখন ইহার চেয়ে জমিত অনেক বেশী। লোকজনও আসিত ঢের। দুই-চারিটি ছোটখাট জিনিষও কেনা গেল। বেলা অনেক হইয়া যাওয়ার পর বাড়ী ফিরিয়া গেলাম স্নানাহার করিতে। সে সব সারিয়া আবার অতিথিদের সন্ধানে চলিলাম। অতিথি-শালার উপরে নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ও বসিয়া গল্প করা গেল, কিন্তু কবি তখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না। দুই-তিন বার দূত পাঠানর পর, যখন সকলে প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি তখন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন। মহিলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কি শুনিতে চান। মহিলাদের হইয়া কালিদাসবাবু বলিয়া দিলেন যে কবি যে নূতন ইংরেজী কবিতাগুলি লিখিয়াছেন তাহাই তাঁহারা শুনিতে চান। অনেকগুলি কবিতা পর পর রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন। বাংলা কোন্ কবিতার অনুবাদ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি পড়িবার আগেই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, "আজ তোমাদের ঠকাব।" যে খাতাখানি হইতে

পড়িতেছিলেন তাহার উপরে লেখা দেখিলাম Crossing, কিন্তু কবিতাগুলিকে মোটেই 'খেয়া'র কবিতা বলিয়া বোধ হইল না। কবিতা পড়ার মধ্যেই একদল মারাঠী, মাদ্রাজী, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাও তাঁহাদের ভিতর দুই-চারিটি ছিলেন। আমরা এইবার সরিয়া পড়ার চেষ্টা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "পালাচ্ছ কেন? হার মানতে নেই।" যাহা হউক, পালানো তখন অদৃষ্টে ছিল না, দরজা অবধি গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের স্বজাতীয়াও গুটি-তিন-চার আছেন দেখিয়া তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিলাম। একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে অল্পক্ষণের ভিতরেই ভাব হইয়া গেল। তাঁহার নাম শুনিলাম ভানুমতী। কবি হিন্দী ভাল বলিতেন না। সুতরাং ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মারফতে মেয়েদের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা না বলিতে পারার জন্য। গুজরাটী পরোটার খুব প্রশংসা করিলেন, মেয়েরা বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। Manchester Guardian-এ পাঠাইবার জন্য তখন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি নবাগতদের পড়িয়া

শুনাইলেন। তাহার পর নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল, অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। বাহিরে দাঁড়াইয়া খানিক গুজরাটী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা গেল। তাঁহাদের সঙ্গী ভদ্রলোকরা এই সময় আসিয়া জুটিলেন। আমাদের পরিচয় পাইয়া সকলেই বাবার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলকে পথ দেখাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলাম, এবং বাবার কাছে ভিড়াইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আমাদের উৎসবের জন্য দুইখানি শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছেন দেখিয়া খুব খুসি হইয়া উঠিলাম। নূতন শাড়ী পরিয়াই বিকালে বাহির হইলাম, এবং প্রথমেই এক বার নীচু বাংলায় ঘুরিয়া আসিলাম। তাহার পর গেলাম মীরা দেবীর ঘরে। রবীন্দ্রনাথ দেখিলাম তখন চা খাইতে বসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া Christmas cake খাওয়াইতে চাহিলেন, তখনই খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া এড়াইয়া গেলাম। তাঁহার সামনে খাইতে তখনকার দিনে কিছুতেই পারিতাম না। গুজরাটী মেয়েগুলির কথা উঠিল। বলিলেন, "ভানুমতী মেয়েটি বেশ দেখতে।" কিছু দিন আগেই শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী অসুখ হইতে উঠিয়াছিলেন, তবুও এবারকার "প্রেয়সী"তে

অনেকগুলি কবিতা দিয়াছেন এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "অসুখের সময়ই ত মানুষ কবিতা লেখে, আমার শরীর যদি চিরকাল ভাল থাকত তাহলে কি ভেবেছ আমি অত কবিতা লিখতুম? অমন কাণ্ড মানুষ সুস্থ শরীরে করে না।" কমলা দেবী "শ্রেয়সী"তে দিবার জন্য একটি গল্প লিখিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। গল্পের প্লটের মধ্যে বিবাহ বা বিবাহ-ভঙ্গ একটাও নাই শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কোনও কর্ম্মের নয়, বিয়ে একটা দিয়ে দিতে পারলে না?" প্রতিমা দেবী বলিয়া দিলেন যে গল্পের নায়ক একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটিবার ভান করিয়া বলিলেন, "এ নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা, যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা নয়", বলিয়া যেন রাগ করিয়াই উঠিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

এই "শ্রেয়সী" কাগজটি লইয়া কত রঙ্গ-রহস্যের যে সৃষ্টি হইত, তাহা এখনও মনে আছে। দিদি কিছুদিন ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। একদিন দুপুর বেলা রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে দিদি কয়েকটি লেখা সংগ্রহ করিয়া নীচের পথ দিয়া যাইতেছেন। উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "শান্তা, এই দারুণ রোদে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছ লেখার জন্যে, আর আমাকে একেবারে অবজ্ঞা

ক'রে চ'লে যাচ্ছ? আমি কি শ*—এর চেয়েও খারাপ লিখি?"

৭ই পৌষ সন্ধ্যার সময় আর শান্তিনিকেতনকে চিনিবার জো রহিল না। লোকে লোকারণ্য, মাঠ, পথ-ঘাট সবেরই যেন চেহারা অন্য রকম দেখাইতে লাগিল। আশেপাশের গ্রামের লোক আসিয়া আশ্রমের ভিতরের পথগুলিতেও দলে দলে ঘুরিতে লাগিল। সবকিছুই তাহাদের কাছে দেখিবার জিনিষ। আজ আর একলা যেখানে খুসি ঘুরিয়া বেড়ানো যাইবে না, তাহা বুঝিতেই পারিলাম। শুনিলাম অন্যান্য বার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সব আশ্রমবাসিনীদের সঙ্গে করিয়া মন্দিরে লইয়া যান। এবারেও তিনি প্রস্তুতই ছিলেন, মেয়েরা সকলে একত্রে জুটিতে এত দেরি করিলেন যে অবশেষে তিনি একলাই চলিয়া গেলেন। আমরা আরও খানিক দেরি করিলাম, শেষে যখন মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন বিনা অভিভাবকেই এক রকম ছুটিয়া গিয়া উপাসনার স্থানে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের চারিদিকে যে লোহার রেলিঙের প্রাচীর, তাহার গেটগুলি এইবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, বাজে লোকদের ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য।

* একটি তরুণী বধূ।

সমবেত সকলে ঠাসাঠাসি করিয়া মন্দিরের ভিতরেই বসিয়া গেলেন, দরজাগুলিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কারণ বাহির হইতে বড়ই গোলমালের শব্দ আসিতেছিল। ধূপ-ধূনার গন্ধে ঘরের ভিতরটি আমোদিত। সমরেশ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছেলের ঘুম পাইয়া যাওয়াতে রাত্রে গান তত জমিল না, তবে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সকলে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিলাম। উপাসনার পর বাজি পোড়ানো দেখিবার জন্য দল জোটানো গেল। কিন্তু কোথা হইতে যে দেখা যাইবে তাহা স্থির করিতেই অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এখন যেখানে উত্তরায়ণ অবস্থিত সেইখানেই তখন মেলা হইত। এক পাশে মেথরদের কয়েকটা কুঁড়েঘর ছিল। তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখা গেল। ত্রিপুরা রাজবংশের একটি যুবক নাম সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা, তিনিই আমাদের প্রহরী হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু পরে সন্তোষবাবুও আসিয়া জুটিলেন। বাজি অনেক রকম হইল, সাপবাজি, মন্দির-বাজি, চরকী-বাজি প্রভৃতি। তুবড়ি, পটকাও প্রচুর ফুটিল। আধ ঘণ্টার ভিতর সব শেষ হইল। আমরা কয়েকটি বলবান্ ছাত্রের সাহায্যে ভীড় ঠেলিয়া আবার আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর

ফিরিয়া আসিলাম। একটি নেপালী ছাত্রকে খুব বেশী মনে পড়ে, তাহার নাম ছিল নরভূপ। শারীরিক শক্তির যেখানেই প্রয়োজন হইত, সে-ই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া আসিত। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলিয়া আর একটি ছেলের কথা মনে পড়ে। ক্ষিতিমোহনবাবুর দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন এবং ধীরেন, ইহারাও সকল কাজে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

ফিরিবার পথে শালবীথিকার ভিতর আর একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল। বাজি পোড়ানো কেমন দেখিলাম তাহার খোঁজ করিলেন। তাহার পর আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া অতিথিশালার দিকে চলিলেন মহিলা-অতিথিদের খোঁজ লইবার জন্য, বলিলেন, "যাই একবার অতিথিসেবা ক'রে আসি।" ৭ই পৌষের শেষ হইল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, পূর্ণহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

৮ই পৌষ সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ীর চাকরবাকর সবাই অনুপস্থিত। আগের দিন সন্ধ্যা হইতে সবাই ছুটি পাইয়াছিল আমোদে যোগ দিবার জন্য, আমোদটা এমন পরিপূর্ণ ভাবে করিয়াছে যে সকালে আর তাহাদের দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। অনেক কষ্টে নিজেরাই কাজকর্ম্ম

খানিক খানিক সারিয়া তাহার পর বাহির হইলাম। উপাসনা আরম্ভ হইতে তখনও দেরি ছিল দেখিয়া কলিকাতার বন্ধুদের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম, সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করা গেল।

এই দিন উপাসনা হইল ছাতিমতলায়, মহর্ষির বেদীর কাছে। ইহা আশ্রমের বার্ষিক সভাও বটে। প্রথমে গান ও উপাসনা হইল, তাহার পর সভার অধিবেশন। বাবা সভাপতি হইয়াছিলেন। পুরাতন ছাত্রের দল সার বাঁধিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় আর সর্ব্বাধ্যক্ষকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরে পরে অনেকগুলি দূত গেল তাঁহার সন্ধানে, ততক্ষণ ক্রমাগতই গান চলিতে লাগিল। সপ্তপর্ণীর পাতার ফাঁকে ফাঁকে গায়ে রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু তখন শীত এমন যে ঐটুকু রোদে কোনই কাজ হইল না।

যাহা হউক, সর্ব্বাধ্যক্ষ আসিলেন, রিপোর্টও পড়া হইল। রবীন্দ্রনাথ তাহার পর ছোট একটি বক্তৃতা করিলেন। সভা-ভঙ্গের পর ছেলের দল, "আমাদের শান্তিনিকেতন," গাহিতে গাহিতে সমস্ত আশ্রম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। অধ্যাপকদের কুটীরগুলির কাছাকাছি যখন আসিয়াছি, তখন আর-এক দিক্ হইতে

রবীন্দ্রনাথ, বাবা এবং নেপালবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহিলা-অতিথিও কয়েকজন সেইখানে আসিয়া জুটিলেন। মেয়েদের জন্যও এখানে একটি স্কুল করার কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়েদের জন্যেও একটি স্কুল ত আমি খুবই করতে চাই, কিন্তু তার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মেয়েদের এবং শিক্ষয়িত্রীদের মান-অভিমানের পালা।" একবার এ চেষ্টা তিনি করিয়াওছিলেন, তখন নাকি মাঝে মাঝে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী পরস্পরের উপর রাগ করিয়া তিন-চার দিন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতেন। কথাটা অবশ্য রসিকতা করিয়াও বলিয়া থাকিতে পারেন। এই সময় কলিকাতা হইতে কংগ্রেস সম্বন্ধীয় কি একটা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়াতে তিনি উত্তর দিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। দুপুরবেলা স্পোর্ট্স্ ছিল, অনেকক্ষণ মাঠের মধ্যে বসিয়া খেলা দেখা গেল। অতঃপর কলিকাতার অতিথিরা বিকালের গাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে নীচু বাংলায় "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় হইল। মেয়েদের সাজসজ্জা খুবই ভাল হইয়াছিল, অভিনয়ও ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে বেশ ভাল হইয়াছিল। সন্তোষ-বাবুর একটি ভাগিনেয়ী, ডাকনাম রাণু, ক্ষীরির ভূমিকায়

বেশ ভালই অভিনয় করিল। সন্তোষবাবুর দুই বোন মুটু আর রেখা লক্ষ্মী এবং রাণী কল্যাণী সাজিয়াছিল, অন্যান্য অভিনেত্রীদের নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ভিতর বাড়ীর উঠানেই অভিনয় হইল। রবীন্দ্রনাথ দেখিতে আসিলেন এবং অভিনয়ের শেষে অভিনেত্রী এবং কর্ম্মকর্ত্রীদের অভিনন্দন জানাইলেন।

৯ই পৌষ সকালে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণ করা হইল। তখন কাজকর্ম্ম অনেক জুটিয়া গেল বলিয়া যাইতে পারিলাম না। কলিকাতা যাওয়া হইবে কিছুক্ষণ পরেই। জিনিষপত্র গুছাইতে এবং সংসারের কাজকর্ম্ম সারিতেই বেলা কাটিয়া গেল। অন্য বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে দেখা করিলাম। বিকালের ট্রেনে কলিকাতা যাইবার কথা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন লিখিতেছিলেন, আমরা দরজার কাছে পৌঁছিতেই মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কি, পলায়নের চেষ্টা ?" সেই-খানেই দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথা বলিলাম। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করিলেন যে সকলেই খালি তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মাঘোৎসবের সময় তিনি কলিকাতায় যাইবেন কি না।

বলিলেন, "না, আমি আর কোথাও যাব না, এইখানে ব'সেই ১১ই মাঘ করব।" তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুই বোনে ফিরিয়া আসিলাম। স্টেশনে যাইবার সময় গাড়ী-বিভ্রাট ঘটিয়া খানিক দেরি হইয়া গেল। ট্রেনে দুই-তিনটি ভারি মিষ্ট ও সরল স্বভাবের মুসলমান তরুণীর সঙ্গে আলাপ হইল। একটি মেয়ের নাম আরেফা, আর একটির নাম জাহেদা। তাহারা কলিকাতায় আলিপুরে থাকে, ঠিকানাও দিল, গিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করিল। সেটা অবশ্য আর কোনদিন ঘটিয়া উঠে নাই।

শান্তিনিকেতন তখন আমাদের কাছে সত্যই শান্তির নিকেতন ছিল, মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় ফিরিতাম মনে হইত যেন দাবানলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। এখানকার কোলাহল, পরচর্চ্চা, কুৎসা সব অসহ্য ঠেকিত। এবার আবার আসিয়া পৌঁছিলাম কংগ্রেসের হিড়িকের মধ্যে। গোলমালে যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম। আমরা আসিবার দিন-দুই পরেই রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। টিকিট জোগাড় করা, সঙ্গের সাথী জোটানো, নানা রকম কথা শোনা এই করিয়াই দিন কাটিতে লাগিল।

২৭শে ডিসেম্বর বোধ হয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট্ মণ্ডপ বাঁধিয়া এই সভা হইয়াছিল। দুপুর বেলা গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে কি বিষম ভীড়, গাড়ীই চলে না, সারি সারি ট্রাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, গাছে, প্রাচীরে, বাড়ীর ছাদে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখাই যায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া শেষে পাশের একটা গেট্ দিয়া মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা অনেকেই হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা বিশেষ পাওয়া যায় নাই। মেয়েদের জন্য যেদিকে জায়গা হইয়াছিল, অনেক কষ্টে পথ করিয়া সেইখানে গিয়া বসিলাম। শান্তিনিকেতনে যে ভানুমতী বলিয়া গুজরাটি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, ঢুকিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইলাম।

সামনেই সভাপতির মঞ্চ, তাহার উপরে দেশের যত জ্ঞানী ও গুণীর সমাগম হইয়াছে। একটু ভাল করিয়া তাকাইয়াই রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূম্র-আবরণে বেষ্টিত জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম আমি যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার এই

মূর্ত্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিয়াছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের মনেও জাগিয়াছিল, এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়াওছিলেন।। তখনও সভার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, চারিদিকে বিকট কোলাহল। বাহিরের চীৎকার ভিতরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র মণ্ডপের ভিতরের লোকেরাও প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। এক-একজন করিয়া নেতার আগমনই উপলক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধী এবং বালগঙ্গাধর তিলক, এই দুইজনের আগমনেই হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। নানা দেশের দর্শকদের ও মেয়েদের কত রঙের যে বেশভূষা আর শিরাবরণ, তাহার ঠিকানাই নাই, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও এত রঙ একত্রে মিলিত কি না সন্দেহ।

সভার প্রারম্ভে গান হইল, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্"। গানের দলে দিনেন্দ্রনাথের চেহারাটাই সবার আগে চোখে পড়িল। গানের পর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অনেকগুলি টেলিগ্রাম পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর "বন্দে মাতরম্" গান হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভগিনী অমলা দাশ এই গানের নেত্রী ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বর্ণনা করিবার

ভাষা নাই, যাঁহারা কোনদিন উহা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা আমার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার India's Prayer পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিতা পাঠ করিলেন। তখনকার দিনে প্রতি সভাতেই এত microphone-এর আবির্ভাব দেখা যাইত না, কিন্তু কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তূর্য্যনাদের মত সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে যাইবামাত্রই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ও নীরব হইয়া গেল। কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতে তাঁহার মিনিট দুয়ের বেশী সময় লাগে নাই।

ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ উঠিলেন সভানেত্রীর নাম প্রস্তাব করিতে, কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ইহার পর নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার ভিতর "Brother Delegates" ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। সভানেত্রী মিসেস্ বেসাণ্ট অতঃপর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। মাথার চুল হইতে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত সব

ধবধব করিতেছে সাদা। বৃদ্ধা মহিলার কিন্তু তখনও কণ্ঠস্বর বেশ সতেজ, শারীরিক শক্তিরও বিশেষ ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না, বেশ ঘণ্টা-দুই একটানা বক্তৃতা করিয়া গেলেন। শেষ হইল, "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী," গানটি হইয়া। বিরাট্ ভীড় ঠেলিয়া, এবং দুই-চারটা ছোট-খাট মারামারি দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম যখন তখন প্রায় সন্ধ্যা। ইহার পর য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর conference দেখিতে যাত্রা করা গেল। সেখানে পৌঁছিয়া সংবাদ পাইলাম যে ভীষণ মারামারি হইয়া সভা ভাঙিয়া গিয়াছে। সেদিনটাই যেন রুদ্র রসের চর্চ্চার জন্য। এখান হইতে সিটি কলেজে থিষ্টিক্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে গিয়াও প্রচুর মারামারি উপভোগ করিয়া আসিলাম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী ছিলেন, আরও অনেক বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড কোলাহলে কাহারও কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না। এক-একবার ভয় হইতে লাগিল যে জীবন্ত বোধ হয় এই ভয়াবহ সভা হইতে আর ফিরিতে হইবে না। মিসেস্ নাইডু তিনতলার হলে একবার বক্তৃতা করিয়া আর একবার দুতলায় চলিলেন বক্তৃতা করিতে। তখন

গোলমাল একটু থামিল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুজরাটি সাহিত্যিক মিঃ রমনভাই, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিলেন। সভা-ভঙ্গের পর কোনোমতে ভীড় ঠেলিয়া বাড়ী আসিলাম।

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলাম বোধ হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী, দুপুররাত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। শান্তি-নিকেতনে তখন সহবৎ নামক একটি গরুর গাড়ীর চালক ছিল, সে-ই দেখিলাম আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়াই চলিলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠ, সুপ্তিমগ্ন গ্রাম পার হইয়া হাঁটিয়ো চলিতে ভালই লাগিতেছিল। আমরাই আগে পৌঁছিলাম, জিনিষপত্র আরও দেরি করিয়া আসিল। বিছানা করিয়া ঘুমানো গেল, ঘরদোর গুছাইবার চেষ্টা আর অত রাত্রে করিলাম না। সকালে উঠিয়া বড়মাকে দেখিতে গেলাম, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। মীরা দেবী ও কমলা দেবীর সঙ্গেও দেখা হইল।

বিকালবেলা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মিলিল। তিনি তখন নিজের ছোট বাড়ীটির নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া-ছিলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "এত রোগা হয়ে এলে কেন? এখন কেমন আছ?"

বেলা দেবীর অসুখ তখন অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রবীন্দ্র নাথকে সর্ব্বদাই বড় ক্লিষ্ট দেখাইত, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজ যাহা ছিল, তাহার কখনও এক চুল এদিক্-ওদিক্ হইত না। সেই রাত্রেই দিনুবাবুর বারান্দায় বসিয়া 'বলাকা' পড়িয়া শুনাইলেন, গানও হইল। তিনি আশ্রমে থাকিলে সকলেই সন্ধ্যাবেলাটা আশায় উন্মুখ হইয়া উঠে, তাঁহার কাছে কিছু শুনিবে বলিয়া, ইহা তিনি জানিতেন। দারুণ উদ্বেগ ও মনোকষ্টের মধ্যেও তাই আমাদের বঞ্চিত করিতেন না। আগেকার মত তাঁহার হাস্যরসের ফোয়ারা অজস্র ছুটিত না, মুখে হাসি কমই দেখিতাম। কেবল এক দিন তাঁহাকে আগের মত হাসিতে দেখিলাম। আশ্রমে কি কারণে জানি না কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বিকালে তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখি তিনি তাঁহার খাইবার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ সীতা, তোমার সন্ধানে পুলিস এসে হাজির।" আমি বলিলাম, "আমার সন্ধানে কি রকম?" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা না ত কি? আমি ভালমানুষ, আমাকে কে বা জানে? ঠিক তোমাদের খোঁজে এসেছে, আমি তবু বাঁচিয়ে দিলুম।"

আর একদিন কাশী হইতে শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রাও নামক

এক ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী আসিয়াছিলেন, শান্তি-নিকেতন দেখিতে। কবি সেদিনও অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। অতিথিদের বাড়ী বোধ হয় কারোয়ারের দিকে; তিনি তাঁহাদের দুই-চারিটা কারোয়ারী গানও শুনাইয়া দিলেন।

আমরা এবার শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর দিন-দুই সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে 'বলাকা'র কবিতা শুনিলাম; তাহার পর তিনি গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিনরাত গানের স্রোত বহিতে লাগিল। নূতন গান রচিত হইলেই দিনুবাবু, অজিতবাবুর ডাক পড়িত। মধ্যে মধ্যে সেখানে শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেনকেও দেখিতাম। তাহার পর সন্ধ্যাবেলা গানের ক্লাস বসিত, দিনুবাবু ছেলেদের নূতন গানগুলি শিখাইতেন। রবীন্দ্রনাথও এইখানে আসিয়া বসিতেন, গান শিখানোতে যোগ দিতেন। ছেলেমেয়েরা চলিয়া যাইবার পরও বড়দের গানের মজলিশ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিত। আমরা যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম না, তাহারাও সমস্তক্ষণই বসিয়া এই অমৃতের স্রোত উপভোগ করিতাম। সেই দিনগুলির কথা যখন স্মরণ করি, মনে হয় মহাকালের গলায় মন্দারকুসুমের মালার মত তাহারা এখনও দুলিতেছে। সময়টা শুক্লপক্ষ ছিল, সন্ধ্যার

পরই জ্যোৎস্না উঠিয়া পড়িত। বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইতাম, রবীন্দ্রনাথের গৃহের কাছে আসিলেই শুনিতে পাইতাম উপর হইতে গানের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার পরই দিনুবাবুর গানের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। কিছুদিন শিশুবিভাগের একটি ঘরে গানের ক্লাস হইয়াছিল। ঘণ্টা শুনিলেই শালবীথিকার মর্ম্মর-মুখরিত আলোছায়া-বিচিত্রিত পথ অতিক্রম করিয়া সেই-খানে গিয়া উপস্থিত হইতাম। রবীন্দ্রনাথও রোজ যথা-সময়ে আসিয়া বসিতেন। গান শেষ হইলে সকলে দল বাঁধিয়া একসঙ্গে ফিরিয়া আসিতাম। দিনুবাবুর বারান্দায় বা ঘরে বসিয়া এক-একদিন আরও কিছুক্ষণ গান চলিত। একটু ছায়াচ্ছন্ন কোণ খুঁজিয়া বসিয়া গান শুনিতাম তন্ময় হইয়া, শিখিবার চেষ্টা বিশেষ করিতাম না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া যাইতাম, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি গো, গান-টান কিছু শিখলে?" এই সময়ে রচিত গানগুলি তাঁহার "গীত-পঞ্চাশিকা" বইটিতে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুরুলে বনভোজন করিতে চলিল। রবীন্দ্রনাথও বিকালে সেখানে যাইবেন শুনিয়া আমরা মেয়ের দলও উৎসাহ করিয়া চলিলাম।

যাইবার সময় রোদে বেশ কষ্ট পাইলাম। আমরা গিয়া পৌঁছিয়া দেখিলাম ছেলের দল তখন ফিরিয়া চলিয়াছে। একটু নিরুৎসাহের সঞ্চার হইল, ভাবিলাম ভাঙা হাটে কিছু সুবিধা হইবে না বোধ হয়। কিন্তু কপাল ভাল ছিল, আমরাই সবচেয়ে লাভবান্ হইলাম। স্কুলে তখন একখানি মাত্র বড় দোতলা বাড়ী, ইহা লর্ড সিংহের নিকট হইতে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহারই দালানে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। তাহার পর কবি যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন বোধহয়, যাহা হউক, হাসিমুখেই বসিতে বলিলেন। নিজের দুই-একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার পর সুরু হইল গানের পালা। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী কয়েকটি হিন্দী গান করিলেন, তাহার পর 'ফাল্গুনী' উজাড় করিয়া বসন্তের গান চলিল। "আজ বিজন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে," গানটি কবি সেই দিনই রচনা করিয়াছিলেন বোধহয়, সর্ব্বশেষে সেই গানটি তিনি একলা গাহিয়া শুনাইলেন।

রাত হইয়াছিল অনেক, ইহার পর বাড়ী ফিরিবার পালা। গাড়ীতে ফিরিব, না হাঁটিয়া ফিরিব, তাহা লইয়াই

মহা তর্ক বাধিয়া গেল। মেয়েদের ইচ্ছা তাহারা হাঁটিয়া যায়, অন্য সকলের ইচ্ছা তাহারা গাড়ী চড়ে। রবীন্দ্রনাথও যখন গাড়ী চড়িতে বলিলেন তখন আমরা বিপদে পড়িলাম, কারণ তাঁহার আদেশ কেহ অমান্য করিতে পারি না। আমাকে বলিলেন, "সীতা, তুমি কলকাতার থেকে এবার বেজায় রুগ্ন হয়ে এসেছ, তুমি ওঠ।" নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে গাড়ীতেই উঠিতেছি এমন সময় কি মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ তরুণ জ্যোৎস্নায় পথ চলা যাবে," বলিয়া নিজে হাঁটিয়া অগ্রসর হইলেন। আর তখন কে গাড়ী চড়ে? আমরাও দল বাঁধিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তবে কয়েক মিনিটের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ চোখের আড়াল হইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে হাঁটা আমাদের কর্ম্ম ছিল না, তিনি বোধহয় আমাদের এক ঘণ্টা আগে শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা সারাপথ খুব গল্প করিতে করিতে আসিলাম, তবে পথে একদল মাতাল আসিয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ ভয়ও পাইলাম। বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

এইবার উপরি-উপরি দুই-তিনটি সপ্তাহে বুধবারে তিনি মন্দিরে উপাসনা করিলেন। মন্দিরের চারিদিকে কয়েকটি আমলকী গাছ ছিল। শীতের প্রকোপে পাতা

সব খসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু ডালগুলি ফলভারে আনত। এই ছবিটি এখনও বেশ মনে পড়ে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। বেলা দেবীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, টেলিগ্রাম আসিয়াছে। মীরা দেবীর মুখে টেলিগ্রামের খবর শুনিয়া কবি শুধু বলিলেন, "এ ত অনেক দিন থেকেই জানি, তবু মনকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম।" তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া গেল, দুপুরের গাড়ীতেই তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তাড়াতাড়ি করিয়া যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। মীরা দেবীও পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। চারিদিকে বিষণ্ণভাবে আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক ছাত্র সকলে দাঁড়াইয়া। সকলে প্রণাম করিল, প্রত্যভিবাদন করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। ট্রেনের সময় প্রায় হইয়া গিয়াছিল, গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শান্তিনিকেতনে তখন শীত কাটিয়া গিয়া ক্রমে বসন্তের পদচিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। একদিকে পাতা ঝরার তখনও অবসান হয় নাই, অন্যদিকে তরুণ কিশলয় সোনালী আভায় ফুটিয়া উঠিতেছে, বাতাস আম্র-মুকুলের

গন্ধে ভরপূর্‌। আমাদের মন কিন্তু তখন এমন বিষাদ-ভারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, যে, এসব দিকে চোখই পড়িত না। কলিকাতার খবর প্রায়ই পাইতাম, কখনও বা কিছু ভাল খবর থাকিত কখনও বা একেবারেই নৈরাশ্য-জনক। চারুচন্দ্র একবার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখিলেন, "তাঁকে দেখলেই মনে হয় শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন,...হাতের স্পর্শেই যেন মনের সঞ্চিত বেদনা বেরিয়ে পড়ে।"

আবার শুনিলাম বেলা দেবী কিছু ভাল আছেন, কলিকাতায় "অচলায়তন" অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের এক আত্মীয়া বলিলেন, "ওঁর মত সব কষ্ট এমন ষোল আনা অনুভব করতেও কাউকে দেখি নি, আবার সেটা অমন ক'রে ঝেড়ে ফেলতেও কাউকে দেখি নি। কিন্তু ঝেড়ে যে ফেলেন সে একেবারে অর্দ্ধেক প্রাণ বার ক'রে।" মনে হইত কথাটা সত্যই।

মাঝে আমার ছোটভাইয়ের পানবসন্ত হওয়ায় আমরা কিছুদিন খানিকটা একঘরে হইয়া কাটাইলাম। তবে প্রকৃতির উদার অঞ্চল যেখানে বিছানো, সেখানে এসব জিনিষ ততটা গায়ে লাগে না। বাহিরের বাসন্তী সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইয়া ও মাঠে বনে ঘুরিয়া দিন বেশ

কাটিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের কয়েকটি ক্লাস পড়াইতেছিলাম, তাহারা পানবসন্তের ভয়ে বাড়ীতে আসা বন্ধ করিল।

মাঝে কালীমোহন ঘোষ মহাশয় কলিকাতা ঘুরিয়া আসিলেন, আসিয়া খবর দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই জাপান হইয়া আমেরিকা যাইতেছেন। সঙ্গে যাইবেন তাঁহার জামাতা ও এণ্ড্রুজ্ সাহেব। পাস্‌পোর্ট পর্য্যন্ত নাকি লওয়া হইয়া গিয়াছে। বহুকাল হয়ত আর তাঁহার দর্শন পাইব না, যাত্রার আগে হয়ত আর দেখাই হইবে না মনে করিয়া অত্যন্ত মুষড়াইয়া গেলাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে তাঁহার পরিবারের সকলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। দিনুবাবুরাও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ইহার মধ্যে ঝড়ে একদিন আমাদের খড়ের ঘরের চাল উড়িয়া যাওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বিত্যালয়ের ছেলেরা সদলে আসিয়া পড়িয়া আমাদের প্রচুর সাহায্য করিল, সমস্ত জিনিষপত্র নিজেরা বহন করিয়া এক বাড়ী হইতে আর-এক বাড়ীতে লইয়া গেল। ধন্যবাদ দেওয়াতে বলিল, "আমরা যখন আপনাদের neighbour, আমাদের ত করাই উচিত।"

নেপালবাবুরও এই সময় বসন্ত হইয়াছিল, ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে স্কুলে রাখা হইয়াছিল। সারিয়া উঠিয়া quarantine-এর পর্ব্ব শেষ হইলে পর তিনি স্কুলের বাড়ীতে মস্ত এক ভোজ দিলেন। আশ্রমের অন্যান্য অধিবাসিনীদের সঙ্গে আমরাও গরুর গাড়ী চড়িয়া ভোজ খাইতে গেলাম। গরুগুলি পথে যত রকম দুষ্টামি করিতে পারে তাহা করিল। স্কুলে পৌঁছিয়া দেখা গেল যে তখনও রান্না শেষ হইতে অনেক দেরি। আমরা তখন দল বাঁধিয়া নেপালবাবুর সঙ্গে "চীপ্ সাহেবের কুঠি" দেখিতে চলিলাম। স্থানীয় নীলকর সাহেবের কুঠির বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ। দেখিয়া খুব ভাল লাগিল। এদিক্কার খোয়াইগুলি ভুবনডাঙার খোয়াইগুলির চেয়ে দেখিতে আরও অনেক সুন্দর ছিল, এখন ত বেশীর ভাগই শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। কুঠির বাগান যাহা ছিল, তাহা তখন পুরাদস্তুর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তাহারই ভিতর অনেকক্ষণ ঘুরিলাম। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করা গেল, খানিকক্ষণ ছেলেদের গানও শুনিলাম। ফিরিবার পথেও গাড়ীর গরুগুলি আগেকারই মত অভদ্রতা করিল, অগত্যা হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিলাম। মাঝে তিন-চার দিনের মত দিদি কলিকাতায় চলিয়া

গেলেন, একলাই কোনোমতে দিন-কয়টা কাটাইয়া দিলাম।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে আসিবেন বলিয়া শোনা গেল। তবে আসন্ন বিদেশযাত্রার আয়োজনে তিনি খুব ব্যস্ত আছেন শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পুরাপুরি আশা করিতে ভরসা হইতেছিল না। মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা বাড়ীর কাজে আশ্রমে একবার আসিলেন, তাঁহার কাছে খবর পাওয়া গেল যে রবীন্দ্রনাথ দুই-একদিনের মধ্যে সত্যই আসিবেন। যে রাত্রে তাঁহার আসিবার কথা, তাহার পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখিলাম সত্যই তিনি আসিয়া পৌছিয়াছেন। ছোট ছাদটির উপর পূর্ব্বাকাশের দিকে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন।

বড়মাও ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। সেবারকার "শ্রেয়সী"খানি হাতে করিয়া, ও সহ-সম্পাদিকা রেখাকে লইয়া তিনিও কবির কাছেই যাইতেছেন মনে হইল। রবীন্দ্র নাথকে প্রণাম করিবার জন্য আমরাও তখনই চলিলাম। গিয়া দেখি তিনি "শ্রেয়সী"খানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছেন, বড়মা কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। প্রণাম করায়, কুশল-প্রশ্ন করিয়া আবার কাগজ দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

আমাদেরও সেইখানে বসিতে বলিলেন। তাঁহাকে :কি রকম যেন চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল, বেশী কথাবার্ত্তা বলিলেন না। আমার মেজভাই শ্রীমান্ অশোক ও প্রশান্তচন্দ্র তখন Bengal Light Horseএ ছিলেন। তাহাদের কথা দু-একটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এখানে আসার অনতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় বিচিত্রার একটা সভা হইয়াছিল, দিদি তখন কলিকাতায়ই ছিলেন শুনিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? জানলে আমি গাড়ী পাঠিয়ে তোমাদের ধ'রে নিয়ে যেতুম।"

তাঁহার খাওয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। ক্ষিতিমোহনবাবু এই সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কথা বলিতে বলিতে রবীন্দ্রনাথ টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জাভাতে তৈয়ারি, শুষ্ক পাতা ঝাঁট দিবার একটা ধাতু-নির্ম্মিত ঝাঁটাগোছের জিনিষ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমাদের বাড়ী বসিয়াই সারাদিন তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। ক্রমাগত লোক আসিতেছে একের পর এক, দেখা করিতে, প্রণাম করিতে, পরামর্শ লইতে। নববর্ষের উৎসব-উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে দুই-একটি অতিথি-

সমাগমও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুপুরে দেখিলাম মুলু তাঁহার ঘরে গিয়া নিজের নাইট্ স্কুলের জন্য পুরানো কাগজ সংগ্রহ করিতেছে, এইগুলি বিক্রয় করিয়া সে নিজের ছাত্রদের বই-খাতার খরচ চালাইত। সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম পুরানো কাগজের সঙ্গে কতকগুলি পুরানো চিঠিও সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। দুই-একটি চিঠি তাহার ভিতর বেশ উল্লেখযোগ্য। একজন পার্শী যুবক খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছেন, শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া, "I am a Parsee, and ashamed of it too." পার্শী হওয়াতে লজ্জিত হইবার কি আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় শিশুবিভাগের গুটিদুই ছেলে তাহাদের সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। তাহাদের কয়েকটি মোমবাতির প্রয়োজন, সেইগুলি সংগ্রহ করিতে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ছেলে-দুইটিকে বিদায় করিয়া আবার বাহির হইলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় বর্ষ-শেষের উৎসব-উপলক্ষ্যে উপাসনা। ভয় ছিল পাছে দেরি হইয়া যায়। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনও ছাদেই বসিয়া আছেন। পাশেই ক্ষিতিমোহনবাবু তখন থাকিতেন,

তাঁহাদের ঘরে গিয়া ঢোকা গেল। ঠান্‌দি তখন মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা একসঙ্গেই মন্দিরে চলিলাম। দেখিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথও আমাদের পিছনে আসিতেছেন, এবং ছেলের দলও লাইন বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। আমাদের ঠিক পরেই কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও মন্দিরের জাপানী ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠিল। তাঁহার হাতে এই ঘণ্টাটি যেন সজীব হইয়া উঠিয়া সকলকে পূজায় আহ্বান করিত। আর কাহারও হাতে এই সুরটি লাগিত না।

দিনুবাবু তখনও কলিকাতা হইতে ফিরেন নাই, সুতরাং উপাসনার আগে গান হইল না। কিন্তু বাহিরে উৎসবের আয়োজনের অভাব ছিল না, মন্দিরের ভিতরেও উৎসব-দেবতা সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইবার পর ছেলের দল কবিকে প্রণাম করিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন আমরা আর তাঁহার নিকট অবধি পৌঁছিতেই পারিলাম না। ছেলেদের প্রণামের পালা শেষ হইতেই তিনি অতিথিশালা ভবনের দিকে চলিয়াছেন দেখিলাম। আমরা তখনও

শালবীথিকার কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলাম। অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সাহিত্য-সভার উদ্যোগকারিগণ। তাহারা অতিথিশালার দোতলায় সভা সাজাইয়াছে, কিন্তু কবি কিছুতেই সেখানে যাইতে সম্মত হইলেন না। সভায় সাজ না হইলেও চলে, কিন্তু সভাপতিকে না হইলে চলে না, ইহা তাহারা দুঃখের সহিত স্বীকার করিল এবং সভার স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে গেল। আমরা এই সময় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, দুই-চারটি কথা বলিয়া নিজের দোতলার ঘরে তিনি উঠিয়া গেলেন।

দিনুবাবুর বাড়ীর বারান্দায় ছেলেদের সাহিত্য-সভা বসিল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। আবৃত্তি, গল্প পড়া প্রভৃতি হইল, এক-জন ছাত্রের (বোধ হয় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার) অঙ্কিত একটি ছবি এবং তাহারই দ্বারা গঠিত একটি নরমুণ্ডের cast দেখানো হইল। পঠিত গল্প-দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন যে লেখকরা যেখানে নিজেদের জানাশোনা বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি ভালই হইয়াছে, কিন্তু প্রথম জন হাস্যরসের এবং দ্বিতীয় জন করুণরসের চেষ্টাকৃত আতিশয্যে জিনিষগুলিকে অনেকখানি মাটি করিয়া

ফেলিয়াছেন। অতঃপর ছেলেদের সভার সেক্রেটারি প্রভৃতি নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। সভাপতি তখন উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আমরাও বাড়ী ফিরিলাম।

নববর্ষের দিন অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া পড়িলাম, কি জানি যদি দেরি হইয়া যায়! কিন্তু সূর্য্যোদয়ের আগে উপাসনা আরম্ভ হইল না। রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া মন্দিরের পথে চলিয়াছেন দেখিয়া আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। কবি পণ্ডিতজীকে ডাকিয়া কি যেন বলিলেন, অনুমান করিলাম গানের কথাই হইবে। আরম্ভে পণ্ডিতজী দুই-তিনজন ছেলেকে লইয়া একটি গান করিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিলেন। উপাসনান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

দিনুবাবু তখনও কলিকাতা হইতে ফিরেন নাই, তবু তাঁহারই বাড়ীর বারান্দায় গানের আসর বসিতেছে দেখিলাম। আমরাও গিয়া জুটিতে দেরি করিলাম না। গান অনেকগুলি হইল, বেশীর ভাগই "ফাল্গুনী"র। নূতন গানও কয়েকটি হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুই-তিনটি গান গাহিলেন, এবং সদ্যরচিত তিনটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এইগুলি পরে "পলাতকা"য় স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর সাধু বাংলা ভাষা ও কথ্য বাংলা

ভাষা, ইহার ভিতর কোন্‌টা কবিতার উপযুক্ত বাহন তাহা লইয়া কথা চলিল। জাপান হইতে কবি একটি ভারি সুন্দর ছাতা আনিয়াছিলেন, বলিতেন, "এটি আমার রাজছত্র", সেটি সকলকে দেখানো হইল। এটি জাপান-বাসীদেরই উপহার। সভা ভঙ্গ হইলে বাড়ী ফিরিলাম। কলিকাতা হইতে দুই-তিনজনের বেশী অতিথি এবারে আসেন নাই, কবি হঠাৎ আসিয়া পড়িবেন এটা বোধহয় কলিকাতায় জানাজানি হয় নাই।

মুলুর নাইট স্কুলের ছেলেদের বিকালে খাওয়ানো হইবার কথা ছিল, সুতরাং সারা দুপুর বেলাটা তাহারই আয়োজন করিতেই কাটিয়া গেল। বিকালের দিকে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে ছোটখাট একটা সভা হইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিলাম না, মেয়েরা কেহ সেখানে উপস্থিত নাই দেখিয়া নিজেরা যাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিলাম। পরে নেপালবাবুর কাছে শুনিলাম যে Montague সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Home Rule সম্বন্ধে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেইগুলিই তিনি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন।

বিকালবেলা নাইট স্কুলের ছেলেরা বেশ রীতিমত মার্চ্চ করিয়া আমাদের উঠানে আসিয়া জমা হইল। ঘাসের উপরেই সকলে বসিল, দুই লাইন করিয়া। এক দল

হিন্দু আর এক দল মুসলমান। হিন্দু রমণীর হাতের রান্না খাইতে অবশ্য মুসলমান ছেলেরা কোনো আপত্তি করিল না। তখনও ধর্ম্মমত লইয়া পাগলামিটা বেশী দূর গড়ায় নাই। আমরা খাবারগুলি সাজাইয়া দিলাম, মুলু এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। কালীমোহনবাবুও দলে যোগ দিলেন। অনেকগুলি দর্শকও জুটিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে আগত কালিদাসবাবু, সন্তোষবাবু সস্ত্রীক, নেপালবাবু, বড়মা প্রভৃতি একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন, কবিকেও ডাকিয়া আনিলে ভাল হয়, তিনি ছেলেদের খাওয়া দেখিয়া খুসি হইবেন। মুলুদের সঙ্গে বিজয় বাসু বলিয়া একটি মান্দ্রাজী ছেলে পড়িত, সে-ই তাঁহাকে ডাকিতে ছুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিলেন, তাহার পর নামিয়া আসিলেন। ঘরে যে দুই-চারিখানা চেয়ার ছিল তাহা বাহির করিয়া রাখিলাম, তবে রবীন্দ্র-নাথ ভিন্ন আর কেহ চেয়ারে বসিলেন না। ছেলেমেয়ে-গুলি সত্যই এত আনন্দ করিয়া খাইতেছিল যে তাহা দেখিলেই মন খুসি হয়। নাইট স্কুলের কর্তৃপক্ষের দল যে তাঁহার সব পুরানো কাগজ তুলিয়া আনিয়াছেন, তাহা

ভাষা, ইহার ভিতর কোন্‌টা কবিতার উপযুক্ত বাহন তাহা লইয়া কথা চলিল। জাপান হইতে কবি একটি ভারি সুন্দর ছাতা আনিয়াছিলেন, বলিতেন, "এটি আমার রাজছত্র", সেটি সকলকে দেখানো হইল। এটি জাপান-বাসীদেরই উপহার। সভা ভঙ্গ হইলে বাড়ী ফিরিলাম। কলিকাতা হইতে দুই-তিনজনের বেশী অতিথি এবারে আসেন নাই, কবি হঠাৎ আসিয়া পড়িবেন এটা বোধহয় কলিকাতায় জানাজানি হয় নাই।

মুলুর নাইট স্কুলের ছেলেদের বিকালে খাওয়ানো হইবার কথা ছিল, সুতরাং সারা দুপুর বেলাটা তাহারই আয়োজন করিতেই কাটিয়া গেল। বিকালের দিকে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে ছোটখাট একটা সভা হইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিলাম না, মেয়েরা কেহ সেখানে উপস্থিত নাই দেখিয়া নিজেরা যাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিলাম। পরে নেপালবাবুর কাছে শুনিলাম যে Montague সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Home Rule সম্বন্ধে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেইগুলিই তিনি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন।

বিকালবেলা নাইট স্কুলের ছেলেরা বেশ রীতিমত মার্চ্চ করিয়া আমাদের উঠানে আসিয়া জমা হইল। ঘাসের উপরেই সকলে বসিল, দুই লাইন করিয়া। এক দল

হিন্দু আর এক দল মুসলমান। হিন্দু রমণীর হাতের রান্না খাইতে অবশ্য মুসলমান ছেলেরা কোনো আপত্তি করিল না। তখনও ধর্ম্মমত লইয়া পাগলামিটা বেশী দূর গড়ায় নাই। আমরা খাবারগুলি সাজাইয়া দিলাম, মুলু এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। কালীমোহনবাবুও দলে যোগ দিলেন। অনেকগুলি দর্শকও জুটিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে আগত কালিদাসবাবু, সন্তোষবাবু সস্ত্রীক, নেপালবাবু, বড়মা প্রভৃতি একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন, কবিকেও ডাকিয়া আনিলে ভাল হয়, তিনি ছেলেদের খাওয়া দেখিয়া খুসি হইবেন। মুলুদের সঙ্গে বিজয় বাসু বলিয়া একটি মান্দ্রাজী ছেলে পড়িত, সে-ই তাঁহাকে ডাকিতে ছুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিলেন, তাহার পর নামিয়া আসিলেন। ঘরে যে দুই-চারিখানা চেয়ার ছিল তাহা বাহির করিয়া রাখিলাম, তবে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ চেয়ারে বসিলেন না। ছেলেমেয়েগুলি সত্যই এত আনন্দ করিয়া খাইতেছিল যে তাহা দেখিলেই মন খুসি হয়। নাইট স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের দল যে তাঁহার সব পুরানো কাগজ তুলিয়া আনিয়াছেন, তাহা

কবি সকলকে জানাইয়া দিলেন। বাবা সেই পার্শী ছেলেটির চিঠির কথা উল্লেখ করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে অদ্ভুত অদ্ভুত চিঠি অসংখ্য আসে। বলিলেন, "আমি যদি সে চিঠিগুলো বই করে ছাপাতুম, তাহ'লে সেখানা খুব remarkable বই হ'ত। অবশ্য লেখকদের permission নিতে হ'ত, কিন্তু সম্ভবতঃ বেচারীরা তাতে আপত্তি করত না।" Modern Review-এ ছাপাইবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে নাকি অনেকে তাঁহার কাছে কবিতা পাঠান। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "সেগুলি এতই চমৎকার মশায়, যে ছাপালে আপনার কাগজের গ্রাহক না বেড়ে যায় না।" ত্রিবঙ্কুর হইতে মেনন্ উপাধিধারী এক ব্যক্তি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে, "মানভঞ্জন" গল্পের নায়িকা গিরিবালার পরে কি হইল? এবং ভদ্রলোক যদি নিজের নবজাতা কন্যার নাম গিরিবালা রাখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো আপত্তি আছে কি না। রবীন্দ্রনাথ বাবাকে বলিলেন, "আমি ভাবছিলুম তাকে আপনার কাছে refer ক'রে দেব, গল্পের নামের copyright আছে কি না তা ত আমি জানি না।"

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বালিকা বন্ধুর কথা শোনা গেল। সকলেই চিঠি লেখে, বড় বড় উত্তর চায়

এবং না পাইলে চটিয়া যায়। তাহাদের পত্রের উত্তর দিতে কবিকে মধ্যে মধ্যে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়।

চিত্রকর Rothenstein-এর কন্যা Rachel রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে খবর দিয়াছে যে তাহার calf-টার যদিও মাত্র দুই মাস বয়স, তাহা হইলেও এমন wonderful calf দেখা যায় না। সে যেমন বড়, তেমনই সুন্দর। আরও একটা খবর আছে যে Betty এখন আর caterpillar ধরে না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন এর উত্তর আমি কি দিই বলুন ত? বরং আমাকে যদি জিগ্‌গেস করত যে Home Rule সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে, তা'হলে না হয় অনেক কথা বলতুম, কিন্তু Betty এখন আর caterpillar ধরে না, এর উত্তরে কি বলা যায়? শান্তা, তুমি বল ত একটা কিছু ভেবে।"

শান্তা অবশ্য ইহার উপযুক্ত উত্তর কিছুই দিতে পারিলেন না। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল চিঠি লিখিয়াছে একজন রেড্ ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে। সে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পড়িয়াছে, ও কাগজে তাঁহার একটি ছবি দেখিয়া সেটি কাটিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাহাদের দেশে যান তাহা হইলে বালিকা অত্যন্ত খুসি হয়, তাহার ধারণা East এবং West Indies এর লোকেরা একই জাতের।

ইণ্ডিয়ার লোকদের সে খুব পছন্দ করে, তাহার ইচ্ছা যে সে একজন হিন্দুকে বিবাহ করে। বিবাহের ঘটকালির সুবিধার জন্যই বোধহয় সে নিজের চেহারার খুব নিঁখুৎ বর্ণনা পাঠাইয়াছে। তাহার চিঠি শেষ করিয়াছে সে এই বলিয়া, "But don't think it is a love letter to you." আমরা ত চিঠির কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির, রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তার চিঠিতে এমন কিছু sentiment ছিল না, যাতে আমি তা মনে করতে পারি, তবু সে সাবধান ক'রে দিয়েছে। আমি ভাবলুম, নাহয় লিখতেই বাপু আমাকে love letter, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হত না।"

নাইট স্কুলের ছেলেদের ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কিছু দূরে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নিজেদের চিত্তবিনোদন করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। নাইট স্কুলের শিক্ষক কয়েকজন অতঃপর খাইতে বসিলেন। মা তাঁহাদের পরিবেশন করিতে গেলেন। আমরা দুই বোনেও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ছেলেদের সার্কাস এই সময় আরম্ভ হইল। যথারীতি কাপড়ের বেড়া দিয়া, চীৎকার করিয়া, টীন পিটাইয়া সার্কাস সুরু হইল।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়াও দেখিলাম, খেলা ইহারই মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। টিকিট খালি দুই রকম, এক বক্স, আর এক সর্ব্বসাধারণের জন্য। বক্স্ও একটি, তাহাতে দুইটি চেয়ার পাতা। একটি চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বসিয়াছেন, আর একটি তখনও খালি, শুনিলাম উহা বাবার জন্য। সার্কাসে অবশ্য ছেলেদেরই খেলা শুধু দেখানো হইল, জন্তু-জানোয়ার কিছু ছিল না। ছেলেদের ভিতর দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষবাবুর একটি ক্ষুদ্র ভাগিনেয়, ডাক নাম রুনী, এই দুইজনেই খুব বাহবা পাইল। সার্কাসে একটু ভাঁড়ামী থাকা দরকার। যতীন কর নামক একটি বালক আর-একটি সাথী লইয়া এই অংশের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ক্লাউনের খেলার নাম হইয়াছিল "মোজাকে পেল।" "মোজা"গুলি অবশ্য বালকবালিকারা যতটা উপভোগ করিল, আমাদের ততটা ভাল লাগে নাই, অবশ্য বিশেষ মন্দও লাগে নাই। সার্কাসে ব্যাণ্ডও বাজিল, ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজও হইল। রবীন্দ্রনাথ খেলা শেষ হইবার কিছু আগে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন ফিরিতেছি, তখন দেখিলাম তিনি তাঁহার নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্ধকারেই বোধহয় গলার স্বরে চিনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সীতা, 'মোজাকে খেল' কেমন দেখলে?"

এইভাবে সেবারকার নববর্ষের দিন শেষ হইল।

২রা ভোরবেলা উঠিয়াই একটা নিমন্ত্রণ লাভ করা গেল। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর পত্নী আসিয়া তাঁহার পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বাড়ীর আর সকলেই তখন ঘুমাইতেছেন, আমিই তাঁহাদের বসাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আচার্য্যের কাজ করিবেন শুনিয়া সকলকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিলাম, এবং স্নানাদি সারিয়া যথাকালের আগেই গিয়া সুধাকান্তবাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন সকলেই কাজে ব্যস্ত, রান্নাবান্নার আয়োজন খরস্রোতে চলিতেছে। শিশুকে স্নান করানো হইল, এবং হরিদ্রারঞ্জিতবস্ত্রে সজ্জিত করা হইল। সে কাপড় পরিতে যথারীতি আপত্তি প্রকাশ করিল। অধ্যাপক-কুটীরের সামনের বারান্দা, পূর্ণঘট, আম্রপল্লব ও আল্‌পনা দিয়া সাজান হইল। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন-বাবু উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। শিশুর মুখে প্রথম অন্নদান রবীন্দ্রনাথই করিলেন, ও তাহার নাম রাখিলেন "সৌম্যকান্ত"।

সেই দিনই কবির কলিকাতা যাত্রার কথা, দুপুরের ট্রেনে। নিজের জিনিষপত্র গুছাইবার জন্য এই সময় তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনের গরম বৈশাখ

মাসে বেশ ভয়াবহ, যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। খাওয়া-দাওয়া হইতে তখনও বেশ কিছু দেরি আছে, বুঝিতেই পারিলাম। এই রৌদ্রে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে তখন ইচ্ছা করিল না। কবির সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বাড়ীতেই চলিলাম, কারণ ইহার পর তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ত আর দেখা করার সুবিধাই হইবে না। সিঁড়ি তখন আগুনের মত তাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাহিয়া দুই বোনে উপরে উঠিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ নিজের বই-খাতা সব গুছাইতেছেন। আমাদের দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বিদায় নিতে এসেছ?"

তিনি দাঁড়াইয়া বই গুছাইতেছিলেন, সুতরাং আমরাও দাঁড়াইয়াই কথা বলিতে লাগিলাম। এণ্ড্রুজ সাহেব বড় চঞ্চল, দুদিন কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারেন না, কবির মুখে এই মন্তব্য শুনিয়া বড় কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম, কারণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে-সময়ে অন্ততঃ এক জায়গায় স্থির হইয়া বসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না। অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা খুব ভাল, সেই বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে একবার বলিলেন, "কিছু পড়তে চাও ত চল না? Lady doctor হতে চাও?" সবিনয়ে জানাইলাম সেরূপ কোনো ইচ্ছা আমার নাই।

হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এখানকার গরম সহ্য হয় ?"

আমি বলিলাম, "এলাহাবাদে থাকতে এর চেয়ে বেশী গরমও সয়েছি ত। এখানে তত অসহ্য কিছু লাগে না।" কবি বলিলেন, "শুধু গরম লাগা ত নয়। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় এখানটায় কি রকম একটা desolation আসে, চারিদিক্ ধূ-ধূ করছে, কেউ কোথায়ও নেই, সমস্ত আকাশটার যেন জ্বর হয়েছে, সব জড়িয়ে ভারি একটা desolate ভাব। আমার কিন্তু তখন নেহাৎ মন্দ লাগে না। আমি গরমকে কোনোকালেই বিশেষ আমল দিই নে, কাজেই আমার কষ্ট হয় না। গরম যে লাগছে সেটা মুখ ফুটে বললেই, গরম আরো বেড়ে ওঠে।" যাওয়া-আসা ও বিদেশ-বাস সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, "আমি ভাবছি কাকে কি legacy দিয়ে যাই। আচ্ছা আমার এই মোড়াগুলো নিয়ে যাও, বেশ ব'সে ব'সে গল্প করবে।" কিন্তু শেষ অবধি মোড়াগুলি আর দিলেন না, নিজের স্বল্প গৃহসজ্জার উপকরণগুলির উপর আর-একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বিচিত্র কারুকার্য্যসংযুক্ত দু'টি শিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ঠিক মেয়েলী জিনিষ, আমি ত আর মশলা-টশলা বাঁটি না, এ দুটো তোমাদেরই কাজে লাগবে।"

শিকা-দুইটি তিনি নামাইয়া রাখিলেন। জিনিষ-দুইটি দেখিতে ভারি সুন্দর ছিল, বহুকাল আমাদের কাছে ছিল, তাহার পর কালের প্রকোপে ধ্বংস পায়। আবার বলিলেন, "যদি submarine টেরিন্‌এ লেগে জাহাজ ডুবে যায়, তাহলে তবু মনে রাখবে যে দুটো শিকে দিয়ে গিয়েছিল।" এই রকম ঠাট্টা চিরদিনই আমাদের সঙ্গে করিতেন। তাঁহার কাছে আসিবার পরম সৌভাগ্য যাহার কখনও হইয়াছে, সে যে ইহজীবনে অন্ততঃ কোনো-দিনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না, তাহা কি তিনি জানিতেন না?

নীচে আরও লোকজন তাঁহার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে জানিয়া আমরা এইবার বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "যতই যাবার আয়োজন করছি, ততই কিন্তু মন বলছে এবার তোমার যাওয়া হবে না। এক-একবার ভাবি থেকে যাই, আবার থাকতেও ইচ্ছে করে না। আমাদের এই খোলা মাঠের মধ্যে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন একটা মোহ আছে, সে কেবলি যেন বলে 'এই ভাল'। কিন্তু এটা একটা মোহেরই আবরণ, একে ছিন্ন ক'রে যেতে হবে।" তাঁহার দুই চোখ যেন তখন দেশকাল পার হইয়া কোন্

সুদূরের দিকে চাহিয়া ছিল। জোর করিয়া আবার যেন মনকে ফিরাইয়া আনিলেন, আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি না যাওয়া হয়, তাহলে চন্দননগর কি আর কোথাও গঙ্গার ধারে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকব, দু-চারটে কবিতাও লিখতে পারি, যদি তোমরা যাও তাহলে শুনিয়ে দেব।" এইবার যাইবার সময় উপস্থিত বুঝিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে নামিয়া চলিয়া আসিলাম।

সুধাকান্ত বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া উপস্থিত হইলাম অতঃপর। কয়েকবার প্রচণ্ড রোদে ঘোরাঘুরি করিয়া শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হইতেছিল, তবে সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে-কথা ভুলিয়া গেলাম। বড়মা শৈলবালাকে খবর দিলেন যে বোলপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটা চিতাবাঘ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া সন্তোষবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভয় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সন্তোষবাবুর কাছে একটি বন্দুক ছিল তখন, আমরাও সেটি অনেকবার দেখিয়াছিলাম। শৈলবালার সেই দিন কলিকাতায় যাওয়ার কথা, এই সংবাদে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া তিনি ব্যাঘ্র সম্বন্ধে আরও

কিছু বিশদ সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর কোনো খবর পাওয়া গেল না।

দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সে সময় লোকের ভীড়ে আর তাঁহার কাছে যাওয়ার সুবিধা ঘটিল না। দিনুবাবুর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার যাত্রাপথের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, হয়ত তাঁহার বিদেশ-যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না মনে করিয়া মন অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

বিকালবেলা বাড়ীতে বসিয়া কি করিয়া সময় কাটানো যায় ভাবিতেছি, এমন সময় মুলু আসিয়া খবর দিল যে বাঘ আসার কথাটা নিতান্ত গল্প নয়, বড় কঠিন সত্য। কারণ অল্পক্ষণ আগেই দুইজন আহত গ্রামবাসীকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে আনা হইয়াছে, বাঘ তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিল, গ্রামবাসীদের সমবেত চীৎকার এবং ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ফলে এখন একটি পুকুরপাড়ের ঝোপের ভিতর গিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে কেহই সেখান হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না। ঐ স্থানটির নাম তালতোড়। চারিদিকের ছোট ছোট গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। আশ্রমেও মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নানারকম কথা শোনা যাইতে লাগিল, একজন

অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, তিনি রাত্রে বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। আরও শুনিলাম, সন্তোষবাবুর গো-শালার অতিকায় মহিষটা রাত্রে শিকল ছিঁড়িয়া কাহাকে যেন তাড়া করিয়া গিয়াছিল। গরমের সময় আশ্রমবাসীদের ভিতর অনেকেই খোলা বারান্দায়, উঠানে, এমন কি খোলা মাঠেই শুইয়া থাকিতেন, এ হেন সংবাদে সুতরাং সকলেই বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আদ্যবিভাগের কয়েক-জন বড় বড় ছেলে লাঠি, ভোজালী, রাম-দা, যে যাহা পাইল তাহা লইয়াই বাঘ শিকার করিতে যাত্রা করিল। সন্তোষবাবু তখন পা ভাঙিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহার যাওয়া চলিল না। ক্রমে অধ্যাপকেরা, মাঝারি ছেলেরা এবং অবশেষে শিশুবিভাগের বাচ্চার দলও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। এখন ভাবিলে অবাক্ লাগে যে কেহ তাহাদের বারণ করে নাই কেন। সাধারণ বাঙালী ছেলের ত শুধু-হাতে বাঘ মারিতে যাওয়ার উৎসাহ কখনও হয় না, হইলেও অভিভাবকবর্গ তাহাতে উৎসাহ মোটেই দেন না। তখনকার আশ্রমের আবহাওয়াই ছিল অন্যরকম।

আমরা অবশ্য তালতোড়ে যাইতে পারিলাম না, নিজের নিজের বারান্দা এবং উঠানে দাঁড়াইয়া পথের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার

যখন প্রায় নামিয়া আসিতেছে তখন মুলু দূর হইতে চীৎকার করিয়া খবর দিল যে বাঘটা মারা পড়িয়াছে। কে মারিয়াছে তাহা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো উত্তর পাইলাম না, সে ঐটুকু খবর দিয়াই আবার কোথায় দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। আমরাও এবার রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ভাবিলাম, যদি এধার-ওধার হইতে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। যখন শান্তিনিকেতনের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন শুনিতে পাইলাম রাস্তার একটি লোক আশ্রমের একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাঘটা কে মারল হে?" চাকরটি অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গেই উত্তর দিল, "ইস্কুলের ছেলেবাবুরা।"

এমন সময় দেখা গেল সেই খোয়াইপারের তালবন হইতে পিল্ পিল্ করিয়া ছেলের দল বাহির হইতেছে। প্রথমে ব্যাপার ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরে একটি গরুর গাড়ীও বাহির হইল, সেটাকে ছেলেরা তৎক্ষণাৎ এমনভাবে ছাঁকিয়া ধরিল যে সেটা আর দেখাই গেল না। আমরাও মাঠের উপর দিয়া সেইদিকে চলিলাম। গরুর গাড়ীটা অপেক্ষাকৃত কাছে আসার পর দেখা গেল যে তাহার উপর একটি লাল গামছাকে পতাকা করিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া

ভাবিলাম, গরুর গাড়ীতে করিয়া শিকারই আসিতেছে, কোনো আহত শিকারী নয়। সন্তোষবাবুর গোয়ালের কাছাকাছি আসিয়া গাড়ীটা দাঁড়াইয়া গেল। ছেলের দল প্রচণ্ড উৎসাহে তখন এত কথা বলিতেছে এবং চীৎকার করিতেছে, যে, প্রথমে ভাল করিয়া কিছু বুঝিতেই পারিলাম না। উত্তেজনা একটু কমিলে পর শ্যামকিশোর বলিয়া একটি ছোট ছেলে বলিল, "নরভূপদা আধ ঘণ্টা ধ'রে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে মেরেছেন।" আবার সমবেত কলরব! বাঘ মারার কত রকম বর্ণনা যে শুনিলাম তাহার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। কয়েকজন বড় ছেলে গাড়ীর উপর উঠিয়া বাঘটাকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া সকলকে দেখাইয়া দিল। মাঝারিগোছের চিতা বাঘ, মাথাটা ভোজালীর আঘাতে প্রায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। আশ্রমের বলীশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বাঘটাকে কে মারিয়াছে, সে বলিল তাহারা পাঁচজন ছেলে মিলিয়া মারিয়াছে; অবশ্য বেশীর ভাগ লড়িয়াছে নরভূপ। পাঁচজনের নাম তখন শুনিয়াছিলাম, এখন ভাল মনে নাই। নরভূপ ও দ্বিজেন বাদে বোধহয় ক্ষিতিমোহনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন সেন সেই দলে ছিলেন, কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের একজন ভাগিনেয়ও ছিলেন

বোধহয়। নরভূপকে একবারও দেখিলাম না, শুনিলাম বাঘটা তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আরও দুই-একজনের হাতে পায়ে বেশ সাংঘাতিক আঁচড়ের চিহ্ন দেখিলাম। চিতা বাঘ হইলেও বাঘ ত বটে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া এই ছেলেগুলি যেভাবে লাঠি ও ভোঁজালীর সাহায্যে সেটাকে মারিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে যতটা প্রশংসা তাহারা পাইল, তাহার চেয়ে বেশীই তাহাদের পাওনা ছিল। শুনিলাম স্থানীয় এক জমিদার-পুত্র একটা ভাঙা বন্দুকের সাহায্যে বাঘটাকে একবার গুলিও করিয়াছিলেন, তবে সেটা তাহার মুখে লাগাতে সে বিশেষ জব্দ হয় নাই। বন্দুকটি তিনি পরে আশ্রমের ছেলেদেরও দিয়াছিলেন, তাহারা সেটিকে গদারূপে ব্যবহার করিয়া তাহার বন্দুকলীলা প্রায় সাঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

গরুর গাড়ী আবার চলিল এবং আশ্রমের গণ্ডির ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। যে যে আগে দেখিতে পায় নাই, সকলে ভীড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল। ছেলের দল মিলিয়া শিকারীদের জয়ধ্বনি সুরু করিল, সে আর থামেই না। রবীন্দ্রনাথকে ট্রেনেই টেলিগ্রাম করা হইল, চিঠিও একখানা তখনই লেখা হইয়া গেল। তিনি

বেশী আহত ছেলেগুলিকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

রাত্রেই আবার আশ্রমের মধ্যে একটা বড় সাপ মারা হইল। শিকার-পর্ব্বেই সারাটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর হইতে রোজই খবর পাওয়া যাইত যে নিকটস্থ কোন গ্রামে আর একটা বাঘ বাহির হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সে বাঘটা শেষ পর্য্যন্ত চক্ষুর অগোচরেই থাকিয়া গেল।

ইহার দিন-দুই পরে আমরা কি একটা কারণে দিন-কয়েকের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাত্রাটা বড় অশুভ লগ্নে করিয়াছিলাম বোধহয়, এত দুর্ভোগ জীবনে আর কখনও ভুগিতে হয় নাই। স্টেশনে গিয়াই দেখিলাম যে মেয়েদের গাড়ীতে তিল রাখিবার জায়গা নাই, অগত্যা পুরুষদের গাড়ীতেই উঠিতে হইল। সহযাত্রীদের অভব্য ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া কোনমতে হাবড়া স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। পথেই বৃষ্টি হইতে-ছিল, সে বৃষ্টি যে কলিকাতায় মহাপ্লাবনের রূপ ধরিয়াছে তাহা ট্রেনে থাকিতে বুঝিতে পারি নাই। ট্রেনের মধ্যেই দুই-একবার যদিও ছাতা খুলিয়া বসিতে হইয়াছিল। হাবড়ায় নামিয়া দেখা গেল, স্টেশনের কম্পাউণ্ডের ভিতর এক-

খানিও গাড়ী বা ট্যাক্সি নাই, কুলীরা বলিল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির চোটে সব গাড়োয়ান পলায়ন করিয়াছে। স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুইখানি অচল ট্যাক্সির দর্শন লাভ করা গেল। কুলীরা অনেক হাঁকাহাঁকি করিয়া একখানি সচল ট্যাক্সি জোগাড় করিল। প্রচুর বকৃশিশ পাইবার আশায় চালক সমস্ত লটবহর সমেত আমাদের তুলিয়া লইয়া শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ত বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি আসিতে না আসিতে আমরা এক বিপুল জল-স্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার আতঙ্কিতভাবে গাড়ীকে পিছন হাঁটাইয়া আবার শুষ্ক ডাঙায় ফিরিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া আশেপাশের দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করিল সামনে জল কতখানি। উত্তর যাহা পাওয়া গেল তাহা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। বাবা তাহাকে বলিলেন, আর কোন রাস্তা দিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পৌছানো যায় কি না দেখিতে। ইহার পর ঘণ্টাখানিক যে ভাবে ভ্রমণ করিলাম তাহাকে ঠিক উপভোগ্য বলা যায় না। কলিকাতা যেন সেদিনকার মত Venice-এর রূপ ধারণ করিয়াছিল, ট্যাক্সি যে পথেই যাইতে চেষ্টা করে, খানিক পরে ঝুপ করিয়া এক কোমর জলে গিয়া পড়ে। পথ, অপথ, বিপথ, পাটগুদাম, মহিষের আস্তানা কত জায়গায় যে ঘুরিলাম তাহার ঠিক-

ঠিকানা নাই। বৃষ্টি সমানে চলিয়াছে, গায়ের কাপড় এক পার করিয়া ভিজিতেছে আবার গায়েই শুকাইতেছে। একবার একটা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া হুড়মুড় করিয়া ট্যাক্সির ঘাড়ে পড়িল, অল্পের জন্য ঘোড়ার কামড় খাইতে হইল না। ঘণ্টাখানিক ঘোরার পর বোঝা গেল যে ট্যাক্সি চড়িয়া অন্ততঃ বাড়ী পৌছানো যাইবে না, স্টেশনেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদের সারথী এইবার বলিলেন যে তিনি পথ চিনিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, কোন মতে হাবড়া স্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন waiting room-গুলি সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাজেই বিরাট গাড়ী-বারান্দার এক কোণে একপাল কুলীর মধ্যে নিজেদের বাক্স-বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। ঝড়বৃষ্টির প্রবল ঝাপটা হইতে ত বাঁচিলাম। সেই অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে এক ভীত পাঞ্জাবীর উপর নির্ভর করিয়া অন্ধকার রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ানোর পর এই সামান্য আশ্রয়টুকুও অমূল্য বোধ হইতেছিল। ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া গণিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। দেখিলাম, তখনই আর-একজন অসম-সাহসী যাত্রী তাহাকে ডাকিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। তাঁহাকে যে ড্রাইভার-পুঙ্গব কোন্ খানায় বা জলাশয়ে নামাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর জানিতে পারিলাম না।

কুলীর ভীড়ের ভিতর ভিজা কাপড় বদলানো গেল না, আপাদমস্তক সিক্ত বস্ত্র লইয়াই বসিয়া রহিলাম। স্টেশনে ফিরিতে পারিয়াই যেন আমাদের ভয়-ভাবনা সব দূর হইয়া গিয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। অল্প বয়সে মানুষের শারীরিক সহ্যশক্তি বেশী থাকে, এবং মন থাকে কল্পনাপ্রবণ, বাস্তবের আঘাত তাহাকে সহজে ধরাশায়ী করে না। এখন হইলে এই নৈশ ভ্রমণের ধাক্কা সামলাইতে কতদিন লাগিত কে জানে? তখন ইহা একটা খুব হাসিবার জিনিষ মনে হইয়াছিল। একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী এবং একজন পুলিস সার্জ্জেণ্ট আমাদের উদ্ধার করিবার অনেক চেষ্টা করিল, তবে চেষ্টাগুলি কোন কাজে লাগিল না। বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহারা waiting room খুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যে সাহেবের হাতে তখন এ-সবের ভার ছিল তিনি বলিলেন, একবার এইরূপ অবস্থায় অসময়ে ওয়েটিং রুম খুলিয়া তিনি দশ টাকা জরিমানা দিয়াছেন, আর বেলতলায় যাইতে রাজী নহেন। অতঃপর আরও খানিক ঘোরাঘুরি করিয়া তাহারা একখানা ঘোড়ার গাড়ী জোগাড় করিয়া আনিল, সার্জ্জেণ্ট বলিল সে সাইক্লে করিয়া আমাদের সঙ্গে গিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু গাড়োয়ান মহা চেঁচামেচি

জুড়িয়া দিল যে তাহার ঘোড়ার পায়ের নাল পড়িয়া গিয়াছে, এমন অবস্থায় সে সওয়ারী লইতে সাহস করে না। আমরাও তাহার গাড়ীতে উঠিতে সাহস করিলাম না। ঘণ্টা-তিন এইভাবেই কাটিয়া গেল। দুইটি মুসলমান যুবক এই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাহারাও সাহায্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া খানিক পরে তাহারা আর-একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আনিল। আবার পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। অশুভ যাত্রার ফল তখনও সবটা কাটিয়া যায় নাই, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কাছে আসিয়া গাড়ী আবার এক জায়গায় কাৎ হইয়া প্রায় উল্টাইয়া পড়িল। একটা খোলা ম্যান্‌হোলে তাহার চাকা ঢুকিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, সলিলসমাধি লাভ করা সে-যাত্রা অদৃষ্টে ছিল না, উদ্ধার লাভ করিয়া রাত তিনটার সময় বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া তুলিতে, ভিজা কাপড় ছাড়িতে ও বিছানা করিতে করিতেই প্রায় ভোর হইয়া গেল।

পাড়ায় এই সময় কয়েকজন বাল্যসঙ্গিনীর উপরি উপরি বিবাহ হইয়া গেল। কনেদের বস্ত্রালঙ্কার দেখা,

বরের গল্প শোনা, আইবুড়ভাত ও বিবাহের নিমন্ত্রণ খাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া কয়েকটা দিন দ্রুতবেগে কাটিয়া গেল।

২৪শে এপ্রিল বিচিত্রায় একটি সভা হইল। কার্ডে দেখিলাম "বিচিত্র প্রসঙ্গ" হইবে। জোড়াসাঁকো পৌঁছিলাম যখন তখন মহিলা অতিথি আর কেহ আসেন নাই। প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎ পাইলাম উপরে উঠিয়াই। দুতলার ঘরের সজ্জার একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল, অবগুণ্ঠিত বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্ত্তে বড় বড় চিত্র-বিচিত্র জাপানী লণ্ঠন আলোক বিতরণ করিতেছে। মীরা দেবীর পুত্র ও কন্যার সঙ্গেও দেখা হইল। নীতু শান্তিনিকেতনে যেমন সারাক্ষণ মিষ্ট গলায় গল্প করিত এখানে তাহা করিল না, সলজ্জ হাসি হাসিয়া পলায়ন করিল। নন্দিতা তখন সবে হাঁটা-চলা আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খুব ব্যস্ত ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মালীরা ফুলদানীতে যত ফুল সাজাইয়াছিল, সবগুলি টানিয়া বাহির করিতেছিলেন। একটি ফুল হাতে করিয়া কিছুক্ষণ সঙ্গীতচর্চ্চাও করিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কাছে গিয়া প্রণাম করাতে বলিলেন, "এই যে তোমরা এসেছ, আমি রোজ ভাবি একবার তোমাদের বাড়ী যাব, তা এখানে এসে এমন

politics-এর পাল্লায় পড়েছি যে কিছুতেই আর সময় হয়ে ওঠে না।” চেহারা অনেক খারাপ দেখিলাম। অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অন্তরের বেদনা চাপিয়া বাহির-সংসার ও জনসাধারণের দাবী মিটাইয়া চলিতেন, কিন্তু সংগ্রামের চিহ্ন সবটাই চাপা দিতে পারিতেন না, মুখশ্রীর ভিতর শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিত অনেক সময়ই। দুই-তিন মিনিট পরেই কি একটা প্রয়োজনে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন, যাইবার আগে নাতনীকে বলিয়া গেলেন, “যদিও তুমি ভদ্র বেশভূষা ক'রে এসেছ, তবুও তোমার এ সভায় থাকা চলবে না।”

ক্রমে ক্রমে অভ্যাগত-সমাগম হইতে লাগিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে প্রায় ৭॥০টা বাজিল। ভদ্রলোক কয়েকজন উপরে উঠিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, “তোমরা এবারে নিজেদের সিংহাসন অধিকার কর গিয়ে।” আমরা এতক্ষণ পুরুষদের বসিবার স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম, এখন নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলাম।

“বিচিত্র প্রসঙ্গে”র মধ্যে হইল, গান, বাজনা এবং কবিতা-পাঠ। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, নলিনী দেবী এবং অরুন্ধতী সরকার বাজাইলেন, গানের দলে ছিলেন কবি স্বয়ং, অজিত-

কুমার চক্রবর্ত্তী এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। কবিতা পাঠ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একলাই করিলেন। একটি নূতন কবিতা ও একটি আগেকার লেখা। সভা শেষ হইল Moonlight Sonata দিয়া। ইহার পর অনেকক্ষণ বসিয়া যথেচ্ছ গল্প চলিতে লাগিল। ৯॥০টা বাজে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় লইতে গেলাম। বেশ একটি ব্যূহ অতিক্রম করিয়া তবে তাঁহার কাছে পৌছিতে পারিলাম। আমি প্রণাম করাতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "ভাল কথা, আমার শিকে দুটো কি করলে বল।" বলিলাম সেগুলি নিরাপদেই আসিয়া পৌছিয়াছে। আশেপাশের কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার মুখে এমন কথা শুনিয়া বিস্মিত মুখ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

১লা মে বিচিত্রা সম্মিলনীর আর একটি অধিবেশন হইল। এবার আরম্ভ হইল দিনেন্দ্রনাথের গান দিয়া। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিলেন এবং নিজের নবরচিত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর উপস্থিত কবিবৃন্দকে তিনি তাঁহাদের রচনা কিছু পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন, কিন্তু কেহই কিছু পড়িতে সম্মত

হইলেন না। মীরা দেবী বলিলেন, "এ যে দেখি আমাদের আশ্রমের মেয়েদের সাহিত্য-সভার দশা।"

বোমান্‌জি নামক এক পার্শী ভদ্রলোক এবং রংপুর কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও যাহাতে কিছু রস উপভোগ করিতে পারেন, এইজন্য কবি গুটিকয়েক ইংরেজী কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। কে একজন ইহার পর তাঁহাকে "বিদায় অভিশাপ" পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। তিনি সমস্তটি পড়িয়া শুনাইলেন। "বিদায় অভিশাপ" পড়া শেষ হইলে আর-একটি নূতন কবিতা পড়িলেন।

রবীন্দ্রনাথের পাঠের পরে সভায় উপস্থিত এক ভদ্রলোক "বলাকা"র "তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে" কবিতাটি পাঠ করিলেন। কবির কবিতাপাঠের পর এটি শুনিতে আমাদের একেবারেই ভাল লাগিল না। ভাবিতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোককে পড়িতে না বলিলেই ভাল হইত।

তখনই বাড়ী ফেরা গেল না, মীরা দেবীর সঙ্গে তাঁহাদের তিনতলার ঘরে গিয়া বসিলাম। পথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি দাঁড়াইয়া কয়েকজন অভ্যাগতের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া দুই-চারিটি কথা বলিলেন। বাবা যদি এত ঘন ঘন তাঁহার

সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে passport দিবেন না বলিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম শঙ্কা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর উপরে গিয়া খানিক গল্পসল্প করিয়া কিঞ্চিৎ রাত করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

দুই-তিন দিন পরেই হঠাৎ শোনা গেল যে এখনকার মত রবীন্দ্রনাথের যাওয়া বন্ধ হইল। তখন বিগত মহা-যুদ্ধের শেষ পর্ব্ব চলিতেছে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও জর্ম্মান সব্‌মেরিন্‌ ও যুদ্ধজাহাজ দেখা গিয়াছে বলিয়া রব উঠিল। আত্মীয়বন্ধুদের প্রচণ্ড আপত্তির ফলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ তখন যাত্রা স্থগিত করিলেন।

২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ পাইলাম। সেই দিনই দুপুরবেলা প্রতিবেশিনী এক তরুণীর গায়েহলুদ ছিল, সেখানে নিমন্ত্রণ খাওয়া সারিয়া বাড়ী ফিরিতেই বেলা পড়িয়া গেল। তাহার উপর প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি সুরু হইল, ভয় হইতে লাগিল যে শেষ পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকো যাওয়াটাই না বাদ পড়িয়া যায়। যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ধরিয়া আসিল, আমরাও যাত্রা করিলাম। পৌঁছিয়া শুনিলাম, বসিবার জায়গা এবার গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠকখানায়, করা হইয়াছে। বিচিত্রার দোতলায় খাওয়ান হইবে, তাহা এখন হইতে

সেইভাবে সাজান হইতেছে, সেখানে সভা চলিবে না। তখনও অনেকেই আসেন নাই, সুতরাং গগনবাবুদের বৈঠকখানায় না বসিয়া আমরা প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়াই বসিলাম। এণা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকেও একবার তাঁহাদের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। এইবার সভা আরম্ভ হইবে শুনিয়া একটি বালিকা পথ-প্রদর্শিকার সঙ্গে ৫ নং বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই সময়েই সভায় প্রবেশ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন ও প্রণাম করিয়া ফুলের মালা পরাইতে লাগিলেন, তাঁহার নাতী, নাতনী ও নাতবৌ সম্পর্কের যাঁহারা, তাঁহারাই হইলেন অগ্রণী।

ফুলের মালার ভার যখন কিছু ভয়াবহ হইয়া উঠিল, তখন কবি বলিলেন, "না আর বহন করতে পারব না, নাতনী, নাতবৌদের সব মালাই গ্রহণ করেছি, কিন্তু নাতীদের বেলায় আমি ঐখানেই গণ্ডি টানছি।" অগত্যা অবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার হাতেই মালা দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর আসিতে একটু দেরি হইয়াছিল, এইজন্য গান-বাজনা তখনও আরম্ভ হয় নাই। তিনি আসার পর গান আরম্ভ হইল। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রথমে দুইটি গান-করিলেন। কিছুক্ষণ

পরে অজিতবাবু একটি গান গাহিলেন, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী সুপ্রভা রায়, রমা দেবী ও অজিতবাবু মিলিয়া আর-একটি গান করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। কবিতাটি শুনিয়া সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছোট একটি বক্তৃতা করিলেন। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে লাগাম ছাড়িয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন, সেই সময় দুই-একজন ভদ্রলোকের কাতর মুখের ভাব দেখিয়া আমাদের হাস্যসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ইঁহারা আমাদের তখনকার কালে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্য কিঞ্চিৎ কুখ্যাতই ছিলেন। ইহার পর আরও অনেকগুলি গান হইল, বেশীর ভাগই "মায়ার খেলা"র গান। গুটিকয়েক বর্ষার গানও হইল, তখন বাহির হইতে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি "মায়ার খেলা"র গানের মধ্যে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

গানের আসর শেষ হইল প্রায় রাত ৯॥০টার সময়। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ "তবু মনে রেখ যদি দূরে যাই চ'লে,"

গানটি গাহিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অনেকেই জোর করিয়া চোখের জল সম্বরণ করিলেন।

পুরুষ-অতিথিরা তাড়াতাড়ি বিচিত্রার দিকে অগ্রসর হইলেন, কারণ রাত হইয়াছিল অনেক। আমরা মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবার জন্য পিছাইয়া রহিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও দুই-চারটি কথা বলিয়া, তাঁহার পিছন পিছন গিয়া আমরাও বিচিত্রার দোতলায় উঠিলাম। ঘরটি ভারি চমৎকার সাজানো হইয়াছিল, এখনও যেন সব চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। "বিচিত্রা" সেদিন শুধু বিচিত্রা নয় অপরূপা হইয়া উঠিয়াছিল। আলপনায়, আলোকে ও ফুলসজ্জায় ঘরটি যেন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঘরের চারিধার ঘুরাইয়া আসন করা হইয়াছিল, আসনের সারির সম্মুখে পশ্চাতে আলপনার ছবি। প্রত্যেক অতিথির বসিবার জায়গায় তাঁহার নাম লেখা একখানি কার্ড, পাছে স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এক-একটি অস্ফুট পদ্মকলিকার দ্বারা কার্ডগুলি চাপা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আসনের পাশেই আমার নামের কার্ড রহিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথ বসিবার পরে অতিথিরা নিজের নিজের

স্থানে গিয়া বসিলেন। নাম লেখা থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল হইল। রবীন্দ্রনাথের অপর পার্শ্বের আসনটি ছিল শ্রীমতী কমলা সরকারের। আর-একটি তরুণী আসিয়া গায়ের জোরে সেখানে বসিয়া পড়াতে, যাঁহার স্থান তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। এক-জন কর্ম্মকর্ত্তা ভুল সংশোধন করিবার একবার চেষ্টাও করিলেন, তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণীটিকে তাহাতে টলানো গেল না।

অমন লোভনীয় স্থানে বসিয়া, পরম আনন্দ উপভোগ করিলাম বটে, তবে খাওয়াটা মোটেই হইল না। প্রসন্নময়ী দেবী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বাল্যকালে তাঁহারা কিরূপ খাইতে পারিতেন, তাহার অনেক গল্প শুনাইলেন। কিন্তু আমার তাহাতেও কিছু লাভ হইল না। একজন কর্ম্মকর্ত্তা আমি কিছু খাইতেছি না কেন জিজ্ঞাসা করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা ওকে যথেষ্ট আদর-যত্ন কর নি, তাই বিরক্ত মুখ ক'রে ব'সে আছে, যদিও আমি ওকে খেতে বলেছিলুম।"

আহারাদির পর আবার গানের আসর বসিল। তবে তখন রাত হইয়া গিয়াছে অনেক, বেশীক্ষণ আর বসা চলিল

না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করিয়া ও রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত ১১॥টা বাজিয়া গিয়াছে।

১২ই মে রবিবার ছিল। গ্রীষ্মের জন্য মাস-দেড়েক বিচিত্রা সম্মিলনী বন্ধ থাকিবে, তাই এই দিন ছুটির আগের দিন বলিয়া একটা অধিবেশন হইয়া গেল। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই আমরা গিয়াছিলাম। তিনতলায় উঠিয়া ছাদে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। জোড়াসাঁকোর বিরাট বাড়ীর সবটা তখনও আমরা দেখি নাই, সেদিন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকখানি দেখিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের থাকিবার ঘরও দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর সভার সময় হইয়াছে দেখিয়া চলিলাম সভাস্থলে।

বিচিত্রা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল। তবে সেদিন আসর তেমন জমিল না। একজন অখ্যাতনামা বিদেশিনী মহিলা কবি ও তাঁহার স্বামী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সব-কিছুতে কেমন যেন বেস্থর লাগাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে হইল, এবং নিজেও কথা বলিতে হইল। নূতন অভ্যাগতদের খাতিরে গুটি-দুই ইংরেজী কবিতাও পড়িয়া

শুনাইলেন। তাহার পর সকলের অনুরোধে বাংলা কবিতাও পড়িলেন এবং "চিরকুমার-সভা"রও খানিকটা পড়িয়া শুনাইলেন। কিন্তু শ্রোতাদের ভিতর দুইজন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, বোকার মত মুখ করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি নিজেই যেন কেমন নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। তাঁহার পড়া শেষ হইতেই এক ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া কবিকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি যদি ঐ মহিলা কবিকে তাঁহার রচনা পড়িয়া শুনাইতে বলেন ত ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করিবামাত্র মহিলা তৎক্ষণাৎ রাজী। দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিজের কবিতার পুস্তক খুলিয়া অনর্গল পড়িয়া চলিলেন, থামিবার আর নামই করেন না। সে উৎকট কবিতা এখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেছেন, সুতরাং আমরা উঠিয়া পলাইতেও পারিলাম না, যতক্ষণ কর্ম্মভোগ ছিল বসিয়া শুনিতে হইল। অবশেষে মেমসাহেব থামিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ সৌজন্যের আদান-প্রদান করিয়া স্বামীসহ প্রস্থান করিলেন। আমরা ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইহারা চলিয়া যাওয়ার পর আশা হইল যে অতঃপর হয়ত কবির রচনা কিছু শুনিতে পাইব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি তখন আর কিছু

না করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। আমরাও অল্প পরেই বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। সেদিন আবার ঠিকা রাঁধুনীটি আসে নাই, রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তবু কোন মতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেলাম, এবং খানিক রান্নাঘরে খানিক বাবার ঘরে পালা করিয়া বসিয়া দুই দিক্ বজায় রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। কবি তাঁহার শিলাইদহের জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যেমন ক'রে হোক আমাকে আবার তার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। এখানে আমার চলবে না। ওখানে না থাকলে বোধ হয় আমি 'গোরা' লিখতে পারতুম না।"

আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আর বোলপুরে যাবে না?" বলিলাম, "ছুটির শেষে যাব।" তিনি বলিলেন, "কেন, ছুটির মধ্যে গেলে কোন দোষ আছে?" বাঁকুড়া জায়গাটা কিরূপ সে-বিষয়ে মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন, তাহার পর আমাদের শান্তি-নিকেতনের ক্ষুদ্র কুটীরটির আর কি উন্নতি সাধন করা যায়, তাহার আলোচনাও হইল। অতঃপর কবি আর কোথায় যেন দেখা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

ইহার পরের দিনই আবার আমরা জোড়াসাঁকোতে গেলাম। কমলা দেবী দুইবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে মা গেলেন, আমরাও সঙ্গে চলিলাম। গিয়া শুনিলাম, কমলা দেবী সেই দিনই বাপের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন, আমরা তখন প্রতিমা দেবীর সন্ধানে চলিলাম। এইবারই বোধ হয় মীরা দেবীদের দিদিমাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন চা খাইতে বসিয়াছিলেন, খাইবার ঘরে তাঁহার কাছে গিয়া কিছুক্ষণ বসা গেল। ঘরটির সজ্জা দেখিলাম অনেকটা জাপানী ফ্যাশানের হইয়াছে, চায়ের বাসনগুলিতেও জাপানী প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি কবে শান্তিনিকেতনে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "কবে যাব তা ঠিক করি নি, তবে যাব যে সেটা ঠিক করেছি। আমি না গেলে তোমাদের বাড়ীর বেড়া দেবে কে ?"

কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া গেলেন। আমরা আরও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া ও জলযোগাদি করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

১৬ই মে রাত্রে খবর পাইলাম, সকালে বেলা দেবী মারা গিয়াছেন। বাবা জোড়াসাঁকো গিয়াছিলেন, সেখানে এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া আসিলেন। মন দারুণ পীড়িত

ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। নিজেদের আত্মীয়বিচ্ছেদে মানুষ যে দুঃখ পায়, ইহার পরলোকগমনে সেই দুঃখই অনুভব করিয়াছিলাম। জোড়াসাঁকোয় গিয়া একবার রবীন্দ্রনাথ ও পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, কিন্তু মন যেন ভয়ে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। তবু এই বাধা অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলাম, রবীন্দ্রনাথ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছেই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ বসিয়া। আমরা আসিয়াছি সে খবরটা প্রমথবাবুই বোধহয় তাঁহাকে দিলেন। কবি বারান্দা ছাড়িয়া বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। আমরাও সেইখানে গিয়া বসিলাম। প্রণাম করাতে, অন্য দিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, "বোসো।" মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে খানিক পরে দুই-চারিটি কথা বলিলেন। বাবার সঙ্গেও কয়েকবার কথা বলিলেন তবে মধ্যে মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। কি কথায় একবার একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ করুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চব্বিশ বৎসর পরেও মনে আছে।

তাঁহার আমেরিকা যাত্রার সঙ্গে জার্ম্মানীর গুপ্ত যোগ আছে এই ধরণের একটা মিথ্যা গুজব তখন কোথাও উঠিয়া থাকিবে বোধ হয়। এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। বাবাকে বলিলেন, "ভাবছি এখানে আর এ বিষয়ে কিছু বলব না, একেবারে ওখানে গিয়ে আমার যা বলবার তা বলব। দেখি আগষ্ট মাসে যদি একটা জাহাজ পাই।"

আরও খানিকক্ষণ নীরবে সেইখানে বসিয়া রহিলাম। অবশেষে মীরা দেবী ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উঠিয়া গেলাম। প্রতিমা দেবী বিচিত্রা ভবনের দোতলার একটি ঘরে ছিলেন, তিনিও সেদিন কিছু অসুস্থ। আমরা যাইতেই উঠিয়া বসিলেন। পরলোকগতা বেলা দেবী সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এইখানে শুনিলাম। রবীন্দ্র-নাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে পান, গাড়ী হইতে না নামিয়াই তখনই ফিরিয়া চলিয়া আসেন। বাড়ী আসিয়া দুপুর ১টা পর্য্যন্ত তেতলার ছাদে বসিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিতেও সাহস করে নাই।

বেলা দেবী ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন, মৃত্যুর পর পুষ্প-সজ্জায় সজ্জিত করিয়াই তাঁহার দেহ মোটরকারে করিয়া

শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রতিমা দেবী বলিলেন তখন যেন তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

ইহার পর মীরা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ক্রমে ক্রমে এবাড়ী ওবাড়ী হইতে আরও দুই-চারিজন মহিলা আসিয়া জুটিলেন। মীরা দেবী বেশী কথা বলিতেছিলেন না, তবে একেবারে নীরবও ছিলেন না। যখন মানুষ অনেকগুলি জুটিয়া গেল, তখন শয়নকক্ষে স্থান-সংকুলান হইতেছে না দেখিয়া আমরা সকলে উঠিয়া বিচিত্রার দোতলার বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। কিছু পরে কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া রবীন্দ্রনাথও সেইখানে আসিয়া বসিলেন। কথাবার্ত্তা বলিতেছেন দেখিলাম, কিন্তু মুখের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সকলেই চেষ্টা করিয়া কথা বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম। নীরবতাকে সকলেই ভয় করিতেছিলেন। কিছু পরে গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন-রাত তাঁহার সেই শুষ্ক ছায়াচ্ছন্ন মুখ মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল।

ইহার পর কয়দিন আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। বাবা রোজই জোড়াসাঁকোয় যাইতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, তাঁহারই কাছে কবির খবর পাইতাম।

শুনিলাম কয়েক দিন পরেই তিনি শিলাইদহ চলিয়া যাইবেন। যে শক্তিশেল তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল, কথাবার্ত্তায় তাহার আর উল্লেখ মাত্র করিতেন না।

আর-একবার শুনিলাম গরমটা রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়া কাটাইবেন। তিন্ধরিয়া যাওয়া স্থির হইল, হঠাৎ আবার মত পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

আমরাও ১৫ই কি ১৬ই জুন বোধহয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলাম। মা ও অশোক আমাদের সঙ্গেই আসিলেন, তবে Bengal Light Horse-এর route march উপলক্ষ্যে অশোকের ডাক পড়াতে দুই-এক দিন পরেই মা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। আসিবার দিন একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি, আষাঢ়ের আরম্ভের বর্ষণ, ইহা যে আমাদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য থামিবে এমন কোনো আশা পাওয়া গেল না। ট্রেনে বোলপুর-যাত্রিনী আরও দুই-একটি মহিলাকে দেখিলাম। আকাশ সমানেই কাঁদিতে লাগিল। স্টেশনে নামিয়াও গরুর গাড়ী ভিন্ন আর-কিছু জুটিল না, তাহাতেই বসিয়া যাত্রা করা গেল। বাড়ী যখন পৌছিলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জলস্রোত ঝরিতেছে। দেখিলাম দেহলীর দোতলার

ছোট ঘরটিতে বসিয়া কয়েকজন যুবক কি যেন শুনিতেছেন। সুকুমারবাবু, কালিদাসবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে দূর হইতেই চিনিতে পারিলাম। ইঁহারা পূর্ব্বের দিন কবিবরের সহিত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' যাপন করিতে আসিয়াছেন শুনিলাম। আমাদের তখন যা অবস্থা এবং জিনিষপত্রের যা অবস্থা, অন্য কোনো দিকে আর মন দিবার সুবিধা হইল না। বাক্সের কাপড়চোপড় এবং বিছানা প্রভৃতিও কিছু কিছু ভিজিয়া গিয়াছিল এই-সকলের প্রতিকার ও সংশোধন চেষ্টাতেই দিন কাটিয়া গেল, কাহারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার আর সুযোগ ঘটিল না। পথের কষ্টে মাথা ধরিয়া শীঘ্রই শয্যাগ্রহণ করিতে হইল।

পরদিন দিনুবাবুর বাড়ী রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। বেলা দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁহার যে-রকম ক্লিষ্ট চেহারা দেখিয়াছিলাম, এখনও দেখিলাম প্রায় তাহাই আছে। দুই-চারটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাশী হইতে অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয় এই সময়ে আশ্রমে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা রাণুকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল। এণ্ড্রুজ্ সাহেবও তখন শান্তিনিকেতনেই রহিয়াছেন দেখিলাম।

মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলি ভালই কাটিতে লাগিল। সেই দিনই দুপুরে বোধ হয় একটু ভিজিবার লোভে বাহির হইয়াছিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠা কয়েকজন আসিয়া জোটাতে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর সামনের পথ দিয়া অতিথিশালার বাড়ীর দিকে চলিয়াছি, এমন সময় আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে?" সেইখানেই দাঁড়াইয়া খানিক গল্প হইল, তাহার পর তিনি আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমরা ভিজা মাঠে, লাল মাটির রাস্তায় ঘুরিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিলাম। ফণিভূষণবাবুর বাড়ী গিয়া একবার তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়াও আসিলাম। আমরা থাকিতে থাকিতেই কবিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা অল্প পরেই চলিয়া আসিলাম।

সুকুমারবাবুরা দিন-চার ছিলেন বোধহয়। এ চার দিনই গান, গল্প, কবিতা-পাঠ প্রভৃতি একটানা চলিত। দিন-দুই charade playও হইল। যাত্রার দিন বার-তিনচার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ট্রেন ফেল করিয়া, শেষে সত্য সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছেলেদের ক্লাসে রীতিমত

পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা যাহারা ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী নয়, তাহারাই বোধহয় ক্রমে দলে ভারি হইয়া উঠিতেছিলাম। অন্য শিক্ষকরা আসিয়া বসিতেন, এমন কি Andrews সাহেবও প্রায়ই আসিয়া বসিতেন, যদিও বাংলা তিনি বিশেষ বুঝিতেন না। দশ-বারো বছরের ছেলের দল সমানে বসিয়া শেলী এবং ব্রাউনিঙের কবিতা পড়িতেছে—এ এক দেখিবার জিনিষ ছিল। অন্য জিনিষও অবশ্য তিনি পড়াইতেন। তবে ছোটদের অন্যায় রকম ছোট ভাবার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ছিলেন না, কাজেই তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া যথার্থ সুন্দর জিনিষ তাহাদের পরিবেশন করিতে তিনি কোনোদিনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমরা রবিবারে আসিয়াছিলাম, বুধবারে মন্দিরে নিয়মমত উপাসনা হইল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল, ছেলের দল হুড়মুড় করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল। তখন আশ্রমে ঘর ছিল কয়খানিই বা? চারিদিকে মাঠ আর খোয়াই। বর্ষায় তখন শান্তিনিকেতনের কি অপূর্ব্ব শোভা হইত! চারি-দিকে একেবারে হাজার জলস্রোত একসঙ্গে নামিয়া পড়িত, যেদিকে তাকাইতাম বোধ হইত চোখের

সামনে যেন ঘূর্ণ্যমান জলের পরদা ঝুলিতেছে। সহস্র অজগর সর্পের মত আকাশে বিদ্যুৎ বঙ্কিম গতিতে খেলিতে থাকিত, আর বাজ পড়ার কি প্রচণ্ড শব্দ। বৃষ্টির জল সোজা মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িতে চায়, তীব্র বায়ু তাহাকে তাড়া করিয়া শূন্যে নাচাইয়া লইয়া ফিরে। আবার বৃষ্টি যখন থামিয়া যায়, তখন মাঠ বন সবুজের হাসিতে ঝলমল করে, শত শত শিশু-জলস্রোত চারিদিকে কলধ্বনি তুলিয়া বহিতে আরম্ভ করে। রক্তিম মাটির বুকের উপর দিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলে। ইন্দ্রধনু বিরাট্ বিচিত্র খিলানের মত মাঠের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত রাঙাইয়া তোলে।

১৩ই জুলাই বোধহয় দেহলীর ছাদে বসিয়া অনেকগুলি পুরাতন কবিতা রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন। ব্যাখ্যাও কিছু কিছু করা হইয়াছিল। "স্বর্গ হইতে বিদায়" ও "সিন্ধুর প্রতি" এই দুইটি কবিতা আমরা শুনিলাম। আরও কয়েকটি কবিতা আগে পড়া হইয়া গিয়াছিল, আমরা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে সুরুলে বেড়াইতে গিয়া ফিরিতে দেরি করিয়া ফেলিয়াছিলাম, সুতরাং সেগুলি আর শুনিতে পাই নাই।

ইহারই দিনকয়েক আগে এখানকার মেয়েদের সাহিত্য-সভার জন্মোৎসব হইয়া গেল। মন্দ ধুমধাম হয় নাই।

প্রত্যেকেই বাড়ী হইতে কিছু-না-কিছু খাবার করিয়া আনিয়াছিলেন, কাজেই আহারের ব্যাপারটাও ভালই হইল। নীচু বাংলাতেই সভা হইল, বড়মার শয়নকক্ষটিকে ফুল দিয়া খুব ভাল করিয়া সাজাইয়া, সকলে সেখানেই বসিলাম। গান, পাঠ, গল্প করা, খাওয়া সব-কিছুই বেশ উপভোগ্য হইল।

ইহার মধ্যে ছোট-খাট একটা ভূমিকম্পও হইয়া গেল। খাটে বসিয়া আছি, হঠাৎ তাহা রকিং চেয়ারের মত দুলিতে আরম্ভ করিল। চাহিয়া দেখিলাম দরজা-জানালার কপাট-গুলিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, ছেলেরা মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, অল্পক্ষণেই ব্যাপার চুকিয়া গেল, কাহারও কোনো ক্ষতি না করিয়া।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টা খুব বেশী করিয়া কাজে ডুবিয়া ছিলেন, গান রচনা করা, ক্লাস পড়ানো, গান শিখানো, নিজের রচনা পাঠ করিয়া সকলকে শুনানো, এই-সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। বিশ্রাম যে কখন করিতেন দেখিতে পাইতাম না। আমাদের বাড়ী মধ্যে মধ্যে আসিতেন, বেশীক্ষণ বসিতেন না, বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া, আমাদের হয়ত বা একটা-কিছু প্রশ্ন

করিয়া চলিয়া যাইতেন। বিকালে নিজের ছোট ছাদটিতে বসিতেন, চারিদিক্ হইতে অনেকে গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, দেখিতে দেখিতে স্থানটি সভায় পরিণত হইত।

প্রতি বুধবারে মন্দিরে সকলকে লইয়া তিনি উপাসনা করিতেন। এই দিনটির জন্য আমরা সারা সপ্তাহ আগ্রহ-সহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম।

এই সময় আমার প্রথম ছোটগল্পের বই "বজ্রমণি" বাহির হয়। বই একখানা আমার কাছে আসিবামাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সেখানা পড়িবার জন্য চাহিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যেন বইখানা আর কাহাকেও না দেখান। বইখানা ফিরাইয়া দিবার সময় তিনি খবর দিলেন যে, আর কেহ দেখে নাই, শুধু রবীন্দ্রনাথ সেখানা চাহিয়া লইয়া দেখিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "বইয়ের নাম 'বজ্রমণি' কেন হ'ল ?"

পরদিনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। সন্ধ্যাবেলা তাঁহার ছোট ছাদটিতে বসিয়া আছেন, প্রণাম করিয়া কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বইয়ের নাম 'বজ্রমণি' কেন হ'ল বল ত। এই বিষয়ে আমার নগেনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল।

আমি প্রথমে ভেবেছিলুম তুমি খুব শক্ত রকমের কিছু লিখেছ, পরে দেখলুম তা নয়।" আমি নামকরণের কোন ভাল জবাবদিহি করিতে না পারাতে নিজেই বলিলেন, "অবশ্য নামের মানেটার সঙ্গে জিনিষটাকে যে ঠিক মিলে যেতে হবে তার কোন মানে নেই। মানুষের নামের বেলাতেও ত এরকম মিল হয় না। নাম জিনিষটা নাম মাত্রই, definition হবার তার দরকার নেই।"

কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ চলিল, বাবার সঙ্গেও খানিক আলোচনা হইল। এই সময় রোজই প্রায় গানের ক্লাস বসিত, আজ কবি গানের ক্লাসটিকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুধাকান্তবাবু উপরে আসিয়া খবর দিলেন যে গানের ক্লাস আজ আর হইবে না, কারণ পাচক ঠাকুরদের সকলেরই প্রায় পীড়া হইয়াছে, একজন মাত্র সুস্থ আছে, সে কোনমতে রান্না করিতেছে, বটে, তবে বেশীক্ষণ ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব গানের ক্লাস সেদিন আর বসিল না, অল্পক্ষণ পরে আমরাও চলিয়া আসিলাম।

"বজ্রমণি" তাঁহাকে একখানি দিয়া আসিয়াছিলাম। হাতে করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, প'ড়ে দেখব।" পড়িয়াছেন কি না সে খোঁজ কোনদিন করি নাই। তাঁহার নিকট

হইতে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া, কাগজে ছাপাইয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা কোনদিন হয় নাই, তাই এ বিষয়ে কখনও উৎসাহ প্রকাশ করি নাই। নিজে যখন যাহা দুই-এক কথা অযাচিতভাবে বলিতেন, তাহাই ভগবৎ-আশীর্ব্বাদের মত কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতাম।

আর-একদিন সন্ধ্যায় কমলা দেবী ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁহার সেই ছাদটিতে গিয়া বসিলাম। সেদিন তাঁহার প্রথম জীবনের অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গেলেন। এক মান্দ্রাজী জমিদার কি-রকম তাঁহাকে কন্যাদান করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে গল্প শুনিলাম। গল্প শেষ করিয়া বলিলেন, "সে বিয়ে যদি করতুম, তা হ'লে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক হয়ে, কানে হীরের কুণ্ডল প'রে, মান্দ্রাজে ব'সে থাকতুম, তা না এখন two ends meet করাতে পারি নে, ব'সে ব'সে কবিতা লিখছি।" ভাবিলাম তাহা হইলে কাছে দাঁড়াইতে চাহিতাম কিনা সন্দেহ, কারণ সাত লাখ টাকার জমিদারী অনেক লোকের নিশ্চয়ই আছে, কে বা তাহাদের খোঁজ রাখে?

সর্ তারকনাথ পালিত নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"আমি guarantee দিচ্ছি, তুমি যদি ব্যারিষ্টার হও ত খুব বিখ্যাত হবেই।" রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বিলাতে গিয়া একসঙ্গে অনেক-কিছু পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ল্যাটিন, গ্রীক, History of Rome, কিচ্ছু বাকি রাখি নি। ব্যারিষ্টার হ'লে এতদিন কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা ক'রে কত লোককে জেলে পাঠাতুম, কত লোককে জেল থেকে বাঁচাতুম। কিন্তু কপালে ছিল না। 'ইয়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র ঘটা দেখে আমার পিতা ভাবলেন যে ছেলেটা মেম বিয়েই করে না কি, তাড়াতাড়ি লিখে পাঠালেন, 'তোমার ঢের পড়া হয়েছে, ফিরে এস।' কিন্তু বাস্তবিক সে-রকম কোনো ভয় ছিল না।"

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সময় তিনি কি-রকম ভুল করিয়া অন্যের কম্বল লইয়া গিয়া, পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া কম্বল ফিরানোর চেষ্টায় এক মেমের ঘরে ঢুকিয়া পড়েন সে গল্পও শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন, "আমার মত অক্ষম মানুষ আর নেই। সর্ব্বদা আমাকে আগলাবার জন্যে আর-একজন লোক দরকার। তা না হ'লে কোথায় উঠতে কোথায় উঠি, কোথায় নামতে কোথায় নামি, তার ঠিকানা থাকে না। বিলেতে আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত, আমি

ত আর বলতে পারি নে যে আমার সঙ্গে আর-একজনকেও নিমন্ত্রণ কর; কোন্ ট্রেনে যে উঠতুম, কোথায় যে ভুল ক'রে নেমে যেতুম, সে এক কাণ্ড! পিয়ার্সন্ সেবার আমাকে নিয়ে টের পেয়েছে। খুব করেছে আমার জন্যে। এণ্ড্রুজ সাহেবের এ-সব কোনো ক্ষমতা নেই, সে আমার চেয়েও সেরা।" প্রতিমা দেবীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এরা ওসব খুব পারে। একলাই ট্রামে উঠতে যায়, লাল আলো কিসের, গ্রীন্ আলো কিসের সব জানে, দেখে শুনে আমরাই নিজের জন্যে লজ্জা করত।"

Strand Magazineএ তখন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছবি একসঙ্গে বাহির হইতেছিল। আমি সেইগুলির উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলাম যে বাল্যকালের চেহারার সহিত মানুষের পরবর্ত্তী কালের চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনেক স্থলেই তাই ঘটে বটে। আমিও হঠাৎ বদলে গেলুম। প্রথমে নেহাৎ থ্যাব্ড়া মুখ ছিল, নাকটাকের কোনো সন্ধানই মিলত না, একেবারে বোকার মত দেখতে ছিলুম। বারান্দার রেলিঙের মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে থাকতুম, বড়দাদা এক-একবার এসে মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলতেন, 'রবি ঠিক ফিলসফার হবে, কি-রকম

ভাবতে শিখেছে।' হঠাৎ এক সময়ে লম্বা হয়ে বাড়তে আরম্ভ করলুম, লম্বা নাক বেরিয়ে পড়ল।"

গুজরাটী বালক কতকগুলি তখন আশ্রমে পড়িতে আসিয়াছিল, জিতেন্দ্র বলিয়া একটি ছোট ছেলের চেহারার প্রশংসা করিলেন, গুজরাটবাসিনীদের রূপ লইয়াও একটু আলোচনা হইল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাবেলা সুবিধা পাইলেই তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। কখনও অন্য মেয়েদের সঙ্গে যাইতাম, কখনও বা একলাই যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পক্ষে এই সময়টিই ছিল প্রকৃষ্ট। কিছুদিনের জন্য আমাদের কলিকাতা যাইবার কথা হইতেছিল, হয়ত বহুদিন তাঁহার দর্শন পাইব না মনে করিয়া পরের দিন সন্ধ্যাবেলা একলাই তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বোসো।" আমাদের কলিকাতা যাওয়ার কথা শুনিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমার বাবার কাছে একটা deputation পাঠাব, সব বেশ ছিলে এখানে, আবার খালি ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে?"

এই সময় আরও কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। ছেলেদের পড়ানোর প্রসঙ্গে বলিলেন "Fifth

Classটা আমার খুব ভাল লাগে।" ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা এখানে Fifth Class-এর ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা যদি এই মন্তব্যের কথা পাঠ করেন, নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইবেন। ছেলেদের একটু বয়স হইয়া গেলেই মহিলাদের কাছে পড়িতে তাহারা বেশ কিছু সঙ্কোচ অনুভব করে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছিলাম। সেকথা বলাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছেলে আর মেয়ের মাঝখানের এই বাধাটা আমি ভেঙে দিতে চাই, কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে না।"

একটি অবিবাহিতা তরুণী আশ্রমে শিক্ষয়িত্রীরূপে আসিতে চাহিয়াছিলেন। কবি তাঁহাকে আনিতে একরকম সম্মতই ছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল মহিলাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "না, ওদের দিয়ে চলবে না, কে কখন বিয়ে ক'রে বসবে আর কাজকর্ম্ম সব থাকবে প'ড়ে। বিধবা হ'লে একরকম চলতে পারে।" সন্তোষবাবু তাঁহার আমেরিকার Lady Professorদের অনেক গল্প করিলেন। শান্তিনিকেতনেও মেয়েরা এবং শিক্ষয়িত্রীরা কি-রকম পরস্পরের উপর অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, সেই কথা বলিয়া কবি আবার খানিক হাসিলেন। কবে এই

ব্যাপার হইয়াছিল জানি না, কিন্তু যখনই ইহার উল্লেখ হইত, তিনি অত্যন্ত হাসিতেন।

শান্তিনিকেতনে মশা বেশ আছে। সন্ধ্যার সময় সর্ব্বদাই দেখিতাম কবির হাতের কাছে একটি তেলের শিশি, তেলটার নাম Mosquitol, অল্প করিয়া হাতে ঢালিয়া তিনি বার বার পায়ে মাখাইতেন। তেলটিতে লেবুফুলের মত একটা মিষ্ট গন্ধ ছিল। আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, "ভেবো না যে বুড়োমানুষ, বাত হয়েছে ব'লে পায়ে তেল মালিশ করছি, এ-সব মশার ভয়ে। শান্তিনিকেতনের মশারা ভারি নম্র, সারাক্ষণই পদসেবা করছে, কাজেই এই উপায় অবলম্বন করেছি।"

"শ্রেয়সী" কাগজটি তখনও বাহির হইতেছিল। তাহাতে আমি "নাটকের পঞ্চমাঙ্ক" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমেরিকান ও ইংরেজী কাগজ হইতে সংকলন করিয়া অনেকগুলি উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলাম যে বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ যথেষ্ট কর্ম্মক্ষম থাকে। রেখা এবং ঝুটু, সন্তোষবাবুর দুই বালিকা ভগিনী, "শ্রেয়সী"র প্রচার-বিভাগের কর্ত্রী ছিলেন, "শ্রেয়সী" বাহির হইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে গিয়া পড়িত। এইবার "শ্রেয়সী" বাহির হইবার পরদিনই সন্ধ্যাবেলা টের

পাইলাম যে উনি পাইবামাত্র পত্রিকাখানি আগাগোড়া পড়িয়া ফেলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবারকার "শ্রেয়সী" কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রবীন্দ্রনাথ কাহার লেখা কেমন হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সীতার লেখা আমার সব-চেয়ে ভাল লেগেছে। ওতে কি রকম যে উৎসাহ পেয়েছি তা আর কি বলব। ভরসা হচ্ছে যে এখনও অনেক দিন কাজ করতে পারব। তুমি নব্বুই বছর অবধি মেয়াদ দিয়েছ না?" কয়দিন ধরিয়া যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত, এই লেখাটি লইয়া রসিকতা করিতেন। দুই-এক দিন পরে, বাবা ও দিদির সঙ্গে আবার তাঁহার কাছে গেলাম। তখনও এই লেখাটির কথা তুলিলেন। আমাকে বলিলেন, "দিশী বুড়োদের নাম এত কম দিয়েছ কেন?" দিদি বলিলেন, "আমাদের দেশের লোকদের ঠিক বয়স জানাই যায় না।" রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যেন সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "না, আমি মোটেই বয়স লুকোচ্ছি না, সাল, তারিখ সব ব'লে দিচ্ছি, ঠিক ক'রে হিসেব ক'রে নাও। তোমার প্রবন্ধটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য নয়?" ঝড়বৃষ্টি আসিয়া পড়াতে সেদিন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

কয়েকদিন আগে আশ্রমের উপর দিয়া বেশ মাঝারি-গোছের একটি ঝড় বহিয়া যায়। সেদিন আবার ঝড়ের

সময় দুই-তিনজন বন্ধু মিলিয়া মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পারিয়া উঠিলাম না। সে কি ধূলার ঘটা! চোখে প্রায় কিছুই দেখিতে পাই না, এদিকে প্রবল বাতাসের ধাক্কায় পথ চলা বা দাঁড়াইয়া থাকা দুই-ই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সঙ্গে সেদিন ছোট ছেলেমেয়ে কেহ থাকিলে অত্যন্তই বিপদে পড়িতে হইত। ঝড়ের ঠেলায়ই প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলাম। মাঝপথে প্রবল বৃষ্টি নামিল। দেহলীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম উপরের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ্ সাহেব বসিয়া আছেন। জলসিক্ত মূর্তি-কয়টি চোখে পড়িবামাত্র রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে ভৎর্সনাসূচক কি একটা বলিয়া উঠিলেন, আমি আর তাহা শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পরের দিন তাঁহার সাম্‌নে পড়িবামাত্র বলিলেন, "আমি কাল তোমায় দে'খে বৌমা ঠিক ক'রে খুব ব'কে নিলুম।" তখন যা ঝড়বৃষ্টির ঘটা, যে-কোনো মানুষকে অন্য যে-কোনো মানুষ বলিয়া ভ্রম করা চলিত। এই ঝড়টিতে আমাদের বাড়ীর গোটা-দুই হুড়কা ভাঙিয়া গেল, হরিচরণবাবু যে খড়ের ঘরটিতে বাস করিতেন তাহার উপর বাজ পড়িয়া আগুন লাগিয়া

গেল। বিস্তালয়ের ছেলেদের তৎপরতায় অবশ্য আগুন শীঘ্রই নিবিল, তবে ঘরের ভিতর একটি বালিকা বাজ পড়ায় shock লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, ও তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে শুনিলাম। ইহার পর আশ্রমে থাকিতে বেশী ঝড় দেখিলেই কেমন ভয়-ভয় করিত।

সন্ধ্যাবেলা আর-একদিন তাঁহার কাছে বসিয়া আছি. নীচ দিয়া কয়েকটি তরুণী কলকণ্ঠে গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, একটা রহস্যের মীমাংসা কর ত। তোমরা যাদের সারাদিনই দেখছ, তাদের সঙ্গেও কি ক'রে সারাদিন গল্প কর? মেয়েদের গল্প কখনও শেষ হ'তে ত দেখি না। আমাদের যদি পলিটিক্স্ শেষ হ'ল, তাহলেই সব চুপ।" আমি বলিলাম, "মেয়েরা খুব যা তা বকতে ভালবাসে, ছেলেরা গুরুগম্ভীর বিষয় না হ'লে কথাই বলতে চায় না।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যা-তা গল্পই ত গল্প। আমার ভারি soothing লাগে। ছোট ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের ঐখানে প্রভেদ। অভি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঐ রকম ব'কে যেত।" আমি বলিলাম, "কাবুলীওয়ালার মিনির মত?" কবি বলিলেন, "বেলাটা ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।"

জুলাই মাসের শেষের দিকে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সস্ত্রীক আশ্রমে বেড়াইতে আসেন। সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে আমরা কবির ছাদে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছি এমন সময় সন্তোষবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে অতিথিরা গান শুনিতে আসিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন আমি গাইতে পারিই না ত কি শোনাব?" কিন্তু তাঁহার আপত্তি এ-সকল বিষয়ে কেহ কোনোদিন গ্রাহ্য করিত না। সন্তোষবাবু অতিথিদের আনিতে গেলেন, ভৃত্য তাঁহাদের জন্য চেয়ার আনিতে ছুটিল। রবীন্দ্রনাথের পিছনে চেয়ার আনিয়া রাখাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই পিছনে চৌকি দিচ্ছিস্ কেন? এখনও ত একঘরে হই, নি?" আমরা এইবার উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, "ম্যাজিস্ট্রেটের নাম শুনে যেন আমায় একলা ফেলে পালিও না।" তিনি ছেলেবেলায় কেমন সুন্দর গান করিতেন, এখন গলা কত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এই-সব নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এলাহাবাদে কখন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি ও কখন তাঁহার গান প্রথম শুনিয়াছি সে-কথাও বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলে, না?"

অতিথিরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন দেখিয়া বলিলেন, "পালিও না, ব'স, আমি একটু আতিথ্য করি।" আশ্রমের অনেকের সঙ্গে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া বসিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্রও সস্ত্রীক তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গান কয়েকটি হইল, কবির গলা সেদিন সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর অতিথিরা বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত অনেক হইয়াছে বলিয়া আমরাও উঠিলাম বাড়ী যাইবার জন্য। তাঁহাকে প্রণাম করাতে পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "চললে? যাও, তোমরা সব যানেওয়ালা লোক, তোমাদের সঙ্গে আর ভাব রাখব না।" দেখিলাম আমাদের আসন্ন কলিকাতা-যাত্রার কথা তখনও ভোলেন নাই।

আগষ্ট মাসের গোড়ায়ই কলিকাতায় আসিলাম। যাত্রার দিন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে ও লাইব্রেরীর যত বই আনিয়াছিলাম তাহা ফিরাইয়া দিতেই বেলা প্রায় কাটিয়া গেল। ক্ষিতিমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের তখন আয়োজন চলিতেছে, ঠান্‌দি বিছানা, বালিশ প্রভৃতি তৈয়ারি করাইতে মহা ব্যস্ত। তাঁহার সঙ্গে একটু গল্প করিয়া ও অন্যান্য অধ্যাপক-পত্নীদের কাছেও

বিদায় লইয়া ফিরিয়া গেলাম। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম অল্পক্ষণ পরে। তিনি তখন খাইতে বসিয়াছেন, চারিদিক্ ঘিরিয়া তাঁহার পোষ্য কয়েকটি কুকুরও বসিয়া গিয়াছে। ইহারা ঘরের ছেলেরই মত নানা রকম সুবিধা উপভোগ করিত। সেইখানে বসিয়াই গল্প করিতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ের ছেলেরা তখন মাঝে মাঝে এক-এক দল আসিয়া গুরুদেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইত। সেদিন Fifth group-এর নিমন্ত্রণ খাইবার পালা, তাহারা আসিয়া প্রতিমা দেবীকে একটা তালিকা দিয়া গেল ক'জন খাইবে এবং ক'জন খাইবে না। যাহারা খাইবে না তাহারা শুনিলাম ব্রাহ্মণের ছেলে। তাহারা চলিয়া যাইতেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ছেলেদের খাওয়া বিষয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলিয়া, আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাওয়া কি আজ নিতান্তই ঠিক?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।" কবি বলিলেন, "আমার ছেলেদের খাওয়াটা দেখে গে'লে না? তাদের পড়ার চেয়ে খাওয়াটাই বেশী দেখবার জিনিষ। এক-এক জন যে রকম খাবে ব'লে রেখেছে সে একেবারে ভয়ানক। আমি অবিশ্যি তাদের অত খেতে দেব না, এখান থেকে উঠেই যে

হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে তা হচ্ছে না," বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতিমা দেবীর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করিয়া আমরা উপরে গেলাম রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য। মেঝেয়-পাতা বিছানায় শুইয়া তিনি তখন একখানা মাসিক পত্র পড়িতেছেন, আমাদের দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন. "এসো।" আমরা নিকটে গিয়া প্রণাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পনেরো দিনের জন্যে যাচ্ছ ত?" আমি বলিলাম, "তা ঠিক জানি না।" কবি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি ত তাই শুনলুম সাহেবের (এণ্ড্রুজ্ সাহেব) মুখে, সে যে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিল।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "বেশ ছিলে এখানে, ওখানে গিয়েই জ্বরে পড়বে, তখন আমার কথা মনে হবে।" একটু পরেই বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। ট্রেনে এবার বিশেষ ভীড় ছিল না, ভালয় ভালয় কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম। এবারে পনেরো দিন থাকিব শুনিয়া আসিয়াছিলাম, ঠিক পনেরো-যোল দিন পরেই আবার ফিরিয়া গেলাম। ভরপুর বৃষ্টির ভিতর হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু এবং শ্রীমান্ অশোকের সহপাঠী শ্রীমান্ বিমল সিদ্ধান্ত এইবার

আমাদের সঙ্গে চলিলেন। বোলপুরে নামিয়া দেখিলাম সেখানেও বৃষ্টি, তাহা ছাড়া স্টেশনে কোন প্রকার গাড়ীই নাই। অগত্যা মুটের মাথায় জিনিষ তুলিয়া হাঁটিয়াই যাত্রা করা গেল। বাড়ী আসিয়া, খাওয়াদাওয়া সারিয়া ভিজা কাপড় ও বিছানার ব্যবস্থা করিয়া, শুইতে প্রায় রাত একটা বাজিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দেখা গেল আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন, তবে বৃষ্টি পড়িতেছে না। ঘরদ্বার যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া ও প্রাতরাশ সারিয়া আমাদের অতিথিটিকে লইয়া একবার আশ্রম দেখাইবার জন্য বাহির হইলাম। বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া রেল-লাইন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। একটানা বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে ভরসা হইতেছিল না, যা আকাশের অবস্থা! জলে ভেজাকে তখন অবশ্য বিশেষ-কিছুই ভয় করিতাম না, মোটের উপর ভালই লাগিত। তবে আগের দিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাত-আট ঘণ্টা ভিজিয়া আজ আর ভেজার সখ ছিল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার বিমলকে লইয়া বাহির হইয়া তাহাকে আশ্রমের ভিতরটা, ছাতিমতলা, মন্দির, প্রেস প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলাম। তাহার পর তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া আমরা চলিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে।

তিনি উপরের ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, "তোমরা গেলে যে আসতেই চাও না?" বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। তাঁহার মুখেই প্রথম শুনিলাম যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমার সহপাঠিনী বাল্যবন্ধু সুধাময়ী শীঘ্রই বিবাহ-বন্ধনে যুক্ত হইবেন। সুধা আমার বন্ধু শুধু নহেন, কলিকাতার বাড়ীর নিকটতম প্রতিবেশিনী, কাজেই তাঁহার বিবাহের খবর কলিকাতায় না শুনিয়া এখানে আসিয়া শোনাতে কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া গেলাম। কন্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা-কিছু প্রশ্ন করিলেন, সবের উত্তর দিয়া খানিক পরে চলিয়া আসিলাম। বিকালে এমন সহস্রধারায় বৃষ্টি নামিল যে আর ঘরের বাহির হইবার কোনোই সম্ভাবনা রহিল না।

পরদিন সকালে মেঘ থাকিলেও বৃষ্টি ছিল না, খানিক পথে ও মাঠে ঘুরিয়া আসা গেল। দুপুরে ঠানদির বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইলাম তাঁহার কন্যা-জামাতার আগমন উপলক্ষ্যে। বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই, এইবার গিয়া নূতন বরকে দেখিয়া আসিলাম।

বিকালে মেঘ দেখিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, আশা ছিল, বোধহয় বৃষ্টি হইবে না, হয়ও যদি, ত অল্পস্বল্প হইবে। কিন্তু আমাদের আশাটা নিতান্তই দুরাশা বলিয়া প্রতিপন্ন

হইল। কোপাই নদীর দিকে যাইতে গোয়ালপাড়া বলিয়া ছোট একটি গ্রাম পথে পড়ে। সেই গ্রামটির কাছে আসিতে না আসিতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। কোথাও কোনো আশ্রয় ছিল না, কাজেই বেশ পুরাদস্তুর ভিজিতে ভিজিতে এবং ঝড়ের দাপটে অতি বিপন্ন অবস্থায় কোনোমতে আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর ফিরিয়া আসিলাম। দেহলীর সম্মুখে আসিয়াই একবার ভীত ভাবে উপরের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

বাড়ী পৌঁছিয়া ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িলাম। কিঞ্চিৎ চা এবং প্রচুর বকুনি উদরস্থ করা গেল। প্রতিমা দেবী এই সময় বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় বাহিরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম তিনি বসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদের visit return করতে এলুম।" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য অবনত হওয়া মাত্রই একরাশ ভিজা চুল তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখ, কি কাণ্ড! সন্ধ্যেবেলায় এত বড় চুলগুলো ভিজিয়ে এলে, তোমাদের

মাথা নেড়া ক'রে দেওয়া উচিত।" বাবা আমাদের বৃষ্টিতে ভেজার কাহিনীটা তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন। কবি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা আমাদের আগেকার দিনের ধূপ দিয়ে চুল শুকনোর প্রথাটা চালাও না। তোমরা মাথায় কত কি তেলটেল মাথ, নিশ্চয় কিছু কিছু germ হয়, বেশ fumigate করাও হয়ে যাবে। ধূপের ধোঁয়ায় হয়ত চুলে একটু আঠা হতে পারে, তা চন্দনকাঠের গুঁড়ো দিয়ে দেখতে পার। সেটা একটু বেশী সৌখীন হবে বটে, তবে আমাদের চেয়ে একটু বেশী সৌখীন হওয়াই তোমাদের দরকার।" তাহার পর বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আমি দাঁড়াইয়াই শুনিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসাতে তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার দুই-একদিন পরে শিশুবিভাগের ছেলেরা একটা সাহিত্যসভা করিল। গুরুদেবকে সভাপতি করিতে হইবে, সুতরাং সভাটা তাঁহার ছাদেই হইল। সভাপতির কর্ত্তব্য যে এত দুরূহ তাহা জানা ছিল না, ধাঁধাঁর উত্তর সুদ্ধ তাঁহাকে বলিতে হইল।

দিন আবার সেই আগেরই মত কাটিতে লাগিল। সকালটা কাটিত কাজে-কর্ম্মে, দুপুরে পড়াশুনার কাজ যাহা থাকিত, তাহা সারিয়া রাখিতাম, বিকাল ও সন্ধ্যা

বেড়াইয়া, গল্প করিয়া ও গান শুনিয়া কাটিত। সন্ধ্যার সময়টার জন্য সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতাম, তিনি ছাদে আসিয়া বসিলেই একে একে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতাম। যেদিন কোনো বাধা পড়িত, সেদিন আর আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথের বহুদিন পূর্ব্বের যত ব্রহ্মসঙ্গীত ছেলেদের শিখানো হইতেছিল বৈতালিকের সময় গাহিবার জন্য। অনেক গানেরই সুর কলিকাতায় অতিশয় বিকৃত করিয়া গাওয়া হয়, এখানে ঠিক সুরটি শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম।

বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন ভাঁড়ার তদারকে ব্যস্ত, চায়ের সময় হইয়া আসিয়াছে, টেবিলে চা-ও সাজানো। একটা প্লেটে দেখিলাম কয়েকটি সুপক্ক পেয়ারা। প্রতিমা দেবী সঙ্গিনীদের সাহায্যে সেগুলির সদ্গতি করিবার জন্য কয়েকটি তুলিয়া আনিলেন, এবং লবণ সংযোগ করিলে ব্যাপারটা আরও রুচিকর হইবে এই আশায় ভাঁড়ার ঘরে গেলেন লবণ আনিতে। মনে রাখিতে হইবে ইহা প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমরা কেহই তখন গুরুগম্ভীর গৃহিণীপদবাচ্য হই নাই। প্রতিমা দেবী এক দরজা দিয়া বাহির হইবামাত্র, রবীন্দ্রনাথ আর-এক

দরজা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাদের তখন হইল উভয় সঙ্কট। তাঁহার সাম্‌নে পেয়ারা খাওয়া চলে না অথচ ছুটিয়া পলাইলেই বা তিনি কি ভাবিবেন? আমি তাড়াতাড়ি একটা থামের আড়ালে সরিয়া গেলাম, প্রতিমা দেবী ও দিদি পেয়ারাগুলি আঁচল-চাপা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "কি যেন একটা গোলমাল চলছে, কি ব্যাপার?" কোনো সদুত্তর না পাইয়া খাইবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, প্রতিমা দেবীও তাঁহার পিছন পিছন চলিয়া গেলেন। আমরা পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, তিনি পুত্রবধূর নিকট রহস্যটির মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কি উত্তর তিনি পাইলেন তাহা না শুনিয়াই আমরা তখনকার মত পলায়ন করিলাম। এণ্ড্রুজ্ সাহেবও তখন আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়বিমূঢ় মুখ করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাড়ী যাইতে হইলে দেহলীর সম্মুখের রাস্তা দিয়াই প্রথমটা যাইতে হইত। নীচের বারান্দায় কমলা দেবী ও প্রতিমা দেবী বসিয়া আছেন দেখিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিকালের ব্যাপার

লইয়া হাসাহাসি করিতেছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা পেয়ারা খাচ্ছিলে ত অত লজ্জিত হয়ে পালালে কেন? ও ত সব ভদ্রলোকেই খায়। আমি ভাবলুম বুঝি নুন, তেঁতুল, কাঁচালঙ্কা দিয়ে কোনো মহিলা-জনোচিত কুপথ্যের সৃষ্টি করছ, তাই মনে করছিলুম রামানন্দবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করি।" ইহা লইয়াই আরও খানিকক্ষণ রসিকতা করিলেন। আকাশে তখন মেঘের রাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে ত ছাদ থেকে তাড়াবে এখুনি, আমি এখানে বসলে তোমাদের সখী-সমিতির আপত্তি নেই ত?" তাঁহার জন্য একখানি ইজি-চেয়ার জোগাড় হইল, আমরা বারান্দায় একখানা নীচু তক্তপোষের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প চলিল নানা বিষয়ে। তিনি ছোটগল্পের ভিতর কোন্‌টি প্রথম লিখিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "কোন্‌টা জান? সেই যে নিরুপমার গল্প, যার বাবা তার খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল, শেষে টাকা দিতে পারলে না, বাড়ী-ঘর সব বিক্রী ক'রে টাকা জোগাড় করল, কিন্তু মেয়ে সে টাকা ফিরিয়ে দিলে।" কিছুদিন আগে "বশীকরণ" অভিনয় হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ

তাহা দেখেন নাই, কমলা দেবী তাহার অনেক বর্ণনা দিলেন।

এই সময় গানের ঘণ্টা পড়াতে, রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দিনুবাবুর বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমরাও খানিক পরে অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখি গানের নামগন্ধও নাই, অভিনয় সম্বন্ধে গল্প হইতেছে। আমরাও অন্ধকার বারান্দায় কিছু দূরে বসিয়া গল্পই করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রাজর্ষি রামমোহন সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন, যাহা আগে শুনি নাই। রামমোহন যখন অন্দরমহলে আসিতেন, তাহার আগে চাকররা তিনখানি চেয়ার লইয়া গিয়া ভিতরের ঘরে সাজাইয়া রাখিত। তিনি ভিতরে আসিয়া প্রথমে তাঁহার দুই পত্নীকে চেয়ারে বসাইয়া পরে নিজে বসিতেন। পরিবারের মহিলাদের গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাঁহার পত্নীকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। অন্য মেয়েরা রাজর্ষির পত্নীর নিকটেই মন্ত্র লইতেন। প্রথমা পত্নী রামমোহন রায়ের পূর্ব্বেই মারা যান, দ্বিতীয়া তাঁহার মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া ছিলেন অনেক দিন। রামমোহন যখন বিলাত যান তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব।" পুত্র

তাহাতে বলেন, "তাহলে আর আপনার যাওয়া হবে না।" এই কথা শুনিয়া তিনি পত্নীর সহিত দেখা না করিয়াই যাত্রা করেন, দেখা আর ইহজীবনে হয় নাই। এই কারণে তাঁহার পত্নী আমরণ জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

গল্প থামিয়া শেষের দিকে গানও কিছু হইল। তবে রাত বেশী হইয়া গিয়াছিল, গানের ক্লাস সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইল।

কবির বিদেশযাত্রার একটা কথা চলিয়াই আসিতেছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর আমাদের বাড়ী একবার তিনি বেড়াইতে আসিলেন। হাতে একটি ইংরেজী কবিতা, সেটি বাবার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া খবর দিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহার এবং এণ্ড্রুজ সাহেবের পাসপোর্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বলিলেন, "ভালই হ'ল, যাবই না ঠিক করেছিলুম, এরা একটা ছুতো দিয়ে মনটাকে খুসি ক'রে দিলে।"

প্রভাতবাবুর বিবাহ তখন আসন্ন, তিনি ক্রমাগত কলিকাতা ও শান্তিনিকেতন করিতেছেন, প্রায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দশা। মা তাঁহার হাতে আমাদের জন্য প্রায়ই কিছু-না-কিছু জিনিষ পাঠাইতেন। একবার এক বাক্স

সাবান পাঠাইয়াছিলেন। সাবান যে পাঠানো হইয়াছে তাহা চিঠিতে জানিয়াছিলাম। সকালবেলা সামনের বারান্দায় বাহির হইয়া দেখি রবীন্দ্রনাথ সেই সাবানের বাক্সটি হাতে করিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছেন, পিছন পিছন অতি ভালমানুষের মত আসিতেছেন প্রভাতবাবু। কাছে আসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কবি বলিলেন, "তোমার বাবার কাছে একটা দরবার করতে এসেছি, তা তিনি যখন বাড়ী নেই, তোমাকেই ব'লে যাই। এই জিনিষটা কলকাতার থেকে এসেছে তোমাদের জন্যে, কিন্তু যিনি এনেছেন তিনি বলছেন, 'my need is greater than thine,' নিজে বলতে লজ্জা পান, তাই আমি তাঁর হয়ে ব'লে দিলুম। মেয়েদের দয়ালু হৃদয়, যদিই দিতে রাজী হও। এখন ভেবে দেখ।" প্রভাতবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার সাবানের কোন দরকার নেই।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখেছ একবার জাঁক? আগে ত এ রকম তুমি ছিলে না, এখন বুঝি এই রকম কথা মাঝে মাঝে শোনা তোমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে?" ইহা লইয়া বেশ খানিকক্ষণ হাস্য-পরিহাস করিয়া ও সব কথা সুধাময়ীকে যেন লিখিয়া দিই আমাকে এই অনুরোধ করিয়া কবি চলিয়া গেলেন।

দিন-কয়েক পরে কলিকাতা হইতে প্রশান্তচন্দ্র ও কালিদাসবাবু শান্তিনিকেতনে বেড়াইতে আসিলেন। নূতন লেখা শুনিবার আবদার করিয়া তাঁহারা দুই জনে কোথায় যে উধাও হইয়া গেলেন, কবি আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পান না। সন্ধ্যাবেলা আমরা যথানিয়মে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি রবীন্দ্রনাথ নিজের manuscriptএর খাতাখানি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের দেখিয়া খবর দিলেন যে অতিথিদ্বয় নিরুদ্দেশ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বলিলেন, "লেখা যদি শুনতে চাও ত কাছাকাছি থেক।" আমরা খানিক বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, কারণ পাঠ যে হইবে তখনও তাহার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। বাড়ী আসার কিছু পরে প্রশান্তচন্দ্র আসিয়া খবর দিলেন যে এইবার পড়া হইবে। সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কবির ঘরের বাহিরে আসিতেই শুনিলাম তিনি আমাদের ডাকিবার জন্য কাহাকে যেন আদেশ করিতেছেন।

সেদিন সতী, বিদায় অভিশাপ, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ আর গান্ধারীর আবেদনের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শুনাইলেন। আমি মাটিতে বসিয়াছিলাম বলিয়া একটু বকুনি খাইলাম। বলিলেন, "তোমরা জায়গা

থাকতেও মাটিতে ব'সে লোককে কেন উদ্বিগ্ন ক'রে তোলো বল ত ?" অগত্যা উঠিয়া গিয়া তাঁহার কাছেই বসিলাম, কারণ আসন ঐ একটি শতরঞ্চি ভিন্ন সেখানে কিছু ছিল না। পড়া শেষ হইতে বেশ রাত হইয়া গেল।

শান্তিনিকেতনে শরৎ আসিয়া পড়িল। বর্ষা বড় সুন্দর লাগিয়াছিল, শরৎ অপরূপ লাগিল। কিন্তু তাহা শরৎ বা বর্ষার গুণ যতটা না, চোখেরই গুণ তাহার চেয়ে বেশী। সে চোখই ত আর নাই। ভূস্বর্গে গেলেও এখন আর সে সৌন্দর্য্য কোথাও দেখিব না। সেই কাশফুল এখনও শারদার আনন্দ-বিকশিত হাসির মত ফুটিয়া উঠে, শেফালী গাছের তলা মুক্তার আচ্ছাদনে যেন সাজাইয়া তোলে কিন্তু আমাদের চোখে সে দৃষ্টি ত আর ফিরিবে না? সকালে প্রায়ই ফুল কুড়াইতে যাইতাম মনে পড়ে, ফিরিবার পথে মধ্যে মধ্যে কবির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইয়া যাইত।

সন্ধ্যার আসর সমানেই চলিতেছিল। তবে এই সময়ে আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত বেশী রকম আরম্ভ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোজই পীড়িত ছেলেদের দেখিয়া বেড়াইতেন, চিকিৎসাও করিতেন। সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা

প্রতিষেধকও তৈয়ারি করিলেন, যথাকালে সেবন করিয়া অনেকে জ্বরের হাত এড়াইল। তবু আমরা সন্ধ্যা হইলেই তাঁহার ছাদে গিয়া বসিতাম, যদিই কিছু কথাবার্ত্তা বলেন। একদিন উপরে উঠিয়া দেখিলাম গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় তিনি কি একখানি বই পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া বইখানা কোলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "এই যে এস, দিনের আলোও নিবে এল।" সেদিন আর হাসপাতাল তদারকে বাহির হইলেন না, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করিলেন। অতিশয় ফিরিঙ্গী স্বভাবের বাঙালী মেয়েদের কথা উঠিল, কয়েক জনের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এরা যেন কি এক বেয়াড়া রকমের তৈরি হয়েছে। বিলেতে এক ধরণের প্রজাপতি-জাতীয় এবং loud mannered মেয়ে আছে বটে, কিন্তু সব ডিঙিয়ে এরা তাদের ধরণই বা পেল কোথা থেকে?" তাহাদের কণ্ঠস্বরের কিঞ্চিৎ নকল করিয়া শুনাইলেন। হঠাৎ ঠাট্টার সুর ছাড়িয়া আবার গম্ভীর হইয়া গেলেন। দেশের যত দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগের কথা এবং নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের জীবনের নিরন্তর টানাটানির কথা তুলিলেন, বলিলেন, "আমাদের দেশে সবাইকে সব হ'তে হবে।

আমি বাস্তবিক কবি হ'তেই জন্মেছিলুম, কিন্তু আমায় কি না করতে হ'ল! কিন্তু আর ত পারি নে।" সেদিন একটু ম্লান জ্যোৎস্নার উদয় হইয়াছিল, যদিও আমরা যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন মাঠে আঁধার নামিয়া আসিয়াছে।

তিনি এই সময় ছেলেদের ইংরেজী পড়াইতেন তাহা আগেই বলিয়াছি। উপরি উপরি তিনটি ক্লাস নিতেন, আমরা সমানে তিনটিতেই বসিয়া থাকিতাম। Fifth Group-এর ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিতেন। তিনি ক্লাসে আসিয়া বসিবামাত্র তাহারা আশ্রমের যত খবর ইংরেজীতে তাঁহাকে শুনাইত। বয়সের পক্ষে ইংরেজী নিতান্ত মন্দ বলিত না। শ্যামকিশোর নামক একটি ছোট ছেলে সব-চেয়ে ভাল সংবাদদাতা ছিল বলিয়া মনে পড়ে। Third Groupকে তখন রবীন্দ্রনাথ Shelleyর কবিতা পড়াইতেছিলেন। প্রথম চার দিনে Hymn to Intellectual Beauty শেষ করিলেন। এই সময় সঙ্গে সঙ্গে শারদোৎসবের রিহার্সাল আরম্ভ হইল। সেখানেও রীতিমত হাজিরা দিতে আরম্ভ করিলাম। এত-সবের ভিতর সংসারের কাজকর্ম্ম যে কি করিয়া চালাইতাম তাহাই এখন ভাবিয়া পাই না। কিন্তু অল্প বয়সের উৎসাহ

এবং আগ্রহ কোনো বাধাকেই বাধা বলিয়া মানে না, তাহাও ভাবি।

তাঁহার ক্লাসে ছেলেরা এক-একদিন বকুনিও খাইত দেখিতাম। অন্ত মাষ্টারে বকেন যদি ছাত্র পড়া না করে বা ভুল উত্তর দেয়, রবীন্দ্রনাথ বকিতেন নীরব হইয়া থাকিলে, ভুল হউক, ঠিক হউক ছাত্র বলিতে চেষ্টা করিবে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। দুই-এক জন ছেলে তবু চুপ করিয়া যাইত, তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের দিয়া বলাইয়া ছাড়িতেন, ভাল কথায় না কাজ হইলে বিরক্ত হইয়া কড়া সুর ধরিতেন। ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটা কি প্রকার লাগিত তাহা জানি না, আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতাম।

আমাদের ছাদের সান্ধ্য মজলিশে মাঝে মাঝে ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া স্নেহের তিরস্কার লাভ করিতে হইত। একটা কারণ ছিল, আসন থাকিতেও মাটিতে বসা, আর-একটা কারণ ছিল তাঁহার পিছনে গিয়া বসা। একদিন উপরে উঠিয়া দেখিলাম, বাবা এবং আর-একজন কে ভদ্রলোক বসিয়া কবির সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কথাবার্ত্তার ভিতর বাধা না জন্মাইবার ইচ্ছায় পিছনে একটু দূরে বসিলাম। কিন্তু আমাদের

আগমন তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এই দেখ, বসলেই যদি ত পিছনে বসলে কেন? এমন জায়গায় ব'স যাতে মুখ দেখা যায়।" অগত্যা সরিয়া আসিয়া পাশের দিকে বসিলাম। Shelley পড়ানো বুঝিতে পারিতেছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এমন সময় প্রতিমা দেবী উপরে আসিয়া আমরা প্রথমে যে জায়গাটায় বসিয়াছিলাম, সেইখানেই গিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, এটার psychology কি বলতে পার? বৌমা ত তোমাদের আসতে দেখেনও নি, তবে এ রকম হ'ল কি করে?"

ইহার পর Co-operative Society সম্বন্ধে ছেলেদের সব বুঝাইয়া বলা হইবে বলিয়া ছাদেই একটি ছোটখাট সভা হইল। ছেলের দল আসিল, আমরা অবশ্য নড়িলাম না। রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের জিনিষটা কি তাহা বুঝাইলেন। বড়রা নিবিষ্ট মনে শুনিল, ছোটর দল ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল সভা ভঙ্গ হইতে।

তাঁহার Shelleyর ক্লাস নিয়মিতই চলিতেছিল। প্রকাণ্ড গাছের তলায় একটি গোল ছত্রাকার মণ্ডপ,

ভিতরে অশ্ব-খুরের আকৃতির একটি মাটির বেদী, ছেলেরা নীচে আসন পাতিয়া বসিয়া বেদীটিকে ডেস্ক্‌রূপে ব্যবহার করিত। এধারে-ওধারে বেতের চৌকি ও মার্ব্বেল পাথরের চৌকি গোটাকয়েক সাজানো থাকিত, সেখানে আমাদের মত রবাহূত শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা গিয়া বসিত। চারিদিকে তখন সবুজের বন্যা, মাথার উপর পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, হাওয়ায় বই-খাতাও উড়িয়া পলাইতে চায়। বসিয়া ভাবিতাম, Ode to West Wind পড়িবার ঠিক স্থান ও কাল বটে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ কর্ম্মী পুরুষ, নিজে বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা ত জানিতেন না, অন্ততঃ তখনকার দিনে; কাছে যাহারা থাকিত, তাহারাও যে অলসের মত বসিয়া থাকিবে ইহা তিনি দেখিতে পারিতেন না, ধরিয়া যাহা হউক একটা কিছু কাজে লাগাইয়া দিতেন। ভাল করিয়া পারুক বা না-ই পারুক, কাজ করিতে সকলে চেষ্টা করিবে ইহাই তিনি চাহিতেন। এই সময়ে তিনি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্ত একটি তর্জ্জমার বই তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজী মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি

সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা। আমার এই কাজটি বড়ই মনের মত হইয়াছিল। তাঁহার দেওয়া কাজ করিতেছি, ইহাই ছিল প্রধান আনন্দের কারণ, তাহার উপর এইগুলি দেখানো, সংশোধন করা প্রভৃতি নানা কাজে তিনি অনেকবার করিয়া দিনের মধ্যে ডাকিয়া পাঠাইতেন, ইহাও কম আনন্দের খোরাক জুটাইত না।

বুধবারে শান্তিনিকেতনে ছুটি। সকালে মন্দিরে যাওয়ার পর যথা-ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কাজকর্ম্মে সেদিন ঢিলা পড়িয়া যাইত। এ সময়ে জ্বরের উৎপাতে আমাদের সঙ্গিনীরা অনেকেই বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না। এক বুধবারে কমলা দেবীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। যখন ফিরিয়া আসিতেছি তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, বলিলেন, "আজ আমার ছাদে শিশু-সাহিত্য-সভা হবে। থেকো কিন্তু।"

শিশুদের সাহিত্য-সভা তখনকার দিনেও বড়দের সাহিত্য-সভার চেয়ে উপভোগ্য হইত বেশী। শিশু সাহিত্যিকদের সম্পাদক তখন ছিলেন শ্রীমান্ মৌলি শাস্ত্রী, খুব যোগ্য সম্পাদকই ছিলেন। কবি ও সঙ্গীতকার ছিলেন শ্রীমান্ সমরেশ সিংহ। তাঁহার শিশুকণ্ঠের আশ্চর্য্য সুন্দর গান এখনও কানে বাজে। সেদিনকার

গান, গল্প ও কবিতা-পাঠ সবই খুব ভাল লাগিয়াছিল, শুধু "কাবুলী বেড়াল" অভিনয়টা তেমন ভাল লাগে নাই।

বৃহস্পতিবারে তাঁহার ছাদে বসিয়া আমরা অনেকগুলি মেয়ে গল্প করিতেছি, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে তিনি এই সন্ধ্যারই সময় আমাদের কয়জনকে আলাদা করিয়া Shelley পড়াইবেন। আমরা ত হাতে স্বর্গ পাইলাম, অবশ্য সারাদিনের পরিশ্রমের পর আবার আমাদের পড়াইতে বসিলে তাঁহাকে বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে বলিয়া মৌখিক একটু আপত্তিও করিলাম। তিনি সে-সব কথা কানেই তুলিলেন না। শ্রান্তি বলিয়া কোনো জিনিষকে তখনকার দিনে গণনার মধ্যেই আনিতেন না। সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল, উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,"মানুষ কেবল বর্ত্তমানের অতি তুচ্ছ জিনিষগুলো প্রকাণ্ড ক'রে তুলে তাই নিয়ে দিনরাত্রি অস্থির হয়ে থাকে, কিন্তু সে-সবের দিকে ফিরেও তাকায় না যা কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে নিজেদের অপরূপ সৌন্দর্য্য আর মহিমা নিয়ে বারে বারে ফিরে ফিরে আমাদের এই পৃথিবীতে নেমে আসছে, এই শরতের শ্যামল শ্রী, এই নিবিড় নীল আকাশ, এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্নার

প্লাবন। পৃথিবীর জন্মের পর থেকে এরা তার বুকে কেবলই আসছে যাচ্ছে, কিন্তু এদের দিকে আমরা ফিরে চাই না, আমাদের মন প'ড়ে আছে কেবল সব ক্ষণিক তুচ্ছতা নিয়ে।"

হঠাৎ কি কারণে জানি না, পুনর্জ্জন্মের কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ, তোমরা সব ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে, কি ভাববে জানি না, আমি কিন্তু পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করি। কেন করি তাও বলছি। পৃথিবীর সব জিনিষেই দেখি একটা cycle পরিভ্রমণ করছে, গাছ যে ছিল সে আবার গাছ হয়েই জন্ম নিচ্ছে, পরেও নেবে। শুধু আমরাই কোথার থেকে এলাম তার ঠিক নেই, আর কি হয়ে যাব তারও ঠিক নেই, এ হতেই পারে না। আমরা ক্রমাগতই মানুষ হয়ে জ'ন্মে আমাদের একটা cycle শেষ করব, তারপর হয়ত অন্য কোনো cycle-এ উঠতে পারি।"

ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে হইলেও আমি নিজেও কোনো দিন ভাবিতে পারি নাই যে এই জীবনেই আমার ধরিত্রীর সহিত সকল বন্ধন একেবারে শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহার মত মানুষের মুখে এই কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। এই বিষয়েই কথা চলিতে লাগিল। কবি আবার বলিলেন, "জান, আমার মনে হয়, শুধু আবার

আমরা যে মানুষ হয়ে জন্মাই তাই নয়, আমাদের আগের জন্মের যে বন্ধন তা আবার ফিরে আসে, তা না হ'লে আমাদের এক-একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ এমন এক-একটি সম্বন্ধে দাঁড়িয়ে যায় কেন ?"

এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া প্রাণে এখন আশ্চর্য্য এক সান্ত্বনার অনুভূতি আসে। সত্যই ত যাহা মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক তাহা পাঞ্চভৌতিক একটা দেহের বিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট কেমন করিয়া হইবে ? তাহা ত রহিলই আত্মার মধ্যে চিরন্তন হইয়া। তবে কেন এত শোক, এত বিচ্ছেদ-দুঃখ ? তিনিই কি আর তাঁহার এত প্রিয় ধরণীতে আর ফিরিয়া আসিবেন না ? আমরাও ত আবার ফিরিতে পারি। এ জীবনে তাঁহার স্নেহ পাইয়াছিলাম, সান্নিধ্য পাইয়াছিলাম যে সুকৃতির বলে, তাহাই হয়ত আর-একবার আমাদের তাঁহার নিকটে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। অনেক রাত পর্য্যন্ত তাঁহার ছাদেই সকলে বসিয়াছিলাম। উঠিবার উপক্রম করিতেছি, তখন একবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীটা মোটের উপর মন্দ জায়গা নয়, কি বল ?"

পরদিন বিকালে আবার কমলা দেবীর খোঁজ লইতে চলিয়াছি, দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখন বারান্দায় টেবিল

বাহির করিয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, "আজ পড়বে?" আমি ত তৎক্ষণাৎ রাজী, বই আনিতে ও সঙ্গিনীদের খবর দিতে চলিলাম। কবি অবশ্য আমাকে খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কি আর বেড়াইয়া সময় নষ্ট করা চলে? তাঁহার চা খাওয়া শেষ হইতেই কয়েকজন তাঁহার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা দুই বোন এবং প্রতিমা দেবী এই ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম, দুই-একজন আরও এক-একদিন আসিতেন আবার সব দিন আসিতেনও না। প্রথম দিন "Lift not the painted veil" এই sonnet-টি পড়াইলেন। পড়ানো ও বুঝানোর পরেও অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরের দিনই বোধ হয় কলিকাতা হইতে আসিলেন। সেদিন আর আমাদের পড়াইবার সময় পাইবেন না মনে করিয়া আমরা কমলা দেবীর ছাদে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলাম। তবু একবার দেখিয়া আসি পড়াইতে পারিবেন কি না, এই মনে করিয়া খানিক বাদে দেহলীর ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি বই হাতে করিয়া ঠিক অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তখন বড়ই অনুতাপ হইল।

যাহা হউক, ছাত্রীরা আসিয়া জুটিলাম, যেটুকু সময় ছিল তাহাতেই আর একটি sonnet পড়া হইল। তাঁহার অন্য কাজ থাকিতে পারে মনে করিয়া পড়ানো শেষ হইতেই তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিয়া আসিলাম।

রবিবার দিন পড়া আরম্ভ করিতেই অন্ধকার হইয়া গেল। প্রতিমা দেবী নীচে গেলেন একটা আলো আনিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ গর্ব্ব করিতেন যে বয়সের তুলনায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ভালই আছে, এখন তিনি ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি বলাতে বলিলেন, "শুধু পারছি বললেই হবে না ত, প্রমাণ কর যে পড়তে পারছ।" তাঁহার কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আর আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। আলো আসিবার পর আবার পড়া আরম্ভ হইল। এই সময় সন্তোষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের ক্লাস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রোজ হয় কি না, এবং কখন হয়। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "যখন আমার three Graces আসেন।"

ক্লাস সেদিন আর অগ্রসর হইল না। খানিকক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে কথা বলিয়া নামিয়া গেলাম। আমাদের নূতন নাম-করণ লইয়া প্রচুর হাসাহাসি হইল। ইহার পর দুই-চার দিন নানা বাধা পড়িয়া Shelleyর ক্লাস আর হইল না।

তাহার পর আবার Adonais বইখানি আরম্ভ করিলেন, ছাত্র-ছাত্রী আরও কয়েকটি জুটিয়া গেল। তর্জ্জমার কাজ অবশ্য সমানে চলিতেছিল। রোজ দুপুরে গিয়া তাঁহাকে লেখাগুলি দেখাইয়া আসিতাম, নূতন কাজ লইয়াও আসিতাম। তিনি নিজেও অনেক সময় বাড়ীতে আসিয়া কাজ দিয়া যাইতেন। খাতা পাইবামাত্র সেইখানে বসিয়াই সংশোধন করিয়া দিতেন। এই অতি তুচ্ছ কাজটাও এমন সুন্দর করিয়া করিতেন যে তাহাই একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। নূতন কাজ চাহিলেই বলিতেন, "আর সহ্য করতে পারবে? মনে দুঃখ হবে না ত?" কাজ করিতে না পাইলেই মনে দুঃখ হইবে, ইহাই তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা করিত। প্রথমে খুব ভয়ে ভয়ে এই লেখার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, কারণ ঐ কাজই আরও কয়েকজনকে দিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। আমার লেখাও পাছে ভাল না হয়, তিনি বিরক্ত হন, এই ভয়টা ছিল। কিন্তু তিনি এতই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন যে ভয় ত কাটিয়াই গেল, দুই-একবার সন্দেহ হইল যে আমাকে স্নেহ করেন বলিয়াই বাড়াইয়া বলিতেছেন কিনা। একদিন বলিলেন, "সীতাই একমাত্র আমাকে একটু দয়ামায়া করে।" আমাকে আর-একদিন বলিলেন, "অন্তদের হাত

থেকে আমাকে একটু বাঁচাও দেখি, আমি আর কাউকে দেব না।" অন্যরা যে আমার উপর বেশী খুসি হইবেন না সে ভয়টা যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে বয়সে সকলের চেয়েই অনেক ছোট ছিলাম বলিয়াই কাহারও বিশেষ বিরাগভাজন হই নাই। একদিন লেখা দেখানো শেষ হইতে হইতেই সূর্য্য ডুবিয়া গেল, তিনি যথানিয়মে ছাদে গিয়া তাঁহার ইজি-চেয়ারটিতে বসিলেন। অন্য কয়জনও আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় তাঁহার "নিশীথে" গল্পটির প্রসঙ্গ উঠিল। "কঙ্কাল" গল্পটা কেমন করিয়া লিখিলেন তাহাই বলিতে লাগিলেন, "ছেলেবেলা আমরা যে-ঘরে শুতুম, তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলনো ছিল। আমাদের কিন্তু কিছু ভয়টয় করত না। তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়েটিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়ীতে শুই। এক দিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেক দিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধহয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছিল, আমার মনে হ'তে লাগল কে যেন মশারীর

চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল? ক্রমে মনে হ'তে লাগল সে দেয়াল হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর কি।"

"জীবিত ও মৃত" লেখার কাহিনীও শুনিলাম। তিনি বলিলেন, "ছোটবৌ তখনও বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেক রকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ, এ ঘরে ন' বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সে ঘরে অন্য কোনো বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সব একেবারে নীরব, নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিস ঘরে না কোথায় ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই ত, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়ীময় এমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হ'ল আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ী haun: ক'রে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়,

আমির রূপ ধ'রে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে গিয়ে, মশারিটা তুলে খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি, 'তুমি জান আমি কে?' তা হ'লে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করি নি, করলে খুব একটা scene হ'ত নিশ্চয়। হয়ত রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, 'তাই ত, এ সত্যিই আর কিছু নয় ত?' কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্য সত্যই নিজেকে মৃত ব'লে মনে করছে।" এই বোধ হয় প্রথম তাঁহার মুখে তাঁহার পত্নীর উল্লেখ শুনিলাম।

২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইল এখানে। আগের দিন দুপুর বেলা বসিয়া লিখিতেছি, বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন, এমন সময় মনে হইল বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথই বটে, বাবাকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া ইসারায় বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমার বাবাকে কালকের সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিলুম, তা তুমিই একটু ব'লে রেখ। আমি বিকেলে আবার ভাল ক'রে ধরব এখন। তোমরা কিছু বলবে?"

আমি ত প্রস্তাব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। তাঁহার সামনে বক্তৃতা করা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সেটা বুঝিতেনও বোধ হয়, তবু বলিলেন, "সংযুক্তা দেবী কিছু বোলো, কেমন ?" সংযুক্তা বা বিযুক্তা কোনো ভাবেই এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইল না। একখানা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "আর এই নাও তোমার কাজ।" কোন্ কোন্ জায়গা অনুবাদ করিতে হইবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তাহা দেখাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় মন্দিরেই স্মৃতিসভা হইল। ছেলেরা শিউলী ফুলের মালা দিয়া মন্দির খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল। বক্তৃতা করিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাবা। একটু রাত হইয়া যাওয়াতে কয়েকটি ছোট ছেলে মন্দিরের ভিতরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। তবে ছুটির আগের উৎসবটা এবার তেমন জমিল না, আশ্রমে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার উৎপাতে। "শারদোৎসব" অভিনয় করার কথা ছিল কিন্তু দিনুবাবুর জ্বর হওয়ায় তাহা পণ্ড হইল, তাহার পরিবর্ত্তে ছোট একটি সংস্কৃত নাটক এবং শারদোৎসবের ইংরেজী অনুবাদটি অভিনীত হইল। কলিকাতা হইতে অতিথি অতিশয় অল্প কয়েকজন আসিলেন।

আমরা পূজার ছুটিতে কলিকাতা চলিয়া আসিব কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ শুনিলাম মান্দ্রাজ অঞ্চলে ভ্রমণে যাইবেন। শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া আসিবার আগে এক দিন তাঁহার কাছে গেলাম অনুবাদের খাতাগুলি দিয়া আসিবার জন্য। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বোসো, এই চিঠিখানা সেরে নিই।" কে এক মুসলমান যুবক একটি মাসিক পত্র বাহির করিবে, তাই তাঁহাকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছে লেখার জন্য। সেই চিঠিরই উত্তর দিতে বসিয়াছেন, বলিলেন, "ভাবছি যে লিখে দিই যে আমি ত লিখতে পারব না, তবে আমার এখানে একটি বঙ্গমহিলা আছেন, তিনি বেশ লিখতে পারেন, তাঁকে ধরুন।" সত্যই এই উত্তর পাইলে লোকটি কি রকম খুসি হইত কল্পনা করিয়া হাসি পাইল।

সেই দিনই কি তার পরের দিন আশ্রমের অনেকেই সুরুলে পিক্‌নিক্ করিতে প্রস্থান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ গেলেন না। আমরাও যাই নাই। বিকালে সেদিন দেখা হইবামাত্র বলিলেন, "সীতা, আজ ত যে যার বেরিয়ে পড়েছে, আমরাই বা কেন চুপচাপ থাকি, আমরাও কেন কাব্যালোচনা করি না?" আপত্তি আমাদের কাহারও ছিল না, তবে তাঁহার চা খাওয়া হয় নাই বলিয়া আমরা

খানিক ঘুরিয়া আসিতে গেলাম। ঘোরাঘুরি করিয়া ও দুই-চার জায়গায় আট্‌কা পড়িয়া বেশ সন্ধ্যা হইয়া গেল। দেহলীর ছাদে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন কবি একটু বিরক্তির সুরেই বলিলেন, "এত দেরি করলে কেন?" যাহা হউক, Shelley পড়াইতে বসিলেন। সেদিন Skylark কবিতাটি পড়া হইল। Adonais মাঝে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সেটি পড়ানো হইল না, খানিকটা পড়াইয়াই ছাড়িয়া দিলেন।

এই সময় তাঁহার "পলাতকা" বইখানি বাহির হয়। দুপুরবেলা তাঁহার বাড়ীর এক বালক ভৃত্য আসিয়া বই একখানি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে নাম লিখিয়া দিয়াছেন "শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু।" মা এই সময় আসিয়া বলিলেন, "রবিবাবুর চোখে কি হয়েছে, আমি সন্তোষদের বাড়ী শুনে এলাম।" বিকালে দেখিতে গেলাম। সত্যই একটা চোখ রক্তের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তলা ও চারি পাশ ফোলা। ওষুধমাখা হাত হঠাৎ চোখে দিয়া ফেলাতেই এ রকম হইয়াছে শুনিলাম। বসিয়া বসিয়া মেয়েস্কুল করার কথা, মাষ্টারদের জন্য বাড়ী করার কথা প্রভৃতি অনেক গল্প করিলেন। ঐ সময় একটি ঔপন্যাসিক যশঃপ্রার্থিনী মহিলা শান্তিনিকেতনে গিয়া

জুটিয়াছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় তিনি দিন-কতক বেশ আত্মপীড়া ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা ওঠায় বলিলেন, "ওকে নিয়ে সুবিধে হবে ব'লে বোধ হচ্ছে না, —টা বোকা, তার ঘাড়ে এসে চেপেছে।" আমি হাসিতেছি দেখিয়া বলিলেন, "এইবার বলব সীতার সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা কর।" আমি বলিলাম, "আপনি বললেও সে আসবে না, আমার সঙ্গে তার কিছু ভাব নেই!" তিনি বলিলেন, "নেই নাকি? তাই বুঝি তোমায় নিজের লেখা দেখাতে চাইলে না, আমি বলেছিলুম তোমায় দেখাতে। ও লেখে ব'লে বুঝি ওর উপর তোমার হিংসে আছে? তবে ত ওর লেখা প'ড়ে দেখতে হচ্ছে, কেমন লেখে।" আমি বলিলাম, "তাই দেখবেন, তা হ'লে সে অন্ততঃ ঐ কারণে আমাকে ধন্যবাদ দেবে।"

অনুবাদের বইখানি ছাপানোর কথায় বলিলেন, "এতে তোমার লেখাই ত বেশীর ভাগ থাকবে, আমার স্কুলকে তার copyright দান করছ ত?" দান যে করিব তাহা ত ধরাই ছিল। ছোটদের জন্য বর্ণপরিচয়ের একটা গল্প লিখিবেন বলিলেন। গল্পটা খানিক বলিয়াও গেলেন মুখে মুখে। কেন যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত লিখিলেন না জানি না। আমায় একবার বলিলেন, "এই idea-টা নিয়ে লেখ।

কিন্তু তাঁহার idea লইয়া লেখার সাধ্য আমার ছিল না। বলিলেন, "তোমায় যত সংক্ষেপে বলছি এমন করলে চলবে না, আরও ঢের কিছু জুড়তে হবে।" বইয়ের জন্য আঁকা ছবিও দেখাইলেন কয়েকটা। আবার বলিলেন, "মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমি মোটেই চিন্তাশীল লোক নই, লিখতে আরম্ভ না করলে আমার মাথায় কিছুই আসে না।" নিজের এরূপ আশ্চর্য্য চিত্র দেওয়ায় আমি হাসিতেছি দেখিয়া বলিলেন, "আমার যতই পরিচয় পাবে, ততই দেখবে যে আমাকে যা ভেবেছিলে, সে রকম মোটেই নয়।"

সেইদিনই রাত্রে সংস্কৃত অভিনয় হইল। অভিনয় দেখিতে চলিয়াছি, দেখিলাম, দেহলীর নীচের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া প্রভাতবাবু। আমাকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ডাকিয়া বলিলেন, "সীতা, তোমার বন্ধুকে লিখে দিও যে প্রভাতকে আমি বিশেষ রকম যত্ন করছি।" চোখের খোঁজ লইয়া জানিলাম কিছু ভাল আছেন। কমলা দেবী জানিতেনই না যে তাঁহার চোখে কিছু হইয়াছে। কি হইয়াছে জানিতে চাওয়ায় তিনি কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "যাও যাও, তোমার আর খোঁজ নিতে হবে না, এতক্ষণে এলেন কি হয়েছে জানতে।"

অভিনয় মন্দ হয় নাই। সংস্কৃত অভিনয়টির পর শ্রীমান্ মুলু ও কয়েকটি ছেলে একটি মূক অভিনয় করিল। গল্পটিতে এক গুরুর অনন্ত দুর্গতি দেখানো হইল। শুনিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথ বাবাকে বলিতেছেন, "মশায়, আপনারা ব্রাহ্ম সমাজ থেকে এসে এ কি আরম্ভ করেছেন বলুন ত? গুরু মানেন না ব'লে কি এমনিই করতে হয়? ভাই-বোনে মিলে কেবল গুরুর পিছনেই লেগে আছে। আমি কিন্তু protest করছি।" অভিনয়ান্তে আমাকে সামনে পাইয়া ঐ কথাই আর-একবার শুনাইয়া দিলেন।

পরদিন সকালে একখানি ইংরেজী বই আনিয়া আমাকে অনুবাদ করিবার জন্য দিয়া গেলেন। যে জায়গাগুলি দাগ দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ভেবো না যে এগুলো আমি তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে আনি, তুমি এগুলো পেলে এত খুসি হও ব'লেই আমি কখনও খালি হাতে আসি না।" কাজটা কলিকাতা যাইবার আগে শেষ করিয়া দিয়া যাই ইহাই দেখিলাম তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং তিনি চলিয়া যাইবামাত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম, এবং একটানা ঘণ্টা-দুই লিখিয়া শেষ করিলাম। খাতা তাঁহাকে তখনই তখনই দেখাইয়াও আনিলাম।

রাত্রিকালে ইংরেজী শারদোৎসব অভিনয় হইল। অভিনয়ান্তে ছেলেরা "আমাদের শান্তিনিকেতন" গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চারিদিকে সকলেই তখন পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই সময় মনটা বড়ই অবসন্ন বোধ হইত। চলিয়া ত যাইব, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবার সৌভাগ্য হইবে কি?

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। প্রণাম করিবামাত্র বলিলেন, "এইবার বিদায়ের পালা। বেশ ছিলে, কেন যে যাও। ছুটির পরে আসবে ত? মুলু hostage রইল। আচ্ছা, তোমাদের এত খাটিয়ে নিলুম ব'লে কিছু মনে ক'রো না।" নীরবেই চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মাদ্রাজ যাওয়ার খবর পাইলাম। সেখানে ভ্রমণের বিবরণ, ফিরিয়া আসার কথা, কিছু বা লোকমুখে, কিছু বা সংবাদপত্রের মারফত পাইতাম। অনুবাদের কাজ কিছু কলিকাতায় বসিয়াও করিয়াছিলাম। খাতাগুলি কবির কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তিনি মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে। একটি ছাত্র কয়েক দিন পরে কলিকাতায় আসিয়া খবর দিল, "গুরুদেব দুপুরে ব'সে ব'সে আপনাদের খাতা দেখেন।

১৮ই কি ১৯শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। দুপুরবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াইয়াও গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাবাকে একবার বিলাত যাইতে রাজী করা। পারিবারিক কারণে বাবার তখন যাওয়া সম্ভব ছিল না। কবি রসিকতা করিয়া একবার আমার মতামত গ্রহণ করিলেন। সেদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বেশীক্ষণ তাঁহার কাছে বসিবার অবসর হইল না। দুই-এক দিন পরেই শুনিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে একখানি চিঠিও পাইলাম। সেই অনুবাদের বই সম্পর্কেই এই সময় সাহস করিয়া তাঁহাকে কয়েকখানি চিঠি নিজে লিখিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট হইতেও উত্তর পাইয়াছিলাম।

আবার তাঁহার বিলাত যাত্রার কথা উঠিল, নানা মুখেই খবর পাইতে লাগিলাম। মধ্যে মীরা দেবীর অসুখ হওয়ায় কবি কলিকাতায় আসিলেন, তবে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধহয় কয়েক দিনের মধ্যেও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। নেপালবাবু আসিয়া একদিন খবর দিলেন যে সম্ভবতঃ শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাইবেন। আবার দিন-দুই পরে এণ্ড্রুজ সাহেব আসিয়া খবর দিলেন যে কবি

এখন যাইবেন না, এপ্রিল মাসে যাইবেন। ক্রমাগত মত পরিবর্ত্তন করা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পিতামহ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে "the babu changes his mind so often" কথাটি তিনি নিজের সম্বন্ধেও প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন। কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে প্রায়ই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁহার মত বদ্‌লাইয়া যাইত।

সাহেবের কাছে আরও শুনিলাম আমাদের শান্তিনিকেতনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলাম। যাত্রাটা শুভ লগ্নে হয় নাই, ট্রেনে যথেষ্টই দুর্গতি ভোগ করিতে হইল, বাড়ী পৌঁছিয়াও দেখিলাম দুর্যোগ তখনও বাকি আছে কিছু। সমস্তটা দিনই অসুস্থ শরীরে শয্যাগ্রহণ করিয়া থাকিতে হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেহলীর সম্মুখের পথটিতে তিনি এক আত্মীয় যুবকের সহিত বেড়াইতেছিলেন। গিয়া প্রণাম করিতে কুশল-প্রশ্ন করিয়াই অনুযোগ করিলেন, "তোমরা একবার গেলে আর আসতে চাও না কেন?"

দুপুরবেলা আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সীতা, আর তর্জ্জমা করবে?" আমি ত তৎক্ষণাৎ রাজী। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বটে, এখনও সখ মেটে নি, আচ্ছা রাখছি আবার জোগাড় ক'রে।"

৭ই পৌষের উৎসবের আয়োজনে সকলে এই সময় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কবিকেও আর তত পাওয়া যাইত না, তবে মধ্যে মধ্যে আবার আগের মত কাছে গিয়া বসিতে পাইতাম। দুই-এক দিন কোন কাজে বাবার কাছে আসিয়াছিলেন, যাওয়া-আসার পথেও মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। অধ্যাপকদের কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদিন অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। প্রভাতবাবুর বিবাহ তখনও হয় নাই। গান শুনিয়া বিবাহ করিলে কত রকম বিপদ্ ঘটিতে পারে সেই বিষয়ে নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কবি প্রস্থান করিলেন। আমাদের সান্ধ্য ক্লাসটি আবার করিবার প্রস্তাব তুলিলাম, তিনি রাজীও হইলেন, তবে ঘটনাচক্রে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। আর-এক দিন চায়ের টেবিলে বসিয়া অনেক গল্প করিলেন। গল্প করিতে বসিলে তিনি এত রকম রসিকতা করিতেন যে সারাক্ষণই হাসিতে হইত। আমাদের হাসিতে দেখিয়া

বলিলেন, "বয়স হয়েও প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্য এল না, কেবল যা তা বকি, অল্পবয়সীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি, লোকে আমাকে কি যে ভাবে তার ঠিক নেই।"

নূতন গান মাঝে মাঝে শুনিতে যাইতাম। উৎসব উপলক্ষ্যে গান শিখানো হইতেছিল। এবারে আবার অতিথিরাও আসিতে আরম্ভ করিলেন অনেক আগে হইতে। সকলে তাঁহাদের লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়েরা ৯ই পৌষ একটা আনন্দবাজার করিবেন স্থির হইল। সকলে মহোৎসাহে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময় আশ্রমে একটি Danish ভদ্রমহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নাম শুনিলাম Miss Faering। ইঁহাকে আশ্রমে কাজ করিবার জন্য এণ্ড্রুজ সাহেব মান্দ্রাজ হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশিনী সম্বন্ধে সেকালে মনে একটা আতঙ্ক ছিল, কিন্তু পরে আলাপ করিয়া দেখিলাম মেয়েটির মধ্যে ভয় করিবার কিছু নাই। সেই রাত্রেই প্রতিমা দেবীর ঘরে বসিয়া আনন্দবাজারে কিসের কিসের দোকান হইবে তাহারই গল্প করিতেছি বেশ উচ্চকণ্ঠে, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করিলাম, যদিও কলরব খানিকটা তিনি শুনিতেই পাইলেন এবং সে' সম্বন্ধে মন্তব্যও

করিলেন। গানের ক্লাস তখন আরম্ভ হইয়াছে, সেই জন্যই তিনি নীচে নামিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন গিয়া গান শুনিতে বসিলাম। গান অনেক রাত পর্য্যন্ত হইল, তাহার পর বিদেশিনী মেয়েটিকে কোথায় কি ভাবে রাখা যায় সে বিষয়েও একটু আলোচনা হইল।

৬ই পৌষ সকালে কয়েকটি অভ্যাগতা মহিলার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে অধ্যাপকদের কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় একদিক্ হইতে Miss Faering কয়েকটি বালকবালিকার সঙ্গে এবং আর-এক দিক্ দিয়া স্বয়ং কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ডেনীশ্ মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছ? শীগ্‌গির ভাবসাব ক'রে নাও।" বলিয়াই চলিয়া গেলেন। আদেশ যখন করিয়াছেন তখন ভাব করিতেই হইবে, নিজেই নিজের পরিচয় দিয়া আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ গল্পসল্প করিয়া মেমসাহেবকে তাঁহার বাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।

৭ই পৌষ ভোরে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। প্রতিমা দেবী সেদিন সমস্ত দিনব্যাপী নিমন্ত্রণ করিয়া

রাখিয়াছিলেন, কাজেই সংসারের ভাবনা কিছু ছিল না। প্রচণ্ড শীত তখন, মন্দিরের পাথরের মেঝের উপর বসিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন জমিয়া গেলাম। উপাসনার আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ একলা একটি গান গাহিলেন, পরে ছেলেরা সমবেতভাবে দুই-তিনটি গান করিল। আচার্য্যের কাজ কবিই করিলেন।

উপাসনা শেষ হইবার পর মেলা দেখিতে বাহির হইলাম। তখনও মেলা ভাল করিয়া বসে নাই, সবে জিনিষপত্র আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুকেশী দেবী আমাদের আনন্দবাজার বসাইবার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া দেখিলাম কলিকাতার এক দরজী একরাশ ব্লাউস আর ফ্রক লইয়া আসিয়াছে। বসিয়া খানিকক্ষণ তাই বাছা গেল। বাড়ী ফিরিয়া আর-এক বার মেলা দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া স্নানাদি সারিয়া প্রতিমা দেবীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "Miss Faering শুনতে চেয়েছিল যে আমি সকালে কি বলেছি, আমি তাকে তোমার কাছে refer ক'রে দিয়েছি, অতএব প্রস্তুত থেক।" এ হেন কাজ আমার দ্বারা হইবার

কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কথাটা শুনিয়াই ভয় পাইয়া গেলাম। সম্ভবতঃ কথাটা আমাকে ভয় পাওয়াইবার জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, কারণ সারাদিনের ভিতর মেমসাহেবের সঙ্গে আমার দেখাই হইল না। অবশ্য তাঁহাকে এড়াইয়া ফিরিবার চেষ্টা যে করি নাই, তাহাও বলিতে পারি না। দুপুরবেলা মেলায় এক যাত্রা হইতেছিল, সেইখানে গিয়া বসিয়া রহিলাম। পালাটি "কংসবধ"। পাড়াগাঁয়ের যাত্রা যেমন হয় তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন অংশেই ভাল নয়। তবে হাসির খোরাক জুটিয়াছিল অনেক।

বিকালবেলা আশ্রমের মূর্ত্তিই বদ্‌লাইয়া গেল। এ যেন আর এক রাজ্য, চারিদিকে ভীড়, মশালের আলো, লোকজনের চীৎকার। একলা মন্দিরে যাইতেও সাহস হইল না, অনেকের সঙ্গে দল বাঁধিয়া গেলাম। গোলমালে উপাসনায় মন দেওয়াই দেখিলাম কঠিন। গান এ বেলা অতি সুন্দর হইয়াছিল। আচার্য্যদেবকে দেখাইতেছিল যেন একটি দীপ্ত অগ্নিশিখা।

উপাসনান্তে বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় বাজী পোড়ানো দেখিতে বাহির হইলাম। একবার দলচ্যুত হইয়া ভীড়ের মধ্যে হারাইয়াও গেলাম। যাহা হউক,

অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম এবং বাজী পোড়ানো শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সারা দিনের ভিতর রবীন্দ্রনাথের নিকটে যাওয়ার সুবিধা একবারও হইল না, ভীড়ের ভিতর শুধু তাঁহাকে বার-দুই প্রণাম করিলাম। উৎসবের ভিতরেও হৃদয় কেমন যেন অপরিতৃপ্ত থাকিয়া গেল।

৮ই পৌষ উপাসনা একটু বেলায় হইল। ভোরেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেহলীর সম্মুখে আসিয়াই কবির সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলাম। কাল মিস্ ফেরিংকে কিছুই বলি নাই শুনিয়া, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মেয়েদের তুলনায় আমরা কি রকম হীন হইয়া গেছি, তাহাই সরস ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৮ই যে সভা হয়, তাহাতে এইবার তিনিই সভাপতি হইলেন। আমাদের দেশের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। সেই দিনই সভা-ভঙ্গের পর, শিশু-বিভাগের ঘরগুলির পিছনের মাঠে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হইল। অনেক বৈদিক আচারাদি অনুষ্ঠিত হইল। ভিত্তির জন্য যে গর্ত্তটি কাটা হইয়াছিল, মন্ত্র পাঠাদির পরে কবি তাহার ভিতর আতপ তণ্ডুল, জল,

কুশ, ফুল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলেন। বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ গর্ত্তে মৃত্তিকা দিলেন।

দুপুরে স্পোর্ট্‌স্ ছিল, তবে আমরা সেখানে না গিয়া প্রতিমা দেবীর ঘরে বসিয়া পরের দিনের মেলার আয়োজনই করিতে লাগিলাম। বিকালে কিছু হইবে বলিয়া আগে শুনি নাই, এই সময় শুনিলাম যে সুকুমার বাবুরা কিছু আবৃত্তি ও হাসির গান প্রভৃতি করিবেন। আশ্রমের কয়েকজনও যোগ দিলেন ইহাতে। 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান হইল। কতকগুলি কৌতুকাভিনয় প্রভৃতিও হইল। একবার মনে হইল যেন রবীন্দ্রনাথ দরজার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সব শেষ হওয়ার পর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম। অধ্যাপকদের বাড়ীর কাছে আসিয়া প্রভাতবাবুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগিয়ে দেব না নিজেই যেতে পারবে ?" আমি বলিলাম, "এগিয়ে দেবার দরকার নেই, এমনিই বেশ যাব।" এমন সময় অন্ধকারের ভিতর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, বলিলেন, "কে, সীতা ? এইখানে এস, আমি আলো দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" অগত্যা অগ্রসর হইয়া গিয়া

দেহলীর নীচে দাঁড়াইলাম। কবি সেইখানেই বসিয়া-ছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে সুধাকান্তর নাচ দেখে এলাম।" আলো-হাতে চাকর আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

৯ই পৌষ সকালে আশ্রমের মৃত অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করিয়া উপাসনা হইল। এবারে ছাতিমতলায় না হইয়া সভা আমবাগানেই হইল। নেপালবাবু আচার্য্যের কাজ করিলেন ও জগদানন্দ রায় মহাশয় পরলোকগত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু বলিলেন।

ইহার পর মেয়েদের 'আনন্দবাজার' খুলিল। হট্টগোল হইল প্রচুর, জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালই হইয়াছিল বলিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়ই জমিল সব চেয়ে বেশী। আমরা দুই বোন এবং সুকেশী দেবী নীচু বাংলায় হেমলতা দেবীর ঘরের সামনে ব্লাউস, ফ্রক প্রভৃতির একটি দোকান খুলিয়াছিলাম। আশ্রমবাসী কয়েকজন যুবক আমাদের ক্রেতা জুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, জিনিষ বিক্রী হইল মন্দ নয়। সারা দিন ঐখানেই কাটিল, মাঝে শুধু একবার বাড়ী গিয়া নাইয়া-খাইয়া আসিলাম। আমাদের পাশে মিস্ ফেরিংও একটি দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিকালে নীচু বাংলার ঘেরা উঠানে

শামিয়ানা টাঙাইয়া খাবারের দোকান খোলা হইল। সুকেশী দেবীর বালক ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে "শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" লিখিয়া, ছেলেটাকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছেলের দল এইবারে সদলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকার না-হওয়া পর্য্যন্ত সরবে এবং সানন্দে মেলা চলিতে লাগিল। তাহার পর যে যাহার দোকানপাট তুলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলাম।

১০ই পৌষ মন্দিরে খ্রীষ্টোৎসব হইল। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে শুনিলাম প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে। তখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা শুনিলেই মনে একটা আতঙ্ক আসিত। প্রতিমা দেবীকে দেখিতে গেলাম, তিনি সংক্রামক কিছু হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া আমাদের তাঁহার বেশী কাছে যাইতে বারণ করিলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার অল্প পরেই সুকেশী দেবী আসিলেন 'আনন্দবাজারে'র হিসাব মিলাইতে। হিসাব মিলানোও হইল, গল্পও হইল, তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন। সেই তাঁহাকে শেষ দেখিলাম।

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যস্ত হইয়া দেখিতে গেলাম কিসের টেলিগ্রাম। দেখিয়া আশ্বস্ত

হইলাম যে উহা আমাদের নয়, রবীন্দ্রনাথকে কে একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক তার করিয়াছেন, পিওন ভুল করিয়া সেটা আমাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। টেলিগ্রামটা আমিই দেহলীতে লইয়া গেলাম। তিনি তখন নিজের পাথরের চৌকি পাতা কোণটিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। টেলিগ্রাম দেখিয়া বলিলেন, "টেলিগ্রাম যখন তোমার কাছে গিয়েছে, তখন অতিথিকেও আমি সেইখানেই পাঠাব। তুমি তাকে নিয়ে যা পার কোরো।"

বিকালের দিকে দেখিলাম আমারও শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না। ভীত হইয়া গোটা দুই influenza tabloid খাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু জ্বর তাহাতে আটকাইল না। রাত্রেই জ্বর আসিল। সকালে থার্মোমিটারের খোঁজে বাহির হইয়া দিদি খবর লইয়া আসিলেন যে সুকেশী দেবীর জ্বর হইয়াছে ও প্রতিমা দেবীর জ্বর বাড়িয়াছে। তাহার পর দুই-এক দিনের ভিতরেই বড়মা এবং মিস্ ফেরিংও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

সকলেরই অসুখ বাড়িয়া চলিল। শুইয়া শুইয়াই সকলেরই খবর পাইতে লাগিলাম। মা কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া আমাকে একবার

দেখিয়া গেলেন, ঔষধও দিয়া গেলেন। তাহার পর কয়েক দিন আর আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিবারস্থ রোগিণীদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। মেম-সাহেবটি দিন তিন-চার জ্বর ভোগ করিয়া অল্পের উপর দিয়া উৎরাইয়া গেল। আমি অবশ্য আর কয়জনের অপেক্ষা আগেই সারিলাম, তবে বেশ কয়েক দিন রোগ ভোগ করিয়া। হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী ও সুকেশী দেবীর অসুখ বাড়িয়াই চলিল, কলিকাতা হইতে নার্স ও ডাক্তার আনানো হইল। সুকেশী দেবীর পিতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় আর-একদিন আমাকে দেখিতে আসিলেন। বলিলেন শীঘ্রই একবার মহীশূর ভ্রমণে যাইবেন। তাঁহাকে সেদিন কেমন যেন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম। শুনিলাম তাঁহার এক আত্মীয়ার কাছে বলিয়াছেন, "মনে হচ্ছে আশ্রমে যেন মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

মৃত্যুর দূত সত্যই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অমবস্যার দ্বিপ্রহরে সুকেশী দেবী প্রাণত্যাগ করিলেন। আমাদের বারান্দায় বসিলে তাঁহাদের বাড়ী দেখা যাইত। সেইখান হইতেই দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমের অনেকে সেখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। সুকেশী দেবীর বৃদ্ধ পিতা ও

ভ্রাতুষ্পুত্র তৎক্ষণাৎ স্টেশনে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় সুকেশী দেবীর শ্মশান-যাত্রাও ঐখানে বসিয়াই দেখিলাম। মৃত্যুর সহিত সামনাসামনি পরিচয় তখনও হয় নাই। কয় দিন আগে পর্য্যন্তও যিনি আমাদের একজন ছিলেন, যাঁহার সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে কত দিন কাটিয়াছে, অকস্মাৎ এই ভাবে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া মনে নিদারুণ একটা আঘাত পাইলাম। তাঁহার বাড়ীতে সেই সময় যে কান্নার স্বর শুনিয়াছিলাম, সেই স্বর যেন প্রান্তরের বায়ুতে নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছে মনে হইত। এই সময় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু-সংবাদও শুনিলাম।

রবীন্দ্রনাথ মহীশূর যাত্রা করিলেন কয়েক দিন পরেই। হেমলতা দেবী ও প্রতিমা দেবী তখন আরোগ্যের পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আশঙ্কা তত ছিল না। রোগে ভুগিয়া অনেকটাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবু কবির যাত্রার দিন তাঁহার দোতলার ঘরটিতে উঠিলাম একবার দেখা করিয়া আসিতে। তিনি তখন জিনিষ গুছাইতে ব্যস্ত, তবু কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। নিজে চলিয়াছেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে, কিন্তু আমি কেন ঘন ঘন কলিকাতা যাই বলিয়া আমাকে একটু বকিয়া লইলেন। বলিলেন, "আর জ্বরটর কোরো না বাপু।" কয়েকটি ছবি আঁকা

কার্ড উপহার স্বরূপ দিলেন। অনেকে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘণ্টা-দুই পরে বাড়ী বসিয়াই দেখিতে পাইলাম তিনি স্টেশনে চলিয়াছেন।

সুকেশী দেবীর শ্রাদ্ধের দিন আশ্রমের একটি ছেলে আত্মহত্যা করিল। ম্যাট্রিক টেস্টে পাস করে নাই মনে করিয়াই সে এই কাণ্ড করিল। ভয়ে যেন আমার মনটা অভিভূত হইয়া গেল। মনে হইল আশ্রমের উপর কিসের যেন একটা ছায়া নামিয়া আসিতেছে। একজন সাঁওতাল চাকরও দুই-একদিনের মধ্যে রেল লাইনে পড়িয়া মরিল। উহা ইচ্ছাকৃত বলিয়াই সকলে মনে করিলেন। সকলেই যেন আতঙ্কে স্তব্ধ, কয়েকজন চাকরবাকর কাজ ছাড়িয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। আমরা এই সময় কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

সংবাদপত্রেই কবির খবর মধ্যে মধ্যে পাইতাম। New India বলিয়া একটি কাগজেই তাঁহার খবর বেশী থাকিত। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মধ্যে একবার তিনি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এই খবর পাইয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। আবার আরোগ্যের সংবাদও ঐ ভাবেই

পাইলাম। মার্চ্চ মাসের ৩রা কি ৪ঠা আমরা আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম।

আসিয়া দেখিলাম দেহলী ও পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোর অধিবাসী বদল হইয়াছে, অবশ্য ঠিক সেই সময় দুইটি বাড়ীই খালি। শুনিলাম কমলা দেবী এখন হইতে দেহলীতে থাকিবেন, ঘর-সংসার সেখানে পাতিয়া রাখিয়াই তিনি কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন কয়েক দিনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণান্তে আসিয়া পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ীর দোতলায় থাকিবেন। আশ্রমে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না, দিনুবাবুও ছিলেন না, সুতরাং গানটান আর শুনিতাম না। তবু দিন মন্দ কাটিত না। বসন্তের আগমনে আশ্রমে রূপ ও রঙের জোয়ার আসিয়া গিয়াছিল, পাখীর ডাকে সারাদিন কর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিত। দোলের দিন ছেলের দল রবীন্দ্রনাথের ঘরের বারান্দায় বসিয়া মহোৎসাহে গান গাহিয়া গেল—

"যা ছিল কাল ধলো, তোমার রঙে রঙে রাঙা হ'ল
যেমন রাঙা বরণ তোমার চরণ, তার সাথে আর
ভেদ না র'ল।"

রাত্রিকালে মাঠে বা খোয়াইয়ে পূর্ণিমা সম্মিলন হইবার কথা ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ একটু মেঘলা করিয়া আসাতে

তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। আশ্রমের গণ্ডীর ভিতরই হেঁয়ালী নাট্য, গান প্রভৃতি কিছু কিছু হইল।

কমলা দেবী ফিরিয়া আসিয়া দেহলীতে সংসার গুছাইয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাসভবন তখনও বন্ধ। New Indiaতে মস্ত মস্ত তালিকা পাইতাম, কবে তিনি কোথায় গিয়াছেন, কোথায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় তাঁহাকে কি ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। পড়িয়া মনটা খুসি হইত বটে, কিন্তু সবচেয়ে যে খবরটি জানিতে চাহিতাম যে কবে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, সেই খবরটিই দেখিতাম না। শূন্য বাড়ীটার দিকে চাহিয়া মন দমিয়া যাইত, বৃদ্ধ এক বাবুর্চ্চি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে ইহাই শুধু দেখিতে পাইতাম।

হঠাৎ এক দিন কমলা দেবীর মুখে শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন, ডাক্তার তাঁহাকে কিছুদিন বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে তিনি তখনই ফিরিলেন না। কলিকাতায় নানা কাজে আট্‌কা পড়িলেন কয়দিনের জন্য। বিচিত্রায় ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ, এম্পায়ার থিয়েটারে বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি চলিতে লাগিল, আমরা দূরে বসিয়া শুনিতে

লাগিলাম। কলিকাতার ভক্তবৃন্দকে ঈর্ষা যে করি নাই তাহা বলিতে পারি না।

একদিন সকালে দেখি সামনের বাড়ী ঝাড়া-পোঁছার বেজায় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। সেদিন শনিবার বোধহয়। উপর তলায় খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল অনেক-কিছু তোলা হইতেছে। সন্ধ্যার সময় কবির ভৃত্য সাধুকেও দেখিতে পাইলাম, সঙ্গে তাহার গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিষপত্র। আশ্রমবাসিনী একজনের মুখেই শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও শুনিলাম যে তিন-চার দিনের ভিতরেই তিনি আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, সেখান হইতে কাশী যাইবেন। মনটা খুসি হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার মুষ্‌ড়াইয়া গেল।

ভোরবেলা ছেলেদের বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। গানের ভিতর উৎসাহ ও আনন্দের সুর সুস্পষ্ট, বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কবির শয়নকক্ষ খোলা, শয্যাও দেখা যাইতেছে, তবে তাঁহাকে ঠিক তখনই দেখিতে পাইলাম না। দিদি ও আমি বেড়াইতে বাহির হইলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছিতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তখন উপাসনায় বসিয়াছিলেন, দেখা করিতে যাইতে পারিলাম

না। সকালবেলাটা লোকের ভীড়ে যাইবারই পথ পাওয়া গেল না। বেলা দশটার পর আর লোকজন কেহ উপরে উঠিতেছে না দেখিয়া আমরা দেখা করিতে গেলাম। এ বাড়ীটি কেমন যেন তাঁহার বাড়ী বলিয়া মনে হইতেছিল না। এ জীবনে তাঁহাকে অনেক রকম অনেক বাড়ীতে থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার বাড়ী বলিতে মনের মধ্যে আমার কেবল দেহলীর ছবিই ভাসিয়া উঠে। এইখানে তাঁহাকে যেমন মানাইত, এমন যেন আর কোথাও মানায় নাই।

দেখা তখনও পাওয়া গেল না, তিনি তখন কোথায় বাহির হইয়াছেন, এই খবরটা সাধুর কাছে সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এ বাড়ীটি আমাদের বাড়ীর অত্যন্তই কাছে ছিল, মধ্যে একটা বড়গোছের উঠান মাত্র। স্নানান্তে বারান্দায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছি, দেখিলাম তিনি ছাতা হাতে করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। আমাদের বাড়ীই আসিতেছেন বুঝিতে পারিলাম। উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সীতা, আমি এইবার তোমাদের প্রতিবেশী হয়েছি। আমি কিন্তু ভেবেছিলুম তোমরা এখন কল্‌কাতায়

আছ, আমার বক্তৃতাতে তোমাদের পাব। তোমার বাবা এইখানেই আছেন?"

বাবা ঘরেই ছিলেন, সেইখানেই গিয়া কবি বসিলেন। দুই জনে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। আমাকে তখন গৃহকর্ম্মে অন্যত্র যাইতে হইল।

খবর পাইলাম দুপুর বেলা তিনি আশ্রমের সকলকে কিছু বলিবেন। তাঁহার উপরের ঘরেই সভা হইল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তাহাব পর অনেকক্ষণ অধ্যাপকদ্বয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। অনেকগুলি বই আনিয়াছিলেন, সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বিকাল হইয়া আসার মুখে সভা ভঙ্গ হইল।

বৈকালিক জলযোগ সারিয়া যখন বেড়াইতে বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম দেহলীর পাশের ছোট বাগানটিতে বসিয়া তিনি দিনুবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আমরাও সেইখানে গিয়া বসিলাম। মান্দ্রাজে যে-সব বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই একটি সন্ধ্যার পর পড়িয়া শুনানোর কথা হইল, কিন্তু শিশুবিভাগ এই সময় আব্‌দার ধরিয়া বসিল যে সে-সময় গুরুদেবকে তাহারা সার্কাস দেখাইবে। ছেলেদের আব্‌দার তাঁহার কাছে

কখনও উপেক্ষিত হইত না, সুতরাং সার্কাস দেখিতেই তিনি চলিলেন। সার্কাসটা আগে একবার দেখিয়াছিলাম বলিয়া আর দেখিতে গেলাম না।

তাঁহার নূতন বাড়ীটা আমাদের বাড়ীর খুবই কাছে ছিল, সারাক্ষণই তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। তবে মাত্র চার দিনের জন্য আসিয়াছেন, কাজের তাগিদ বেশী ছিল, সুতরাং তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ বেশী পাওয়া যাইত না। পরদিন সন্ধ্যার সময় কমলা দেবীর সঙ্গে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, গল্প বেশ উচ্চকণ্ঠেই হইতেছে, হঠাৎ কমলা দেবী চুপ করিয়া যাওয়াতে উপরের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম কবি আগেরই মত ছোট ছাদটিতে ইজি-চেয়ারে বসিয়া গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন। তিনিও দেহলীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সকলে উপরে গিয়া বসিলাম। কিসের টানে যে এই ছাদে আসিয়া ভাঙা চৌকিতে বসিয়া আছেন তাহাই তিনি কমলা দেবীকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর আর এক প্রসঙ্গ উঠিল, তাঁহার গানে ঘুরিয়া ফিরিয়া "কমল" কথাটাই এত বার আসে কেন? দিনুবাবু নাকি আপত্তি করেন, ছেলেরা নাকি গানে ও-কথাটা থাকিলেই হাসে। কবি বলিলেন দোষটা মেয়েদেরই, তাহারাই এ কথাটা ছড়াইয়াছে।

রাত্রে তাঁহার "শিক্ষা" সম্বন্ধীয় একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার নূতন শয়নকক্ষেই বসিবার স্থান হইল। প্রবন্ধটি বেশ বড় ছিল, পাঠের পর কিছুক্ষণ আলোচনাও হইল। সুতরাং বাড়ী যখন ফিরিলাম, তখন বেশ রাত, আশ্রমের ছেলেরা শুইতে চলিয়া গিয়াছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দেখিলাম তাঁহার ঘরে অনেক লোক। কিসের সভা খোঁজ লইয়া জানিলাম যে অধ্যাপকরা তাঁহার সঙ্গে কাজের কথা বলিতেছেন। এই সভা শেষ হইতেই তিনি আসিয়া আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাবার সঙ্গে নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে লাগিল। আর কেহ সেখানে না যাওয়ায় আমিও সঙ্কোচ বশতঃ গেলাম না, পাশের ঘরেই বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। বিকালে আবার দেখিলাম তিনি দেহলীর ছাদে গিয়া বসিয়াছেন। এইখানে তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতাম এখন অবাধে যাওয়া যায়। আমরা গিয়া বসিবার কিছু পরেই Folk Religion in India নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শ্রোতা অনেকেই জুটিলেন, তবে সকলেই যে প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা দেখিতেই পাইলাম।

তাহার পর দিন বুধবার। মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে তাঁহার চারিদিকে ভীড় দেখিয়া বুঝিলাম এখন কাছে যাইবার সুবিধা হইবে না, বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

খাওয়াদাওয়ার পর একটি ছোট মেয়ে আসিয়া খবর দিল যে এখনই কবির ঘরে প্রবন্ধপাঠ হইবে। আমরা যথারীতি গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম মেয়েরা বিশেষ কেহ আসেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি পড়িয়া শুনাই-লেন, সেটির নাম Message of the Forest। পাঠান্তে কিছুক্ষণ আলোচনাও হইল। সান্ধ্যভ্রমণের পর সেদিনও তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য সেই ছোট ছাদটিতে পাওয়া গেল। আমাদের ডাকিয়া বলিলেন, "এস এস, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্।" নিজে মাটিতে বসিয়াছিলেন, শতরঞ্চির উপর ভাঙা ইজি-চেয়ারটা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, "তুমিই না-হয় চেয়ারে বোসো।" আমরা হাসিয়া সকলেই শতরঞ্চিটির আশেপাশে বসিলাম। সংখ্যায় তিনজন ছিলাম। কবির হাতে কয়েকটি শিরীষ ফুল দেখিলাম, সেগুলি আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, ঠিক তিনটি আছে, তোমরাও ঠিক তিনজন আছ, ইচ্ছে কর ত প্রত্যেকে এক-একটি নিয়ে

মাথায় গুঁজতে পার।" ফুল তখনই গ্রহণ করিলাম, তবে মাথায় গোঁজা তখনই হইয়া উঠিল না। আজ আবার বড় ছেলেরা তাঁহাকে সার্কাস দেখাইবে স্থির করিয়াছিল, সুতরাং খুব বেশীক্ষণ গল্প করা গেল না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সার্কাস দেখিতে গেলাম। সার্কাস ভালই হইল ছেলেদের পক্ষে।

বৃহস্পতিবারে তাঁহার আবার যাত্রা করিবার কথা। কলিকাতায় এক দিন থামিয়া, বক্তৃতা দিয়া তিনি কাশী যাইবেন শুনিলাম। সকাল হইতে তাঁহার ঘরে লোকের ভীড়, একবার যে গিয়া বিদায় লইয়া আসিব, প্রণাম করিয়া আসিব, তাহার সুযোগই পাইতেছিলাম না। অবশেষে গেলাম যখন তখন বেলা দুইটা প্রায়। দেখিলাম শয়নকক্ষের পাশের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে গিয়া দেখিলাম শুধু শুধু বসিয়া নাই, নিজের কাগজপত্র গুছাইতেছেন। চারিদিকে ছেঁড়া চিঠিপত্র, কাগজ, কত কি ছড়ানো। তাহার ভিতর তাঁহার হস্তাক্ষর অনেকগুলির গায়ে। ইহা ত চাকর কিছুক্ষণ পরে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিবে মনে করিয়া বড়ই কষ্ট বোধ করিলাম। তিনি সেইখানেই বসিয়া আছেন, সঙ্কোচবশতঃ সেগুলি আর কুড়াইয়া লইতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ কাশী গিয়া কি কি করিবেন তাহার কিছু

আভাস দিলেন। বলিলেন, অমনি আগ্রা-দিল্লীও ঘুরিয়া আসিতে পারেন। শুনিলাম আগ্রায় তাঁহার ডাক পড়িয়াছে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে, তাঁহার নাম শিবপ্রসাদ বোধহয়। তিনি এক মহাধনী শিষ্যের নিকট হইতে যমুনাতটবর্ত্তী বিশাল বাড়ী, হিমালয়ের বিশ্রামভূমি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। "শান্তিনিবাস" কিংবা "শান্তিভবন" নাম দিয়া একটা আশ্রমও সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে নিজের শক্তির উপর তাঁহার আস্থা নাই, তাই কবিকে ডাক দিয়াছেন, জিনিষটির ভিত্তি যাহাতে সুদৃঢ় হয় তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের যাইবার ইচ্ছা কিছু আছে জানাইয়া দিলেন, বলিলেন, "যদি যাই তা হ'লে দখল করতে পারি, এ আমি ব'লে রাখছি।" সে বিষয়ে ত কাহারও সন্দেহ ছিল না। আবার বলিলেন, "বাড়ী-ঘরগুলোর বর্ণনা শুনে ত লোভ হচ্ছে, গিয়ে দেখলে হয়। সুবিধে হয় ত সবসুদ্ধ সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা অত দূর যেতে রাজী হবে কি না বল।" আমি বলিলাম, "আমরা গিয়েই বা কি করব ?" কবি বলিলেন, "তবু চারপাশ ঘিরে থাকলে ভাল। কেবল হিন্দুস্থানী দে'খে দে'খে প্রাণ যে হু-হু করবে।"

আবার বীরভূমের ভাষার সুর, নিরক্ষর চাষাভূষাদের মধ্যে তাঁহার গানের প্রচলন প্রভৃতি লইয়া খানিকক্ষণ কথা বলিলেন। এই সময় সন্তোষবাবু আসাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজের ঘরবাড়ী ও জিনিষপত্রের চার্জ্জ বুঝাইতে বসিলেন। বাড়ীটিতে উই আর ইঁদুরের বিষম উৎপাত। কবি বলিলেন, "কেউ এগুলো রোজ দেখলে ভাল হয়। কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি এখানে থেকে সব ভার নেন, তা হ'লেই ভাল।" সন্তোষবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারাই ভার নিন্ না?" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ সীতা, থাকবে কি না। আমার জিনিষপত্র হারালে কিন্তু আমি তোমাকে দায়ী করব, আমি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক।" আবার তখনই সুর বদলাইয়া বলিলেন, "থাকো না বেশ বাড়ীটা জুড়ে।"

আমার লোভ যে কিছু হয় নাই তাহা নহে, তবে প্রাণে ভরসা আসিল না। তিনি জিনিষ হারাইলে দায়ী করুন বা নাই করুন, দায়িত্বটা গুরুভার তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। আমি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া কবি বলিলেন, "ওদের থাকবার মতলব নেই, দেখছ না কি রকম হাসছে? তুমি অন্য চেষ্টা দেখ।" অন্য চেষ্টাই বোধহয় শেষ অবধি দেখা

হইয়াছিল, কারণ কবি চলিয়া যাইবার পর রোজ রাত্রে দেখিতাম কে একজন লণ্ঠন জ্বালাইয়া উপরের বারান্দায় বসিয়া থাকে।

ইহার মধ্যে একবার মা ও বাবা আসিয়া দেখা করিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ১লা বৈশাখের আগে আসবেন ত?" কবি বলিলেন, "নিশ্চয়, ওটাই হচ্ছে সীমা, ওর আগে সেরে ফেলতে হবে। বিধাতা যখন প্রথম আমাকে পথে বেরবার ডাক দেন, তখন ত বলেন না যে অনেক দূরে যেতে হবে, বলেন, 'এই কাছেই,' ভাবেন তা না হ'লে ভয় পাবে। কিন্তু একবার বেরলে আর থামতে পারি না, ঘুরতেই থাকি, শেষে একেবারে একটা ভাঙাচোরা অবস্থায় এসে ঠেকতে হয়।"

দেখা করিবার জন্য উপরে নীচে আরও অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া আর বেশীক্ষণ না বসিয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। বিকাল বেলা তিনি যখন স্টেশনে যাইবার জন্য বাহির হইলেন তখন আর ভীড়ের মধ্যে গিয়া ভীড় না বাড়াইয়া নিজেদের বারান্দায় দাঁড়াইয়াই তাঁহার যাত্রা দেখা গেল। সঙ্গে গেলেন দিনুবাবু এবং এণ্ড্রুজ্ সাহেব।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার কয়েক দিন আগে হইতেই বাড়ী ঝাড়াপোঁছা চলিতেছে দেখিলাম, পরে টেলিগ্রামও আসিল। বিকালের ট্রেনেই আসিলেন, বাড়ী বসিয়াই তাঁহার আগমন দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি দিনুবাবুর গানের ক্লাসে আসিয়া বসিয়া আছেন। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি তাঁহাকে একেবারেই কাবু করে নাই। অথচ শরীর তাঁহার তখন অসুস্থই। পরদিন বুধবার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে আচার্য্যের কাজ করিলেন না, শুনিলাম কিছু অসুস্থ আছেন। সকালে যখন চা খাইতে বসিলেন, তখন উপরের বারান্দার দিকে চাহিয়া দেখিলাম ভীড় বিশেষ নাই, শুধু এণ্ড্রুজ্ সাহেব ও আরও একজন। দেখা করিতে গেলাম। প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিলাম, কারণ দেখিলাম তাঁহারা নানারকম কাজের কথায় ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানিক পরে আমাদের বাড়ী আসিলেন। কাশী ও অন্যান্য জায়গা ভ্রমণের অনেক গল্প হইল। কাশীতে বড় ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, বলিলেন, "ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে গিয়েছি। রোজ নিমন্ত্রণ, কেউ ত আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকবে না, প্রত্যেকেই বলে, 'আজ কেবল আমার বাড়ী আসবেন, এইখানে খাবেন, গাইবেন

ইত্যাদি।' তার উপর রাণু আছেন, তাঁর বাড়ী যেতে হবে। সবাই বলে, 'না যদি আসেন, তা হলে আমাদের ভয়ানক দুঃখ হবে।' ভাবতুম, ঐ ত তোমাদের অস্ত্র! দুঃখ। কাজেই যেতে হত, দুঃখ ত দিতে পারি না।"

খানিক পরেই তাঁহার চাকর সাধু সকালের ডাক আনিয়া উপস্থিত করিল, তিনি তখন উঠিয়া গেলেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়াই বাবাকে গান্ধীজীর লেখা একখানি চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে চিঠিতে যেখানে কোনো কথা ছিল, সেই জায়গাগুলি তাড়াতাড়ি এমন ভাবে পড়িতেছিলেন যে, আমি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলাম। চিঠি পড়া শেষ হইতেই চলিয়া গেলেন।

এবারেও সারাক্ষণ এত লোকের ভীড় যে দুদণ্ড তাঁহার কাছে গিয়া বসিবার অবকাশ পাওয়া যাইত না। পাশের বাড়ী, যাইলেই যাইতে পারি, কিন্তু ভয় হইত পাছে তাঁহার কাজের ব্যাঘাত জন্মাই। ভীড় যাঁহারা করিতেন সকলেই যে কিছু কাজে আসিতেন তাহা নয়, তবে কাজের ভান একটা থাকিত। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার কন্যা এক দিন বলিলেন, "এক বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, সারাক্ষণ লোক ঘিরে

ব'সে থাকে।" সত্যই এবার লোকের ভীড়টা একটু অসাধারণ দেখিতাম।

বৃহস্পতিবারে কোথা হইতে এক পালোয়ান আসিয়া জুটিল। সে কানে বাঁধিয়া দু-মণ ভার তোলা, প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখাইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলাটা তাহার খেলা দেখিতেই কাটিয়া গেল। এণ্ড্রুজ সাহেব একবার কবিকে ডাকিয়া আনিলেন, তবে তিনি পালোয়ানের পালোয়ানীর দিকে বেশী মনোযোগ দিলেন না। দেহলীর সামনের সেই বাঁধানো চাতালটির কাছে দাঁড়াইয়া সমবেত কয়জনের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা রোদ পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বাড়ী ফেরার পথে দিদি বলিলেন যে বাবা একখানা চিঠি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে দিবার জন্য। শুনিলাম কবি তখন উপরে আছেন। দুই বোনে উপরে উঠিলাম, তখন তিনি খাইতে বসিয়াছেন, কাছে বসিয়া এণ্ড্রুজ সাহেব এবং মীরা দেবী। চিঠি দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "বোসো।" বসিবার চেয়ার একখানা কম পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ চেয়ার না আনার জন্য সাধু প্রচণ্ড এক ধমক খাইল। ইহাতে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইল, যদিও

দোষটা আমার ছিল না। এই জিনিষটি তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারেন না, তাহা আগে এবং পরে অনেকবার দেখিয়াছি। অসুস্থতার জন্য মনটাও সেদিন বোধহয় ভাল ছিল না, অন্য দিনের মত সরস কথাবার্ত্তা কিছু হইল না। নীরবে খাওয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সাহেব ক্রমাগতই কথা বলিয়া চলিয়াছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে সংক্ষেপে উত্তর দিতেছেন। একবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সীতা, নূতন গান-টান কিছু শিখলে ?" আমি বলিলাম, "শিখেছি কয়েকটা।" বলিলেন,"তোমার গান শিখে কোনো লাভ আছে, কখনও গাও? যার গান তাকেই কখনও শোনালে না এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ।" তাঁহার খাওয়া শেষ হইতেই চলিয়া আসিলাম।

দিন-দুই পরে গান্ধীজীর চিঠির কি উত্তর দিয়াছেন তাহাই বাবাকে শুনাইবার জন্য কবি আমাদের বাড়ী আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "সীতা, তোমাকে দিয়ে খানিক copying করিয়ে নেব কি না ভাবছি। পারবে ?" বলিলাম, "তা পারব নিশ্চয়।" লেখাটা আমায় দিয়া বসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন, তবে যাইবার সময় আবার সেটা সংশোধন করিবার জন্য চাহিয়া লইয়া গেলেন। বিকালে সেটার সন্ধানে তাঁহার কাছে গিয়া

উপস্থিত হইলাম। তিনি তখনও বসিয়া লিখিতেছেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "লেখাটা আমি ভুল ক'রে নিয়েই চ'লে এসেছিলাম। যাক, সাহেব আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে, সে-ই সব যেখানে যা দেবার দিয়ে দেবে। তোমায় আর পরিশ্রম করতে হ'ল না।" পরিশ্রম না করিতে হওয়ায় বিন্দুমাত্রও খুসী হইলাম না। এণ্ড্রুজ সাহেবের উপর রীতিমত রাগ হইল, তিনি কি আর কলিকাতা যাইবার দিন খুঁজিয়া পাইলেন না?

এই সময় দুই-তিনজন উপরি উপরি তিনি কেমন আছেন জানিতে চাওয়ায় কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন, "যাও, আমি বলব না।" আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার উচিত অন্যদের ব'লে দেওয়া, আগে ত তোমরা শুনেছ।" আরও কয়েকজন আসিয়া বসিলেন, এবং ঘণ্টাখানিক নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা শুনিয়া চলিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের শরীর এ সময়টা বেশ অসুস্থই দেখিতাম। অমন যে অসাধারণ কাজ করিবার শক্তি তাহাও যেন কিছু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সকলে বলিত, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল তাহার পরে একেবারে বিশ্রাম না করিয়া তিনি ক্রমাগত ঘুরিয়াছেন, তাই শরীর অতটা ভাঙিয়াছে। তবু এখনও

চুপ করিয়া থাকিতে চাহিতেন না। এক-এক দিন বাধ্য হইয়া শুইয়া পড়িতেন, পরদিন হয়ত উঠিয়াই ক্লাস পড়াইতে চলিয়া গেলেন, নয় ত কাগজপত্র টানিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

১৩২৫ শেষ হইল রবিবার দিন। মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা কে করিবে তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ করিতে পারিবেন না ইহা সকলে ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তিনি জানাইলেন যে আচার্য্যের কাজ তিনিই করিবেন, অন্য কোনও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন শুনিলাম। বাড়ী ফিরিবার পথে কালিদাসবাবু এবং প্রশান্তচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম। মন্দিরে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে গেলাম। আগাগোড়া শাদা-গরদের পোষাক পরিয়া কবি আসিয়া আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিলেন; অসুস্থতা তাঁহার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, কিন্তু কোনো কাজ তিনি সংক্ষেপে সারিলেন না। সবই যথারীতি হইল। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় মনে হইল যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছে। ছেলেরা প্রণাম করিবার জন্য চারিদিকে ভীড় করিয়া

দাঁড়াইল, সেখানেই তাঁহাকে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিলাম। কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইলেন না, পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা নীচে মীরা দেবীর কাছে বসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া ক্রমাগত তখন প্রণামার্থীর দল উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।

নববর্ষের দিন ভোর হইবার আগেই বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে তখনও ঝাপ্‌সা অন্ধকার, সূর্য্য উঠিতে অনেক দেরি। কিন্তু অনতিবিলম্বেই মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে হইল, বাহিরের লোক যেন অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কাহাকেও চিনিলাম না।

উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথকে আজও ফিরিবার পথেই প্রণাম করিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ফিরিলাম।

সন্ধ্যার সময় তাঁহার উপরের বারান্দায় একটি সভা বসিল। রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। আশ্রম-বাসীদের জীবনে আশ্রমের আদর্শ রক্ষা করার বিষয়েই বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল।

মঙ্গলবার, অর্থাৎ ২রা বৈশাখের দিন ছেলেরা এক ফাঁকির প্রত্নতত্ত্বাগার তৈয়ারি করিল। আশ্রমের সকলেই দেখিতে গেলাম। সেই বিচিত্র সঞ্চয়ের মধ্যে, নিজের পৌরাণিক নামের খাতিরে আমিও স্থান পাইয়াছি দেখিলাম। একটা কাগজে খানিকটা ধূলা, তাহাতে নাম লেখা, "সীতা দেবীর চরণরেণু।" মেলা দেখিয়া যখন ফিরিতেছি, তখন দেখি রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে ফিরিয়া চলিয়াছেন। আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা, ওখানে তোমার চরণরেণু দেখে এলাম, সত্যি দিয়েছিলে, না ফাঁকি ?"

বুধবারে নিয়মমত মন্দিরে উপাসনা হইল। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করিয়া কবিই আচার্য্যের কাজ করিলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরেই আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যত দূর বুঝিলাম শান্তিনিকেতনে বাসের পর্ব্ব শেষই হইল। মায়ের শরীর দারুণ অসুস্থ, তাঁহাকে আর কলিকাতায় একলা রাখা চলে না। জিনিষপত্র সবই গুছাইয়া লইয়া, সংসার একরকম তুলিয়া ফেলিয়াই আমরা যাত্রা করিলাম। বাড়ীটা তখনকার মত থাকিল, যদিই আবার ফিরিয়া আসা হয়।

রবিবার দিনটা জিনিষ গুছাইতে আর সকলের নিকটে বিদায় লইতেই কাটিয়া গেল। শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া আসিতে মনে যে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও ভুলি নাই। নারীজন্মে বিধাতা অনেক ঘরে ঘুরাইয়া ফিরেন, অনেক পরকে আপন ও আপনারকে পর করান। কিন্তু কখনও কোনও ঘর ছাড়িতে এত ব্যথা পাই নাই। মনে হইতে লাগিল যে শিকড়সুদ্ধ কে আমাকে জন্মভূমি হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইতেছে, যন্ত্রণায় মন বিকল হইয়া গেল।

মীরা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে একবার গিয়া দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর উপরে গেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় লইবার জন্য। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "কালকে কলকাতা যাচ্ছি।" চোখের জলটা অনেক কষ্টে সম্বরণ করিয়া রাখিলাম। তিনি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, বলিলেন, "কলকাতা যাচ্ছ? বাড়ীঘর সবসুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে যাও না, কেন আর এ যন্ত্রণা।" নিজের পাশের কতকগুলা কি জিনিষ ঠেলিয়া সরাইয়া জায়গা করিয়া বলিলেন, "বোসো, বোসো।"

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। নিজেও গরমের মধ্যে একবার হয়ত কলিকাতা যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন,

সেখানে শ্রীযুক্তা অবলা বসু তাঁহাকে নারীশিক্ষা-সমিতির সভাপতি করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "ছুটির সময় এখানে যদি থাকতে, তাহলে তোমাকে দিয়ে খানিক খাটিয়ে নিতাম। ভাবছি তর্জ্জমাটা Fifth Sixth Class-এও চালাব।" বলিলাম, "কলকাতায় আমায় আপনি কাজ পাঠিয়ে দেবেন, আমি ক'রে দেব।" কবি বলিলেন, "আচ্ছা দেখি।"

নিজের লেখার কি একটা প্রসঙ্গ ওঠাতে বলিলেন, "আমার লেখা আমি সব ভুলে গিয়েছি, আমাকে 'নৌকাডুবি' সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই তা বুঝতে পারবে।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতা যাওয়ার কথাটাই কেবল উঠিতে লাগিল। একবার বলিলেন, "চললে ত সব, একটা মানুষ যে এখানে প'ড়ে রইল তা একটুও কি দয়ামায়া নেই?" কি আর করি, বলিলাম, "আমার থাকবার উপায় থাকলে কি আর থাকতাম না?" সত্যই যদি থাকিয়া যাইবার উপায় তখন কিছু পাইতাম ত থাকিয়াই যাইতাম। বলিলাম, "আমাকে এখানে কিছু কাজ দিন্ না?" তিনি বেশ উৎসাহিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "নেবে কাজ? বেশ ত। আমি ত প্রায়ই ভাবি যে কেন তোমরা কিছু কাজ নিচ্ছ না।" আমি বলিলাম, "অবশ্য আমি যা করতে

পাবি, এমন কাজ।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,"পারবে না কেন? আগে তুমি দেখই না কি রকম ক'রে পড়াতে হয়। ছোট ছোট ছেলেগুলোর সাইকলজি বেশ মজার জিনিষ।"

আর কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন বিদায় লইবার জন্য, ছুটিতে অনেকেই অনেক জায়গায় যাইতেছেন। তাঁহারাও কথা বলিতে উৎসুক। সারাক্ষণ স্বার্থপরের মত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া থাকা চলে না, সুতরাং উঠিয়া পড়িলাম। প্রণাম করিতেই, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "কাল সকালে যাচ্ছ ত? আবার দেখা হবে।"

পরদিন যাত্রার হুড়াহুড়িতেই কাটিয়া গেল। ঠান্‌দি খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কাজেই রান্নাবান্নার হাঙ্গামটা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কথা রক্ষা করিলেন, নিজেই আসিয়া একবার দেখা দিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ থাকিয়া, দুই-একটি কথা বলিয়াই তিনিও চলিয়া গেলেন। দুই বৎসর তাঁহার কাছে ছিলাম। এমন ভাবে হঠাৎ চলিয়া আসাটা তাঁহারও মনে বোধহয় আঘাত দিয়াছিল। অন্যদিনের মত প্রসন্ন মুখ দেখিলাম না। যখন গাড়ীতে উঠিলাম দেখিলাম উপরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, নীচে নামিলেন না। আমিও আর উপরে গেলাম না, সেইখান হইতেই

মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় হইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া খবর তাঁহার সব সময়ই পাইতাম। বাবাকে চিঠিপত্র লিখিতেন, শান্তিনিকেতন হইতেও কেহ-না-কেহ প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। একদিন প্রভাতবাবুর মুখে শুনিলাম মীরা দেবীর অসুখ খুব বাড়িয়াছে, তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইতেছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথও আসিতে পারেন দুই-চারি দিনের মধ্যে।

ইহারই মধ্যে তাঁহার হাতে লেখা একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল দুই বোনের নামে। উপরে লেখা শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী। খুলিয়া দেখিলাম বেশ বড় একটি কবিতা, কাগজখানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপরে লিখিয়াছেন "প্রবাসীর জন্য প্রান্তরবাসীর উপহার।" কবিতাটির প্রথম লাইন, "ঐ বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে।"

বাবার কাছেও একখানা পোষ্টকার্ড আসিয়াছে দেখিলাম। নানাকথার মধ্যে তাঁহার নিজের জন্মদিন কেমন হইল সে খবর আছে, সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন, "সংযুক্তাকে আমার সংযুক্ত আশীর্ব্বাদ জানাবেন।"

ইহার কয়দিন পরেই মীরা দেবীর অসুখ বাড়াতে কবি

কলিকাতায় আসিলেন। প্রভাতবাবুর বিবাহও হইল এই সময়। একবার মনে আশা হইল যে হয়ত বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইবেন, কিন্তু কন্যার পীড়ার জন্যই বোধহয় তিনি আসিতে পারিলেন না। বাবা এই সময় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দির-প্রাঙ্গণে নূতন বর-কনের ছবি তোলা হইতেছে, দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, এমন সময় রাস্তায় গাড়ী থামার শব্দে সেদিকে চাহিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ্ সাহেব গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলাম। তাঁহারা দোতলায় বাবার ঘরেই আসিয়া বসিলেন। মীরা দেবী কিছু ভাল আছেন শুনিলাম। তিনি স্বয়ং কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "যে রকম চারিদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে কি ক'রে আর ভাল থাকব?" আমাদের কি একখানা শিশুপাঠ্য বই তখন বাহির হইয়াছে, তাঁহার কাছে একখানা গিয়াছিল। সেটার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সে আমার চেয়েও যোগ্যতর সমালোচকের হাতে পড়েছে। নীতু প'ড়ে বললে, 'এর ভিতর কিন্তু অনেক মজা আছে, সীতা মাসি বেশ মজা ক'রে লিখেছে'।" অল্পক্ষণ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ Knighthood ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে পত্র লিখিলেন। কাগজে কাগজে তাহা লইয়া প্রচুর লেখালেখি চলিল। এই চিঠিখানি সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ২রা জুন একবার এবং ৪ঠা জুন আর-একবার আমাদের বাড়ী আসিলেন। সারাক্ষণই রাজনৈতিক আলোচনা চলিত, তাহার ভিতর তখন কিছু রস পাইতাম না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম, পাশের ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কিছু কিছু কানে যাইত। দেশী এক সংবাদপত্র তাঁহাকে ঐ পত্র লেখার ফল হইতে বাঁচাইবার জন্য কি একটা বোকামিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, তাহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম বাবাকে বলিতেছেন, "আমাকে এমন অপমান কেউ কখনও করে নি।"

মীরা দেবীকে দেখিতে একদিন জোড়াসাঁকো গেলাম। ইহার আগে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা তখন এত অসুস্থ ছিলেন যে তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাওয়া একটু শক্ত ছিল। বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিয়াই সাধুচরণের দর্শন পাইলাম। সে আমাদের

দোতলার বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে কবি বসিয়া আছেন দেখিলাম, তবে ঘরে আরও অনেক লোক দেখিয়া তখন সেখানে না বসিয়া মীরা দেবীর সন্ধানেই গেলাম। তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়াই কিছুক্ষণ গল্প করা গেল, জলযোগও একপালা হইল। প্রতিমা দেবী বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর নীচে নামিলাম। বসিবার ঘরে তখনও মানুষের ভীড়, তবু ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তিনি সেইখানেই বসিতে বলিলেন, কিন্তু অত লোকের ভিতর বসিতে ইচ্ছা করিল না, দুই-চার মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

১১ই জুন বিচিত্রা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে আবার জোড়াসাঁকো গেলাম। লোক তখনও বেশী আসে নাই, মহিলা ত তিনজন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বসিয়া জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমরা কাছে গিয়া বসিতে খবর দিলেন যে সামনের সোমবার তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতেছেন।

প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। সেটি কবির উপাধিত্যাগ উপলক্ষ্যে রচিত। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে কতকগুলি গদ্য-কবিতা পড়িয়া

শুনাইলেন। এই ধরণের লেখা তখন সবে আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রোতাদের কেমন লাগিল তাহা বোধহয় জানিতে কিছু উৎসুক ছিলেন। অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। আমাকে শুদ্ধ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সীতা, কেমন লাগল ?"

তাহার পর ছন্দ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল, সর্ব্বশেষে গান। এক-একটা গানই দুই-তিনবার করিয়া তাঁহাকে গাহিতে হইল, কারণ কয়েকজন যুবক সেগুলি শিখিতে বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অবশেষে কবি ক্লান্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়াতে সভাভঙ্গ হইল। মীরা দেবীদের সঙ্গে দেখা করিয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলাম।

শান্তিনিকেতনে আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিলাম। ইহার জন্য যে বেদনা তাহা মন হইতে কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। দিন কাটানোর একটা অবলম্বন হইবে আশা করিয়া এই সময় ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ে একটি কাজ নিলাম। এইখানে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর কাজে ঢুকিয়াছিলাম।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি মনীষা দেবীর এক কন্যার

বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। বিবাহে যাইতে পারিলাম না, পরে দুই-এক জায়গায় তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে আশা করিলাম, কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরে পড়িলেন, এবং কিছুদিন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতেই পারিলেন না।

এই সময় তাঁহার 'জাপানযাত্রীর পত্র' বাহির হয়। বই একখানি উপহার পাইলাম, ভিতরে লেখা "শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু।" চারুবাবু ও বাবা কবিকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদেরই কাছে তিনি কেমন আছেন তাহার অল্পস্বল্প খবর পাইতে লাগিলাম। দেখিতে যাইবার জন্য অনেকদিন চেষ্টা করিয়া শেষে একদিন সফল হইলাম। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পৌঁছিতে দরোয়ান খবর দিল যে তিনি এখানেই আছেন বটে, তবে তাঁহার অসুখ। যাহা হউক, এই বাধা না মানিয়াই উপরে উঠিয়া গেলাম, নিজেকে বুঝাইলাম খুব বেশী বাহিরের লোকের ভীড় নিবারণ করিবার জন্যই বোধহয় দরোয়ানকে ঐ কথা বলিতে বলা হইয়াছে।

তাঁহার তিনতলার শয়নকক্ষে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, মেঝেতে পাতা বিছানায় তিনি শুইয়া আছেন, পাশে গৈরিকধারিণী এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা

করিতেছেন। শুনিলাম তিনি কবির চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্র-নাথের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত হইয়া শুইয়া থাকিতে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অসুখকে তিনি আমলই দিতেন না। চেহারা বড়ই ক্লিষ্ট দেখাইতে-ছিল। নানা কথার ভিতর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংযুক্তা দেবী একখানা জাপানযাত্রী পেয়েছ ত ?"

অসুস্থ ছিলেন বলিয়াই বাড়ীর অনেকে ক্রমাগত ঘরের ভিতর যাওয়া-আসা করিতেছিলেন। কবির ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে রোগশয্যায়ও রোগীর মত না থাকার জন্য স্নেহের ভর্ৎসনা করিতেছেন শুনিয়া একটু কৌতুক অনুভব করিয়া-ছিলাম। তাঁহাকে বকিতে পারেন, এমন লোকও তাহা হইলে আছেন ?

খানিক পরে চলিয়া আসিলাম। দিন-দুই পরে শুনিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং কাহারও কথা না শুনিয়া আবার যথারীতি ক্লাস পড়াইতেছেন ও লিখিতেছেন।

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে মুলু কয়দিনের আকস্মিক পীড়ায় আমাদের চিরদিনের মত ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সেই প্রথম নিকট পরিচয়, আঘাতে যেন একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেলাম। কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই

চির-বিদায়কে বিশ্বাসই করিতে পারি নাই। মুলুকে রবীন্দ্রনাথ বড় স্নেহ করিতেন, আমাদের এই দুঃখের দিনে তিনি কাছে ছিলেন না, কিন্তু বাবাকে ও আমাদের উপরি উপরি কয়েকখানি চিঠি লিখিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

বাবা মা পূজার ছুটিটা পুরীতে গিয়া কাটাইয়া আসিবেন স্থির করিলেন। সকলেই চলিলাম। কলিকাতা হইতে বাহির হইবার দিন-কয়েক আগে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমাদের বাড়ী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। দিন দুই পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেদিন আর কোনো অভ্যাগত উপস্থিত না থাকায় বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলাম। পুরী যাইতেছি শুনিয়া বলিলেন, "যাও, বেশ ভাল লাগবে।" বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অতঃপর উঠিয়া গেলাম। বাড়ী যাইবার জন্য যখন নামিতেছি তখন দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিজেই উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা যাচ্ছ?" তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মাসখানিক কাটানো গেল পুরীতে। প্রথম সমুদ্রদর্শন মনকে বড়ই মোহিত করিল।

৭ই পৌষের উৎসবান্তে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, "৭ই পৌষের উৎসব হয়ে গেল। আপনাদের স্মরণ করেছি······শান্তা-সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শুনিতে পাইলাম তিনি আবার বিলাতযাত্রা করিতেছেন। মাসের প্রথম দিকে যাত্রার আয়োজন করিতে কবি কলিকাতায় আসিলেন। ৩রা মে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। বসিয়া লিখিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন, প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কি গো, অনেকদিন পরে দেখা যে, এস এস।" সত্যই মাঝে আট-ন' মাস দেখাই হয় নাই। অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প হইল। আমাকে আশ্বাস দিলেন ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার আমাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইবেন। কখন ফিরিবেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ভয় পেয়ো না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।" প্রতিমা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল থেক, এসে যেন সব ভালই দেখি।" তাঁহার আশীর্ব্বাদের স্পর্শ মাথায় বহন করিয়া আনিলাম।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায়ই যাপন করিলেন। তবে পারিবারিক কোনো অসুবিধার জন্য বিশেষ কোনো উৎসব সেদিন হইল না, কয়েকজন ভদ্রলোক শুধু নিমন্ত্রিত হইলেন। আমরা দুই বোন চারুচন্দ্রকে ধরিয়া দুই ডালি ফুল তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। একটিতে ছিল শ্বেতপদ্ম, অন্যটিতে রক্তপদ্ম। চারুবাবু ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কি হে, এমন দুপুর রোদে কেন?" চারুচন্দ্র বলিলেন, "আমি বাহন হয়ে এসেছি।" ফুলের তোড়া দুটির কোন্‌টি কে পাঠাইয়াছি তাহা কবি জানিতে চাওয়ায় চারুবাবু বলিলেন, "আমি ত জানি না, আমি কেবল বহন করে এনেছি মাত্র। আপনিই অনুমান ক'রে নিন্।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "লালটাই সীতার বোধ হচ্ছে, তার মধ্যে একটু রাগ আছে কিনা।" এ হেন মন্তব্য শুনিয়া সকলে খুব হাসিয়াছিলাম।

মে মাসের মাঝামাঝি কবি ইউরোপ যাত্রা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আর গেলেন প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ।

এক বৎসরের বেশী তিনি ইউরোপের নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বাবার কাছে চিঠিপত্র মধ্যে মধ্যে

আসিত। সাময়িক মাসিক ও দৈনিক পত্রগুলিতেও তাঁহার খবর কিছু কিছু পাইতাম। দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ অপেক্ষাও সম্মান ও আদর তিনি নানা দেশে পাইতেছেন শুনিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইত যে রবীন্দ্রনাথের যে একটি ধারণা আছে, সেটি এবার আরও দৃঢ়তর হইবে। দেশের লোকে যে তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসে একথা তিনি যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেন না, এইবার ভাবিবেন বিদেশের লোকই তাঁহার সত্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। হতভাগ্য বাংলা দেশ এমন করিয়া ত নিজের ভালবাসা কোনোদিনই জানাইতে পারে নাই।

এই সময় কবিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মানিত সভ্য করার প্রস্তাবে প্রবীণ ও নবীন দলের ভিতর মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। প্রশান্তচন্দ্র তখন ঠিক আমাদের পাশের বাড়ীটিতে বাস করিতেন এবং তাঁহার ঘরটিই ছিল যুবকদের সকল তর্ক আলোচনার আড্ডা। কাজেই অন্তরালে থাকিয়াও ঝগড়াটা আমরা পূর্ণমাত্রায়ই উপভোগ করিলাম। মাঘোৎসবের সময় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহা এই ঝগড়ার কল্যাণে গড়াইতে গড়াইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত চলিল। তাহার পর রবীন্দ্র-

নাথ সম্মানিত সভ্য মনোনীত হইলেন, অধিকাংশ সভ্যের ভোটে। প্রবীণরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। বিশ্বের বরণীয় মহাপুরুষকে একটা সাধারণ সম্মান দেখাইতে ইঁহাদের কেন যে অত আপত্তি ছিল, তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারি না। ইহা লইয়া সমাজে ও অনেকের পারিবারিক জীবনেও কত যে ঝগড়াঝাঁটী হইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই।

অবশেষে ১৯২১-এর জুলাই মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিবেন, না বর্দ্ধমান হইয়া সোজা শান্তিনিকেতন চলিয়া যাইবেন, সেই হইল এক সমস্যা। অনেকে অনেক রকম বলিলেন। শেষে জানা গেল সম্প্রতি তিনি শান্তিনিকেতনেই যাইতেছেন। প্রশান্তচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্দ্ধমানে গেলেন রাত্রে। সোমবার সকালে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন, যে, কবি ভালই আছেন, কয়েক দিন পরে হয়ত কলিকাতায় আসিতে পারেন, ইত্যাদি। আমাদেরও একবার শনি-রবিবারে শান্তিনিকেতন যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল। তবে যাইব বলিলেই তখনই যাওয়া যায় না, স্কুলের ভাবনা ছিল, সংসারের ভাবনাও এখন ভাবিতে হইত। যাহা হউক,

২০শে জুলাই রবীন্দ্রনাথই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও কলিকাতার গোলমাল, বিবাদ-বিসংবাদ তাঁহার ভাল লাগিত না, তবু কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দের জন্য তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা এতখানি ছিল যে খুব বেশীদিন তাহাদের নিকট হইতে দূরেও তিনি থাকিতে পারিতেন না।

দিদি তখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে চিত্রাঙ্কন শিখিতে যাইতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গ ধরিলাম, কারণ জোড়াসাঁকোয় তখনই যাইতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। গাড়ী গিয়া অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ীর সামনেই দাঁড়াইল, কিন্তু দেখা গেল তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের বসিবার ঘরের বারান্দার সামনে বসিয়া আছেন। আমরাও সেখানে গিয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের সাদরে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন। বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ হইতে লাগিল।

চেহারার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিলাম। অত ঘোরাঘুরি সত্ত্বেও ইউরোপে গিয়া তিনি বেশ ভালই ছিলেন বোধ হইল।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সেই সময় কিছু একটা মন্তব্য কোনো প্রবন্ধে করিয়া থাকিবেন। কি যে তাহা এখন মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইউরোপ ভ্রমণের বর্ণনা অনেক করিলেন। তিনি যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে খুসি না হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল, খুসিই হইয়াছেন দেখিলাম। উহা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁহারই সম্মান বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই, প্রাচ্যের প্রতিনিধি স্বরূপেই তিন এই রাজোচিত সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিলেন, "আমার বিশ্বাস পশ্চিম যখনই আঘাত পেয়েছে, প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছে অনেক আশা ক'রে এবং প্রায়ই নিরাশ হয়েছে। আমিই কেবল এটা অনুভব করলুম, আর কেউ দেশের এটা বুঝলে না, ভারি দুঃখের বিষয়। ওখানে অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন যে আমি যে কাজ সুরু ক'রে এলুম, সেটাকে continue করতে পারে এমন যেন কাউকে আমি পাঠিয়ে দিই। আমার মনে হয় ব্রজেন্দ্র শীল মশায় বা অরবিন্দ ঘোষ গেলে চলতে পারে, কিন্তু একজনও যেতে রাজী হবেন কিনা সন্দেহ।"

বলিলেন ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা Continent-এই ভারতীয় ছাত্রেরা যথেষ্ট বেশী সমাদর পায়। জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব

সম্রাট্ দ্বিতীয় উইলিয়মের পুত্র ও কন্যার সহিত আলাপ হইয়াছে বলিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে একটি ফুলদানী উপহার দিয়াছিলেন, সেইটি দেখাইলেন। ইটালী আর স্পেনে এ-যাত্রা যাইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন।

গুরু অবনীন্দ্রনাথকে দেখাইবার জন্য দিদি নিজের আঁকা কয়েকখানি ছবি লইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ সবাই মিলিয়া সেইগুলি দেখার ধুম পড়িয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ ছবিগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ যে বড়ই সীতা সীতা লাগছে, ওকে বুঝি দাঁড় করিয়ে এঁকেছ ?" একটি ক্ষুদ্র বালিকা দোলনায় দুলিতেছে, সেই ছবিখানা দেখিয়া বলিলেন, "দোলনায় যে দুলছে এটি সীতা নয়, অন্য অনেক জায়গায়ই তুমি সীতাকেই এঁকেছ।" ছবিগুলির কোন্‌খানে যে আমার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল, তাহা কিন্তু আমি কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। দিদির আঁকার প্রশংসা হইল।

রথীবাবু এই সময় ইউরোপে তোলা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছবি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বসিয়া বসিয়া সেইগুলি দেখিতে লাগিলাম। আমরা শান্তি-নিকেতনে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম শুনিয়া বলিলেন,

"তবে ত আমি বড় অসময়ে এলুম। কিন্তু যাওয়াটা পাওনা রইল, না গেলে চলবে না।"

স্কুলের বেলা হইয়া যাইতেছিল, সুতরাং প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

২৩শে জুলাই আর-একবার জোড়াসাঁকোয় গেলাম। আমাদের বন্ধুমহলের কয়েকটি তরুণী তখন কবির দর্শন লাভের জন্য অতি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। পৌঁছিয়া দেখিলাম তাঁহার বসিবার ঘর পাগড়ীবাঁধা মূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে এখন সুবিধা হইবে না বুঝিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলাম। রথীবাবু তাঁহাদের ইউরোপ ভ্রমণের অনেক গল্প বলিলেন। Romain Rolland-এর সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের গল্প শুনিলাম। Rolland ইংরেজী জানেন না, আর একজনকে মাঝে বসিয়া দুইজনের কথা দুইজনকে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর হইতে উঠিয়া আসিলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলেন, "ও, তোমরা এসেছ? আচ্ছা একটু বোস, পাঁচ মিনিটের জন্যে। আমি এখুনি আসছি, কিছু মনে কোরো না।"

সত্যই পাঁচ মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিলেন ও প্রায় ঘণ্টাখানিক আমাদের কাছে বসিয়া গল্প করিলেন। তাঁহার কয়েকজন নাতবৌ এই সময় বেড়াইতে আসিলেন। নাতবৌদের পড়ানো যে কি ভয়ানক শক্ত ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ তাহাই বর্ণনা করিতে বসিলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাকি ভুল হইয়া যায়। বলিলেন, "ভেবো না ভুল শুধু আমারই হত। মনে করতে পার, বুড়োমানুষ না-জানি এর কি হয়েছিল; ওদেরও ঠিক সেই দশা! শেষে অবস্থা দেখে ওদের সরিয়েই নিল নাতিরা, পড়তে আর দিল না।"

অঙ্ক জিনিষটা সম্বন্ধে মতামত দেখিলাম তাঁহার বদলায় নাই। তিন-নয়ে সব ক্ষেত্রেই সাতাশ কেন হইবে, মাঝে মাঝে সাতাশের বদলে পঁয়তাল্লিশ কেন যে হইবে না, তাহা নাকি তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের স্কুল করার কথাও আর একবার উঠিল।

দেশ-বিদেশের অনেক কথাই হইল। শ্রীমান্ অশোককে লণ্ডনে না কোথায় দেখিয়া আসিয়াছেন বলিলেন, সে ভালই আছে। বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার কণ্ঠস্বরের অনেক রেকর্ড লওয়া হইয়াছে শুনিলাম। দিদির ছবি আঁকার কথায় বলিলেন, "বেশ পারবে।" আমার লেখার প্রসঙ্গও উঠিল, বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা বলতেই

এখন ভয় হয়, কখন দেখব গল্পের ভিতর চালিয়ে দিয়েছ। ওখানে এণ্ডারসন সাহেব তোমাদের কথা বলছিলেন, তোমাদের লেখা তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল। অনেক লিখে ফেলেছ দেখছি।"

অনেক নূতন ফোটোগ্রাফ দেখিয়া মনটা লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেদের জন্য এক-একখানা দাবী করিলাম। তিনি পুত্রের উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন, "ছবির উপর আমার কোনই অধিকার নেই।" Non-co-operation-এর কথা উঠিল, দেখিলাম প্রসঙ্গটা তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কথা ঘুরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নূতন ইংরেজী বইগুলি পাইয়াছি কিনা। 'নৌকাডুবি'র অনুবাদটা শুনিলাম তাঁহার একেবারেই পছন্দ হয় নাই।

গান শুনিতে চাহিলাম, বলিলেন, "সে-সব সুবিধে হবে না, শান্তিনিকেতনে না গেলে।" যাইব বলিয়া কথা দিলাম। বলিলেন, "সীতা, দেখ, প্রতিশ্রুত হলে ত?"

দাদার আসন্ন বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন, "শুনেছিলুম, কিন্তু ভরসা হচ্ছিল না বলতে, কি জানি ঠিক কিনা। যাক্, খুব ভাল হ'ল, আকৃশী কিছুতেই আর দুরধিগম্য হবে না।"

ইতিমধ্যে খবর আসিয়া পৌছিল যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। প্রতিমা দেবী এই সময় কবির অনেকগুলি ইউরোপে তোলা ফোটোগ্রাফ লইয়া আসিলেন। তাহার ভিতর হইতে একখানি চাহিয়া লইলাম। রঙীন ছবিও কয়েকটি দেখিলাম। ফোটোগ্রাফটিতে কবির স্বাক্ষর লাভের উপায় কি করা যায় ভাবিতে বসিলাম। অবশেষে প্রতিমা দেবীর অনুরোধে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়া ছোটভাইকে ডাকিয়া আনিতে রাজী হইলেন। এই ভদ্রলোককে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রায়ই দেখিতাম। লোকজন আসিলে তখনই আসিয়া বসিতেন এবং অমায়িকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের দাদা সে কথাটা খুব গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ খানিক পরে আবার এই ঘরে উঠিয়া আসিলেন। কলম একটা আর কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত জুটিল। কবি প্রথমে বলিলেন, "রেখে যাও, লিখে পাঠিয়ে দেব।" হাতছাড়া করিতে কেহই উৎসাহ দেখাইলাম না। তিনি বলিলেন, "অত অবিশ্বাস কোরো না।" আমি বলিলাম,

"আপনাকে ত অবিশ্বাস করছি না।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদৃষ্টকে ?" তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। নাম লিখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রথীর কাছে নিলে ?" আমি বলিলাম, "না, আমাদের স্বজাতীয়া যিনি, তিনি আমাদের উপর বেশী দয়া করবেন ভেবে তাঁর কাছেই চাইলাম।" কবি বলিলেন, "আমি ত জানতুম তোমাদের স্বজাতীয়ারাই তোমাদের দাবী কম রাখেন, আমরাই বরং বেশী রাখি।" আমি বলিলাম, "আপনার কাছেই ত প্রথম দাবী করেছিলাম, আপনি ত রাখলেন না।" হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইউরোপে ইংরেজীতে নাম লিখিয়া লিখিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, যে, অন্যমনস্কভাবেই যেন ইংরেজীতেই নাম লিখিয়া দিলেন। আবার পাশের ঘরে তাঁহাকে এই সময় চলিয়া যাইতে হইল, অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য। আমরাও ইহার পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দিন-দুই পরে আবার দেখা করিতে গেলাম। সেদিন বাহিরের অন্য অনেক লোক উপস্থিত থাকায় আমাদের সঙ্গে বেশী কথা বলিবার সুবিধা হইল না। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তার একখানা ছবির দরকার নেই ?"

আমি বলিলাম, "লোভ যথেষ্টই আছে।" রবীন্দ্রনাথ কি কারণে জানি না ধরিয়া লইলেন যে লোভটা দিদি সম্বরণ করিয়াছেন। বলিলেন, "ঐ গুণের জন্তেই ত শান্তাকে আমি admire করি।" এই admirationটা অবশ্য দিদির প্রাপ্য ছিল না।

অসহযোগের বন্যা তখন দেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে জিনিষটা বেশ কিছু বিচলিত করিয়াছে বোধ হইল। দেশে ফিরিয়াই তিনি এমন সব চিঠি পাইতেছিলেন এবং এমন সব কথা শুনিতেছিলেন যে তাঁহার মন খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। এমন কি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পও যেন আর তাঁহার মনে স্থির থাকিতেছিল না। তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত দুই-একজনের ব্যবহার তাঁহাকে এই সময় কঠিন আঘাত দিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথরা তিন ভাই এই সময় আসিলেন। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দর্শনপ্রার্থী একদল যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে বসিবার আর জায়গা হইবে না দেখিয়া আমরা অতঃপর উঠিয়া পড়িলাম। ইহার দিনকয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি আবার কলিকাতায়

ফিরিলেন। ১৫ই আগষ্ট National Council of Education-এর উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করিলেন। শুনিয়াছিলাম ইহা একটি অভিনন্দন-সভা, গিয়া কিন্তু অভিনন্দনের কিছু দেখিলাম না। লোকের ভীড় কমাইবার জন্যই বোধহয় টিকিট করা হইয়াছিল, অনেক কষ্টে ত টিকিট জোটানো গেল। গিয়া দেখিলাম মেয়েদের দিকে বিশেষ কেহই আসেন নাই, ছেলেদের দিকে প্রচুর ভীড়। ইন্‌ষ্টিট্যুট হলের নিয়ম মত ঠেলাঠেলি, মারামারি, জানলার শার্সি ভাঙা কিছুরই ক্রটি হইল না। তবুও ঝড়বৃষ্টির দিন বলিয়া লোক যত জুটিতে পারিত, পুরাপুরি ততটা জোটে নাই।

রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ না আসিয়া পৌঁছিলেন, ততক্ষণ সমানে গোলমাল চলিল, তিনি আসিবার পর অভ্যর্থনা-সূচক দুই-তিনটি চীৎকারের পর হল ঠাণ্ডা হইল। রবীন্দ্রনাথের এক পাশে বসিলেন সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর-এক পাশে সর্ আশুতোষ চৌধুরী। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভিনন্দনসূচক কয়েকটি কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সকলেই বোধহয় আমাদের মত কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া বাড়ী ফিরিল, কারণ অভিনন্দন দেখিবার আশা

লইয়া গিয়াছিল প্রায় সকলেই। যে বক্তৃতাটি কবি এখানে পাঠ করিলেন তাহা পরে "শিক্ষার মিলন" নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। ১৮ই আগষ্ট আলফ্রেড থিয়েটারে তিনি আবার বক্তৃতা করিলেন। সেদিনও কলিকাতায় ঘোরতর বর্ষা। স্কুল হইতে ফিরিয়া তারপর গেলাম, কাজেই খুব ভাল জায়গা পাওয়া গেল না। তবু চেষ্টা করিয়া এমন একটা জায়গায় বসিলাম, যেখান হইতে বক্তৃতা-মঞ্চটা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। হলটি বড়ই নোংরা লাগিল। এইদিন সভাতে মেয়েদের ভীড় প্রচুর হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়। তিনি বক্তা আসিয়া পৌছিবারও বেশ খানিক পরে আসিলেন। আসিয়াই ছুটিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন।

প্রথমে গান হইল, "দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী"। গানটি খুব জমে নাই। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। এবার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ নয়, মুখেই বলিলেন। বলিতে বলিতে শেষের দিকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, মুখ দিয়া যেন অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষেও গান হইল, "জনগনমন-অধিনায়ক।" বক্তৃতান্তে

বাহিরে আসিয়া অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধটি ছোট পুস্তিকাকারে এখানে বিক্রয় করা হইতেছে দেখিলাম।

এইবার আসিয়া তিনি একটানা কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন। ঐ বক্তৃতা যেদিন হইল তাহার পরের শনিবারে বোধহয় দুই-তিনজন সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে গেলাম কবিসন্দর্শনে। গিয়া শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া আছেন এবং প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে। তাঁহারই ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহার পর কবিকে দেখিতে গেলাম। তিনি ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এস গো।" সেইখানেই ঢুকিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। আরও দুই-একজন অভ্যাগত সেখানে বসিয়াছিলেন। শুনিলাম সকালে মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কবি নাকি মহাত্মাজীকে বলিয়াছেন, "আপনি আসিবেন জানিলে, একটা খদ্দরের পোষাক জোগাড় করিয়া পরিয়া থাকিতাম।" মহাত্মা গান্ধী শুনিয়া খুব খুসি হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদের ভোট দেওয়ার অধিকার লইয়া রবীন্দ্রনাথ খানিক রসিকতা করিলেন। দিদিকে বলিলেন, "মহিলা

মজলিশের সুবিধে নিয়ে খুব কড়া কড়া কথা লিখে নিচ্ছ।” কলিকাতায় একটা অভিনয় করার কথা চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা যে “শারদোৎসব” হয়, অন্য দুই-একজন পরামর্শ দিলেন “বিসর্জ্জন” করিলে ভাল হয়। “অপর্ণা” কাহাকে সাজাইলে ভাল হয়, তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইল। হঠাৎ আমাকে অপর্ণা সাজাইবার কথা তাঁহার কেন মনে হইল জানি না। এই প্রস্তাবে আমি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলাম, “অপর্ণার চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী।” রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “তাতে কি? আমি কি ক'রে কবিশেখর সেজেছিলুম?” সেখানে উপস্থিত এক যুবক পরম গম্ভীরভাবে বলিলেন, “Sarah Bernhardt ত ষাট বছর বয়সে জুলিয়েট সেজেছিলেন।” বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বা Sarah Bernhardt-এর সমকক্ষ নিজেকে মনে করিবার আমার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং আমার ভয়টা কাটিল না। সত্যই ভয় পাইতেছি দেখিয়া কবিও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি কবিকে বলিয়াছেন যে হিন্দুসমাজ তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, “তাহলে

আপনিও আমার দলে আসছেন।” ‘ঘরে বাইরে’, উপন্যাসখানির সমালোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, “বিমলা যে স্বামীর টাকা চুরি ক’রে অনুতাপ করতে বসল, এ আপনি ঠিক লেখেন নি। এ কি আপনি মেমের মেয়ে পেয়েছেন যে অনুতাপ করবে? হিন্দুর মেয়ে বলবে, আমার স্বামীর টাকা চুরি করেছি, বেশ করেছি।” পূর্ব্বোক্ত যুবক মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “ঠিকই ত। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও এই দেখেছি, তাঁরা অনুতাপ একেবারেই করেন না।” কবি নাকি শরৎচন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নিখিলেশকে বিমলা তখন ঠিক স্বামী-ভাবে দেখিতে পারিতেছিল না।

ইহার পর অন্যরা উঠিয়া গেলেন, আমরা তিন-চার জনই বসিয়া রহিলাম। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিতে বসিলেন যে তিনি নিতান্তই দায়ে না পড়িলে কখনও লেখেন না। এই সূত্রে “চিরকুমার-সভা” কেমন করিয়া লেখা হইল তাহার ইতিহাস বলিয়া গেলেন। ‘ভারতী’র সম্পাদিকা নাকি হঠাৎ ছাপাইয়া দিলেন যে “আগামী মাসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সামাজিক প্রহসন লিখিবেন।” পড়িয়া ত কবির চক্ষুস্থির। তিনি ভাগিনেয়ীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন, “কেন তুই আমাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন

দিলি, আমি লিখব না।" কিন্তু শেষ অবধি লিখিতেই হইল, ভাগিনেয়ীকে বিপন্ন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কি লিখব কিছু ঠিক ছিল না। অক্ষয় ব'লে একজন মানুষকে খাড়া ক'রে লিখতে সুরু করলুম, যদিও আজও জানি না সেটা সামাজিক প্রহসন হয়েছে কি না।" আমি বলিলাম, "ভাগ্যে তিনি আপনাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আমিও বাবাকে বলব 'প্রবাসী'তে ঐ রকম একটা বিজ্ঞাপন দিতে।" রবীন্দ্রনাথ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, তোমার বাবাকে ব'লো না।"

"গোড়ায় গলদ" লইয়াও একটু গল্প হইল। স্বীকার করিলেন অন্ততঃ একটা কবিতার ছন্দ জীবনে তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাদম্বিনীর নামে লেখা নিমাইয়ের সেই প্রসিদ্ধ কবিতাটি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ঠাট্টার ইংরেজী হয় না?" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, ও জিনিষ ওরা পাবে কোথায়? Sister-in-law ওদের নেই।"

ইতিমধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল যে তাঁহার খাবার দেওয়া হইয়াছে। আমরা উঠিয়া পড়িলাম। আর একটু-ক্ষণ প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়া গল্প করিলাম। বাড়ী ফিরিবার আগে কবির নিকট বিদায় লইতে গেলাম, তিনি

তখন এণ্ড্রুজ সাহেবকে লইয়া খাইতে বসিয়াছেন। সেই-খানেই গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

মাঝে একদিন সঙ্গীত সঙ্ঘের রাখী-সম্মিলন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট্‌ হলে আর-একটি সভা হইল। এখানেও টিকিট কিনিয়া যাইতে হইল। কবির নামেই এমন নিদারুণ ভীড় হইত, যে, কর্ম্মকর্ত্তারা আর কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না ভীড় কমাইবার, টিকিট করা ছাড়া। অবশ্য ইহাতেও কোনো কাজ হইত না। আমাদের নানা কারণে গিয়া পৌছিতে একটু দেরি হইল। গিয়া তাহার পর আর বসিবার জায়গা খুঁজিয়া পাই না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের স্থান-গুলি আবিষ্কার করিল, গিয়া ত বসিলাম।

প্রোগ্রামের গোড়ায় ছিল ছেলেমেয়েদের গান-বাজনা, মাঝে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন দেওয়া ও তাঁহার বক্তৃতা, শেষে ওস্তাদদের গান-বাজনা। মেয়েদের গানের মধ্যে শ্রীমতী মালতী বসু ও শ্রীমতী লীলা গুহের গান খুব ভাল হইল।

অতঃপর যবনিকা উঠিল ও রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল। ছোট একটি মেয়ে আসিয়া তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিল ও হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। প্রতিভা দেবী একটি অভিনন্দন-

লিপি পাঠ করিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য বলিতে উঠিলেন। আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া যে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার তাঁহার বিশেষ কিছু নাই। সেই বিষয়েই যদিও অতঃপর অনেক ক্ষণ বলিয়া গেলেন। সঙ্ঘের ছাত্রী ও প্রতিষ্ঠাত্রীদের অন্তঃকরণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগল পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক্, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। ওস্তাদদের গান-বাজনা শুনিতে শ্রোতার দল বেশী আগ্রহ দেখাইলেন না। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইতেই অধিকাংশ লোক বাহির হইয়া গেল। আমরা অবশ্য বসিয়াই রহিলাম, খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে, খানিকটা ভীড়ের ঠেলা এড়াইবার জন্য। ওস্তাদদের ভিতর অনেকেই খুব ভাল বাজাইলেন। আফ্‌তাব উদ্দীন্ নামক একজন ওস্তাদ বাঁশী বাজাইয়া প্রচুর সাধুবাদ পাইলেন।

এতকাল শান্তিনিকেতনেই 'বর্ষামঙ্গল' হইত, এবার স্থির হইল কলিকাতায় হইবে। মহোৎসাহে রিহার্সাল আরম্ভ হইল। একদিন গেলাম রিহার্সাল দেখিতে। গিয়া দেখি এক ঘরে নলিনী দেবী এবং অরুন্ধতী সরকারের নেত্রীত্বে মেয়েরা গান শিখিতেছেন, আর-এক ঘরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের গান শিখাইতেছেন।

মেয়েদের ঘরেই বসিলাম। খানিক পরে ছেলের দলকে সঙ্গে করিয়া কবি এই ঘরেই আসিয়া বসিলেন। তখন গানটা জমিল ভাল, একটু প্রতিযোগিতাও হইল। আমরা শেষ পর্য্যন্ত বসিলাম না, খানিক পরে চলিয়া আসিলাম।

কয়েক দিন পরে আবার গেলাম। সেদিন দেখি বিপুল মজলিশ। শান্তিনিকেতনের গানের দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নাটোরের মহারাজা সপরিবারে উপস্থিত, দর্শকও অনেক। তাহার ভিতর কয়েকজন সাহেব এবং জাপানীকেও দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথের বসিবার ঘরেই প্রথমে গান আরম্ভ হইল, তাহার পর জায়গার টান পড়াতে বিচিত্রার হলে উঠিয়া যাওয়া হইল। গানের সঙ্গে পিয়ানো, সারেঙ্গী, এস্রাজ প্রভৃতি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজিল। মাঝে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আসিয়া একবার মিনিটখানিকের মত ঘুরিয়া গেলেন। গান সেদিন সত্যই জমিল খুব। আসল দিনেও এতটা ভাল হয় নাই।

ইহার পরদিনই আবার রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে "সত্যের আহ্বান" নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। ভাদ্র মাস, একপালা বৃষ্টি হইয়া গেল। অনেক কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করিয়া ত গিয়া

উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শান্তিনিকেতনের বালিকা গায়িকার দল সদলে আসিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের টিকিট ছিল কিছু পিছনের লাইনের, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাহাদের পিছনে বসিতে দিলেন না, বলিলেন, "না না, ওদের এখানেই কোথাও দাও, ছেলেমানুষ ওরা কোথায় যাবে পিছনে ?" তাহারা সামনেই বসিল।

বক্তৃতার আরম্ভে বা শেষে গান-টান কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সময় হইবামাত্র মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন। অসহযোগ-আন্দোলনের কিছু কড়া সমালোচনা ছিল ইহার মধ্যে, শ্রোতাদের ভিতর হইতে দুই-তিনবার রব উঠিল, "গান্ধী মহারাজকি জয় !" কিন্তু একটু ক্ষীণভাবেই, বিশেষ জোর যেন আপত্তিকারীরা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সে-সব যেন গ্রাহ্যই করিলেন না।

'বর্ষামঙ্গলে'র প্রথম অধিবেশন হইল ইহার পরের দিনই। সেদিনও সকাল হইতে সহস্র ধারায় বর্ষণ আরম্ভ হইল, বিকালের দিকে একটু ধরিল তাই রক্ষা। অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়াও একটু আগে যাইতে পারিলাম না, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় গিয়া পৌঁছিলাম। বিচিত্রা ভবনের পিছন দিকে যে ভূমিখণ্ড আছে, সেই

খানেই মণ্ডপ বাঁধিয়া আসর প্রস্তুত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ গায়ক-গায়িকাদের মধ্যেই বসিয়াছিলেন। আমাদের দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন। আমাদের সামনে এক সার মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কোন্ দুঃখে গান শুনিতে আসিয়াছিলেন জানি না। সারাক্ষণ তাঁহাদের ভ্যান্‌ভ্যানানির জ্বালায় আমরাই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

প্রথম দিন গান তেমন ভাল হইল না, দুই-একটি বাদে। মৃদঙ্গের তাল সহযোগে কবির কবিতা-পাঠ আমরা খুব উপভোগ করিলাম। তাঁহার গলা সেদিন একটু ভাঙিয়া গিয়াছিল। গান-বাজনা শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ মণ্ডপের ভিতরেই বসিয়া রহিলাম। এত লোকের ভীড় হইয়াছিল যে বাহির হইবার পথ পাইতেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল।

পরের দিন আবার যাইব তাহা প্রথমে স্থির ছিল না। কিন্তু দুই-একটি নূতন গান ও আবৃত্তি হইবে শুনিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আবার গেলাম। এদিন গান এবং আবৃত্তি প্রথম দিন অপেক্ষা অনেক ভাল হইল, কিন্তু অনেক পিছনে বসিয়াছিলাম বলিয়া দেখাশুনার একটু ব্যাঘাত হইল। নূতন গানও একটি হইল, যাহা আগের

দিন হয় নাই। "বাদল মেঘে মাদল বাজে" গানটি সকলের একেবারে মনোহরণ করিয়া লইল। এদিনও বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত হইল।

আরও একবার হইবে শুনিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া সদলবলে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

সেপ্টেম্বরে শোনা গেল তিনি আবার কলিকাতায় আসিবেন। এখানে "শারদোৎসব" অভিনয় হইবে, ছাত্র-সমাজ হইতে কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হইবে, রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতি হইবেন, আরও কত কি। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না, তিনি কলিকাতায় আসিলেনই না। শান্তিনিকেতনেই "শারদোৎসব" অভিনয় হইল। আমরাই চলিলাম সেখানে।

৫ই কিম্বা ৬ই অক্টোবর রওনা হওয়া গেল। দল খুব বড় ছিল না, প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ীর তিন-চারজন, আমরা দুই বোন, এবং শ্রীমতী হেমবালা সেন, এই কয়জনের নাম মনে আছে। যাইবার সময় কিভাবে স্টেশনে পৌছানো যাইবে তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল। যাহা হউক, সময় মত গিয়া পৌছিলাম কোনোমতে। ট্রেনে মেয়েদের

কামরাটা খালিই পাওয়া গেল, খুব আনন্দে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। দেড় বৎসরের কাছাকাছি হইল আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার সেই চির-পরিচিত চির-আনন্দের নিকেতন দেখিতে পাইব মনে করিয়া মন অধীর আগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বোলপুরে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে অভ্যর্থনা করিতে অনেকেই আসিয়াছেন। গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র চাপাইয়া হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। একদল মান্দ্রাজী ছেলে স্কুলে যাইবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারাও চলিল আমাদের সঙ্গে।

আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ঠিক যে সুরটি হৃদয়বীণায় বাজিবে আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যেন বাজিল না। বহুবার এখানে অতিথিরূপে আসিয়াছি, বহুদিন এখানে ঘরের মানুষের মত ছিলাম। এবার নিজেকে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলিব তাহাই যেন ভাবিয়া পাইলাম না। বাহিরের আয়োজন আগের মতই ছিল, সেখানে ত্রুটি ছিল না, বুঝিলাম আমারই দৃষ্টি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যে বাড়ীটায় এতদিন কাটাইয়া গিয়াছিলাম, সেটার দিকে আর-একবার চাহিয়া দেখিলাম। ইহারই ভিতরে অন্য মানুষ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে, দেখিয়া মনটা

কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মুলুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

অতিথি হইয়া আসিয়াছি, অতিথিশালার বাড়ীতেই গিয়া উঠিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল আমারই কোন বিস্মৃত পূর্ব্বজন্মের মধ্যে যেন জাগিয়া উঠিয়াছি। সবই চেনা, সবই জানা, কিন্তু সবই যেন একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আবার দেহলীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ীটি এখন "কলাভবনে" পরিণত হইয়াছে। সেই ছোট ছাদটিতে আবার গিয়া উঠিলাম, কবি সেইখানেই বসিয়াছিলেন, কাছে গিয়া প্রণাম করাতে হাসিয়া বলিলেন, "কি গো সব রবাহূতের দল।" সেইখানেই বসিলাম। এতগুলি মেয়ে, আমরা ঝগড়া না করিয়া একসঙ্গে থাকিতে পারিব কি না, কবি সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহা হইল ঠিক বিশ্বভারতীর আদিপর্ব্ব। আশ্রমের ব্যবস্থাদির ইহারই ভিতর খানিক খানিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম। কবির আর অবসর বলিতে কিছুই নাই। যাঁহারা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া গায়ের জোরে তাঁহার

কাছে গিয়া বসিতে পারিতেন তাঁহারাই তাঁহার সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন, অন্যরা বঞ্চিতই হইতেন। আগেকার সেই বৈকালিক গান-গল্পের আসর আর তেমন জমিত না। যে দুই-তিন দিন ছিলাম তাহার ভিতর প্রথম দিন মাত্র মিনিট-কয়েকের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন সকালে আমরা গেলাম দেহলীতে দেখা করিবার জন্য। কতকগুলি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, পরে এগুলি "শিশু ভোলানাথ" বইটিতে স্থান পাইয়াছিল।

'শারদোৎসব' অভিনয় ভালই লাগিল, তবে অনেকে বলিলেন আগের মত ভাল অভিনয় হয় নাই। "সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে," গানটি খুব জমিয়াছিল। পূর্ব্ব-পরিচিত ও পরিচিতা যাঁহারা ছিলেন, সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিলাম। দুই-চারটি নূতন শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে দেখিলাম। যতদূর মনে পড়ে কবি একদিন বিকালে এইবারেই তাঁহার নবরচিত নাটক, "মুক্তধরা" পড়িয়া শুনাইলেন। ভৈরবপন্থীদের গান তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল। নাটক পাঠ শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল যে উহা কলিকাতায় অভিনয় করা যায় কি না।

রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা ফিরিলাম। পূজার ছুটিটা এলাহাবাদে কাটাইয়া নবেম্বরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এই সময় সমাজ-পাড়ায় ছেলেমেয়েদের একটি ক্লাব স্থাপিত হইল, তাহার নাম হইল The Social Fraternity। সকলে মিলিয়া আমাকে তাহার সম্পাদিকা নির্ব্বাচন করিলেন। কাজ যাহা থাকিত তাহা অবশ্য সহকারী সম্পাদক সুশোভনচন্দ্র সরকারই করিতেন, নামটাই শুধু আমার থাকিত। প্রশান্তচন্দ্র ৺দেবীপ্রসন্ন চৌধুরীর বড় বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহারই ছাদে ক্লাবের অধিবেশন হইত। ঝড়বৃষ্টি হইলে নামিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে বসা হইত।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার কাজের যা তালিকা পাওয়া গেল, তাহাতে আশা করিতে পারি নাই যে তিনি আবার আমাদের দেখা দিবেন। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, ২৮শে ডিসেম্বর একবার আমাদের বাড়ী আসিলেন। তখন যে বড়দিনের ছুটি তাহা খেয়াল না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল ফাঁকি দিয়েছ কেন?"

বিশ্বভারতীর গল্প অনেক করিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার আবার শরীর খারাপ হইয়াছে দেখিলাম।

ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার যে দীপ্তিময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আবার ম্লান হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, "আমি তোমাদের বিশ্বভারতীর ছাত্রীরূপে চাই। যে কোনো condition-এ আসতে চাও, আমি রাজী।" Prof. Sylvain Levi ও একজন অষ্ট্রিয়ান মহিলা চিত্রকর তখন আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাইয়া দেখিলাম কবি অত্যন্ত খুসি হইয়াছেন। Prof. Levir অত ভাল ভাল বক্তৃতাগুলি অনেকাংশে অপব্যয়িত হইতেছে বলাতে আমি বলিলাম, "মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে যদি তিনি বলেন ত বেশ হয়।" রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শুনলে বেশ হয়।"

তখন দেশময় অসহযোগের জোয়ার আসিয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা জেলে যাও নি যে?"

শুনিলাম তিনি কলিকাতা হইতে কালিগ্রাম যাইতেছেন, দিন-সাত পরে ফিরিবার পথে আবার কলিকাতায় আসিতেও পারেন। যাইবার সময় বলিলেন, "যাই হোক, পড়তে যাওয়া যদি স্থির কর ত একখানা আবেদন ক'রে দিও।" কিন্তু মায়ের অবস্থা তখন এমন যে তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ার কথা কল্পনাও করা চলে না।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমরা কর্ণওয়ালিস্

ষ্ট্রীটের বাড়ী ছাড়িয়া ৮ নং রামমোহন রায় রোডে উঠিয়া গেলাম। বন্ধুবান্ধব, ক্লাব সব হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম। এই বাড়ীতে আসিয়া দাদার বিবাহ হইল।

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। 'মুক্তধারা' পড়িয়া শুনানো হইবে শুনিলাম। বিচিত্রার উপরের ঘরে তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেছিলেন, তাই পড়িবার স্থান স্থির হইল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী। সেইখানেই গেলাম। বসিবার ঘরে আমাদের বসাইয়া গগনবাবু বলিলেন, "বসুন আপনারা, আরম্ভ হলেই খবর দেব। অনেক পরে পড়া আরম্ভ হইল। পাঠান্তে নাটকটি অভিনয় করার কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথের নিয়ম ছিল আমাকে সামনে পাইলেই অভিনয়ের ভিতর একটা কিছু সাজিতে বলা। এবারেও বলিলেন, "সীতা, অম্বা সাজবে ?" আমি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলাম। বলিলেন, "তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হল না।" পরদিন আমাদের Social Fraternity-র অধিবেশনে তাঁহাকে একবার পদধূলি দিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বলিলেন আসিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা ত মহাখুসি। সমস্ত ছাদ আলপনা দিয়া, বাতি দিয়া সাজানো হইল, খাওয়ানোর আয়োজন

হইল, লোকজনও আসিল প্রচুর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর আসেনই না। দুই-চার জন যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া নিজেই খবর দিলেন যে তিনি এখানে আসা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছিলেন, প্রশান্ত তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া আনিয়াছে। যদিও তাঁহার সঙ্গে খুব বেশী কথা বলিতাম না, তবু এমন ব্যাপারে তাঁহাকেও দুই-চারিটা কথা শুনাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উপরে সবাই গিয়া বসা গেল। কবি আবার তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে চান না, রসিকতা করিয়া আমাকে সেখানে বসিতে বলিলেন। তাহার পর "মুক্তধারা" নাটকটি আর-একবার পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সেদিন খাওয়ানোও গেল না। যে পাত্রে তাঁহার জন্য খাবার আনিয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা কিছু লইতে বলায় বলিলেন, "বেশ ত সাজানো রয়েছে, একটা কিছু তুললেই দেখতে খারাপ হয়ে যাবে।"

একটুক্ষণ গল্প করিয়া, এবং বেশ কিছুক্ষণ শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া তিনি রাত্রি ন'টা আন্দাজ যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

পরদিনই শান্তিনিকেতন চলিয়া গেলেন, যতদূর মনে পড়ে।

মার্চ্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। ১৬ই মার্চ্চ বাবার কাছে শুনিলাম, কবি বিকালে আসিবেন বলিয়া খবর দিয়া পাঠাইয়াছেন। বিকালে অবশ্য আসিলেন না, আসিতে রাত হইয়া গেল। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "খুব জমিয়ে ঘরকন্না করছ তা দেখেই বুঝতে পারছি।" তিনতলায় বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। খবর দিলেন যে শীঘ্রই তিনি নেপাল যাইতেছেন, সেখানে অনেক অমূল্য বৌদ্ধ পুঁথি আছে, সেইগুলির নকল লইবার অনুমতি পাইতে পারেন, এই আশায়। যাওয়া অবশ্য তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত হয় নাই।

আমার নববিবাহিতা ভ্রাতৃজায়াকে তিনি তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু লেখা ছিল না। বধূঠাকুরাণী এই সুযোগে বইগুলি উপস্থিত করিলেন, লিপিবদ্ধ আশীর্ব্বাদ পাইবার আশায়। তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল না। লোকে যেমন অবলীলায় নাম সহি করে, তেমনি অবলীলায় তিনি কয়েক লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন।

তাহার পর আরম্ভ করিলেন এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবের গল্প। ভদ্রলোকের নাকি আত্মপর জ্ঞানটা একেবারেই নাই। এলাহাবাদে নাকি একবার গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র কি একটা কাজে যাইতে হয়। চারিদিকে তাকাইয়া সাহেব যানবাহন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, শুধু দেখিলেন একখানা cycle দেওয়ালের গায়ে ঠেসানো আছে। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে জানা গেল যে সেখানা একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর এবং তিনি বিন্দুমাত্রও খুসি হন নাই। সাহেবের জিনিষ অন্য কেহ লইলেও তিনি আপত্তি করেন না, তবে জিনিষ নাই বিশেষ কিছু এই যা দুঃখ। দেওয়ালে আমার একখানা ছবি ঝুলিতেছিল, দিদিই সেখানা আঁকিয়াছিলেন। বলিলেন, "বেশ চেনা যাচ্ছে, শান্তার কীর্ত্তি ত?" "মুক্তধারা" নাটকটি বাবাকে দিয়া গেলেন, "প্রবাসী"তে ছাপিবার জন্য। একটি নূতন "কথিকা" লিখিয়াছিলেন, সেটা আমার হাতে দিয়া গেলেন। ইহা পরে "লিপিকা"য় স্থান পাইয়াছিল। সুকুমারবাবু তখন অত্যন্ত পীড়িত, খানিক পরে কবি তাঁহাকে দেখিতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন আমরা জোড়াসাঁকোয় গেলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে। দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম আমারই এক

আত্মীয় যুবক সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "রবিবাবু কোথায়?" তিনি বলিলেন, "পাশের ঘরে, এক সাহেবের সঙ্গে গল্প করছেন।" পাশের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম কবি আছেন বটে, তবে কোনও সাহেব ত চোখে পড়িল না। আমাদের দেখিয়া বসিবার ঘরে বসিতে বলিলেন, এবং নিজেও সেখানে আসিয়া ঢুকিলেন মিনিট-পাঁচ পরে।

আমায় বলিলেন, "তোমার চাকরি করা কি আর থামবে না?"

আমি বলিলাম, "থামতে ত পারে, কিন্তু তারপর করব কি?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর কি কোথাও চাকরি নেই? আমার ওখানে যাওয়া যায় না?"

এই বিষয়েই খানিক কথা চলিল। যাইবার যে উপায় নাই তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু সব কথা বলিবারও উপায় ছিল না। যাহা বলিলাম তাহার অর্থ খুব পরিষ্কার হইল না। আমাদের যাওয়াটা যে তিনি সত্যই চান কি না, সেই বিষয়েই যেন সংশয় প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সত্যিই বলছি, আমি অন্তরের সঙ্গে চাই যে তোমরা একজন এস।"

বলিলেন, "সীতা খুব শক্ত মানুষ, গেলে কাজ করতে পারবে।" বাল্যকাল হইতে আমাকে দেখিয়াও এমন ধারণা তাঁহার কেন হইয়াছিল জানি না।

এই সময় এণ্ডুজ সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাদের বধূ-ঠাকুরাণীকে তিনি বিলক্ষণই চিনিতেন, তবে সবে নাম-পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাই রবীন্দ্রনাথ মহা ঘটা করিয়া আবার তাঁহাকে সাহেবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন, "Allow me to introduce Mr. Andrews, Mrs. Chatterjee, Miss Chatterjee" এণ্ডুজ সাহেব রসিকতাটা উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কবি বলিলেন নেপালে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারে নাই, কিন্তু Levi-দম্পতি তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছেন। এণ্ডুজ সাহেবকে তিনি অনুরোধ করিলেন যেন রেলওয়ে strikeটা তিনি আরও একটু ভালভাবে বাধাইয়া দেন, তাহা হইলে কাহাকেও আর যাইতে হয় না। দুইজন দেশপূজ্য মহামান্য ভদ্রলোক আধ ঘণ্টা ধরিয়া এমন ভাবে হাস্যপরিহাস করিয়া গেলেন যে সে এক দেখিবার জিনিষ। দিদি এই সময় তাঁহার একখানি ফোটোগ্রাফ চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সীতার ছবি যেমন এঁকে নিয়েছ, তেমনি আমারও এঁকে নিও।

আমি বরং বসতে রাজী আছি। তোমাদের বৌকে ধ'রে এক নিমন্ত্রণ আদায় করা গেল, সেই দিন বসব।" নিমন্ত্রণ আদায়টা অবশ্য তিনি বিশেষ করেন নাই। আমার ভ্রাতৃজায়াকে একবার বলিলেন, "নূতন সংসারে গেলুম, অথচ মিষ্টিমুখ করালে না, এমন দুঃখ হ'ল আমার।" আমরা তিন জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। পরের বার যখন আসিবেন তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন বলিলেন। বধূঠাকুরাণী তাঁহার লেখার একটি পাণ্ডুলিপির জন্য আবেদন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি ভাল রকম behave কর ত তোমায় দেওয়া যাবে একটা কিছু।"

Miss Faering সেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই পৌষের মেলায় কবির হাতের লেখা একটি কবিতা ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবীই বোধহয় কবিতাটির চারি ধারে রঙীন design করিয়া দেন, বিক্রয়লব্ধ অর্থ কি একটা কাজে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে গল্প শুনিলাম Miss Faering সম্প্রতি সেইটি বিক্রয় করিয়া তাঁহার বাগ্‌দত্ত পতির পড়াশুনার খরচ চালাইবার সাহায্য করিতেছেন। বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে ভদ্রমহিলা কবির কাছে অনুমতি চাহিয়া পাঠান। ডেন্‌মার্কের যে সাহিত্য-

পরিষদ সেটি ক্রয় করেন, তাঁহারাও নাকি রবীন্দ্রনাথকে একটা সার্টিফিকেটের জন্য লেখেন, জিনিষটা খাটি না মেকি তাহা জানিয়া লওয়াই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কবি বলিলেন, "কি আর করি অনুমতি না দিয়ে? কবির লেখা যদি মিলন সাধন করে, তা হলে ত আপত্তি করবার কিছু নেই।" এই সুযোগে আমাকেও খানিক ঠাট্টা করিয়া লইলেন। বলিলেন, "সীতা, তোমার কাছে যেসব manuscript আছে, তা যদি দরকার প'ড়ে বিক্রী কর ত আমার কোন আপত্তি নেই। সব জমা ক'রে রাখ, ওগুলোর দাম ক্রমেই বাড়বে। তবে বিক্রী করলে আমাকে কমিশন্ দিতে হবে তা ব'লে রাখ্‌ছি।" আমার ভ্রাতৃজায়াকে অনেকবার করিয়া বলিলেন, "তোমার আর manuscript-এর কোনই দরকার নেই, সীতার বরং আছে।"

খানিক পরে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। সেদিনও আমাদের ক্লাবের অধিবেশন হইতেছিল। প্রশান্তচন্দ্র জোড়াসাঁকোয় গিয়াছিলেন কবিকে সেইখানে লইয়া আসিবার চেষ্টায়, তবে তিনি কতটা কৃতকার্য্য হইবেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। ছাদের এধারে ওধারে

ছড়াইয়া সকলে আমরা নানা রকম আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত বলিলেন, "এই যে রবীন্দ্রনাথ আসছেন।" সকলে ব্যস্ত হইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম সত্যই তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিলাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। উপরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানকার সভাপত্নী না ?"

প্রথমে এমনিই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। টম্‌সন্ সাহেব কবির রচনাবলীর একটা বিচিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহারই সমালোচনা আরম্ভ হইল। বাংলা ও ইংরেজী ভাষার tradition-এর প্রভেদ সম্বন্ধে কবি কিছু বলিলেন। অতঃপর গান শুনিবার জন্য আবেদন করা গেল। তাঁহার গলা সেদিন ভাল ছিল না, তবু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "গান আজকাল আর মনে থাকে না সেই ত মুস্কিল।" কয়েকটি গানই গাহিয়াছিলেন, তাহার ভিতর একটির কথা মনে পড়ে, "এস হে ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।"

মাঝে একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন বাড়ী গিয়া এণ্ড্রুজ সাহেবকে খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু আমরা তখনই তাঁহাকে ছাড়িতে একেবারেই রাজী

ছিলাম না। গানের পর গুটিকতক কবিতা পড়া হইল, তাহার পর তিনি একরকম জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "এ রকম দস্যুবৃত্তি করা অন্যায় সীতা। আমি নিতান্ত ভালমানুষ, তাই সব সহ্য ক'রে যাই।"

মার্চ্চ মাসে তিনি যখন আসেন তখনই তাঁহাকে এক-দিন আমাদের বাড়ী আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বৃহস্পতিবারে বোধ হয় Fraternityর মিটিং গেল, আমরা শনিবারে তাঁহার কাছে চলিলাম কবে তিনি আসিতে পারিবেন তাহা জানিবার জন্য। মঙ্গলবারে তাঁহাকে আনিতে পারিলে আমি নিজে খুব খুসি হইতাম, কারণ সেই দিনটা ছিল আমার জন্মদিন। কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে সেই দিনটায়ই তিনি চলিয়া যাইতেছেন।

শনিবারে গিয়াই দেখিলাম, ঘরভর্ত্তি লোক। সেই-খানেই বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, যদিই একটু কথা বলিবার ফাঁক পাওয়া যায়। খানিক পরে কয়েকজন ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমাকে আবার শান্তি-

নিকেতনে যাইতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "চল না, বেশ সীতার বনবাস হয়ে যাবে।" ইহার আগে একদিন নিজেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে আমি বেশ শক্ত মানুষ। আজ দেখিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমি বলিলাম, "আমি মোটেই শক্ত মানুষ নয়।" কবি বলিলেন, "ঠিক ত? না নিজের গুণ প্রচার করার জন্যে বলছ।"

নিমন্ত্রণের কথাটা পাড়া গেল। প্রত্যেক দিনই তাঁর সভা-সমিতি, নানা কাজ। অবশেষে নিজেই সময় স্থির করিয়া লইলেন, বলিলেন, "রবিবার ৫॥টায় যাব। সেদিন বিশ্বভারতী সঙ্ঘের সূচনা আছে, তা তারা না হয় আধ ঘণ্টাখানিক ব'সে থাকবে।" নিজে যে খোঁটা দিয়া আমাদের কাছে নিমন্ত্রণ আদায় করিয়াছেন, সে কথাটা একটু শুনাইয়া দিলেন। রবিবার সকাল হইতেই দুই বোনে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজনে লাগিলাম। আমাদের বাড়ী আসা তাঁহার নূতন কিছু নয়, কিন্তু এবার নিজেরা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি বলিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিলাম। যদিই এমন মহামান্য অতিথির উপযুক্ত সম্মান না করিতে পারি।

৫॥টায় আসিবেন বলিয়াছিলেন তবে ৫টার মধ্যেই কবি

আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে দেখিলাম এণ্ড্রুজ সাহেব। আমি নীচে নামিতে না নামিতেই তাঁহারা উঠিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "সীতা, আমি সুদ্ধ-সুদ্ধ এসেছি, এতে আশা করি রাগ করবে না।"

আমাদের ছোট বসিবার ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ওদের সব বসিয়ে রেখে এলুম, সবাই মহা ব্যস্ত জানতে কতক্ষণে ফিরব, বললুম, 'ভদ্রমহিলার নিমন্ত্রণ কি আর সাড়ে ছ'টার আগে সেরে আসতে পারব?'"

এণ্ড্রুজ সাহেব উঠিয়া ঘরের বইয়ের আলমারিগুলি দেখিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "Sita, I warn you never to lend any books to Mr. Andrews।" দুই-তিন বার এই warning দেওয়াতে সাহেব বলিলেন, "This is too bad Gurudev।" বলিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

বাবা ও দিদি আসিয়া বসিলেন, আমি কি একটা কাজে ঘরের বাহিরে গেলাম। কয়েক মিনিটের জন্য ফিরিয়া আসিতেই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সীতা, তোমার ভারি অন্যায়, কেন তুমি লুকিয়ে রাখলে যে তোমার জন্মদিন? রাজারাজড়ার জন্মদিনই ইচ্ছামত এগোনো পিছনো যায়, তুমিও তাদের দলে গেলে?" আমি বলিলাম, "কই, কিছু ত

এগোয় নি, পিছয়ও নি।" কবি বলিলেন, "এই ত এগিয়েছে, কেন তুমি আমায় ফাঁকি দিলে বল ত? আমি জানলে পরে—" সাহেব ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতেছেন না দেখিয়া তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন, "Day after tomorrow is her birthday, she kept it a secret from me।"

খাইতে বসিয়া বিশেষ কিছু খাইলেন না, বলিলেন, "সাহেবকে ভাল ক'রে খাওয়াও, ও খেতে ভারি ভালবাসে।" তাহার পর বাবা, কবি ও সাহেব মিলিয়া রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ হইল।

আমাকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতে আর-একবার অনুরোধ করিলেন। এদিকে আকাশ কালবৈশাখীর ভ্রূকুটিতে কালো হইয়া উঠিল। বাড়ীতে বিশ্বভারতী সঙ্ঘ অপেক্ষা করিয়া আছে, কাজেই খুব বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না, গাড়ী আনিতে পাঠানো হইল। সেদিন গড়পারে যেন গাড়ীর দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছিল, অনেক চেষ্টার পর তবে একখানা গাড়ী পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যাইবার জন্য উঠিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই আর-একবার বলিলেন, "জন্মদিনটা কেন লুকিয়ে রাখলে বল ত?"

তিনি চলিয়া যাইতেই ভাবিলাম বিশ্বভারতী সঙ্ঘে যাইবার অধিকার ত আমাদেরও আছে, আমরাই বা বাড়ী বসিয়া থাকি কেন, জোড়াসাঁকোতে যাইলেই ত হয়। আর একখানা গাড়ী আনিতে পাঠানো গেল, এটা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই আসিল, এবং আমরাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। পৌঁছিয়া দেখি সভার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বলিতেছেন, লোক এক এক করিয়া আসিতেছে, শেষে ঘরে রীতিমত ভীড় জমিয়া গেল। তাঁহার বক্তৃতার পর বিশ্বভারতী সঙ্ঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি নির্ব্বাচন, তাহার নিয়মাবলী প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ আরম্ভ হইল। ভয়ানক জোরে বৃষ্টি আসিতেছে বুঝিয়া আমরা এই সময় উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ী ফিরিবার পথে বেশ এক চোট ভেজা গেল।

মঙ্গলবারে কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। জুলাই মাসে আবার কলিকাতায় আসিলেন শেলীর শতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করিতে। তখন অত্যন্ত অসুখে ভুগিতেছিলাম, তাই সভায় যাইতে পারিলাম না, জোড়াসাঁকোয় গিয়া দেখাও করিতে পারিলাম না। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তিনি নিজেই আমাকে একদিন দেখিতে আসিলেন।

মাসখানিক খালি ৯৯° জ্বর উঠিতেছে, বাড়েও না ছাড়েও না শুনিয়া বলিলেন, "এ আবার কি? একটা decent রকম অসুখও করতে পার না? এই রকম জ্বরে শুয়ে থাকতে ত লজ্জা হওয়া উচিত।" সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় "শারদোৎসব" অভিনীত হইল, তখন আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। যতদূর মনে পড়ে আল্‌ফ্রেড্‌ থিয়েটারেই এই অভিনয় হইয়াছিল। "শারোদোৎসব" কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিলাম, নূতন গানও কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে। কবিশেখরকে আবার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল।

এই বৎসর পূজার ছুটির পূর্ব্বে আমার বিবাহ স্থির হয়। রবীন্দ্রনাথ সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হন, এবং ঠিক ইহার পরই আমাদের এক অতিপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীর উৎসবে আমাকে উপস্থিত না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "সীতা কি শকুন্তলার মত অনন্যমনা হয়ে ধ্যান করছে?" ইহার কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরী হলে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ এইখানে ব্রাউনিং-এর Luria পড়িয়া শোনান। পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে নামিয়া সমাগত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলিতে দাঁড়াইলেন। কাছে গিয়া প্রণাম করিব কিনা

ভাবিতেছিলাম, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মুখ কৌতুকোজ্জ্বল, অত লোক না থাকিলে কিছু একটা রসিকতা করিতেন। আমি প্রণাম করাতে বলিলেন, "এবার আর ৭ই পৌষে নিশ্চয়ই তুমি যাচ্ছ না?" যাইতেছি না তাহা স্বীকার করিলাম, এবং পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তাহার পরদিন গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতিশয় সাদর অভ্যর্থনা পাইলাম। তাঁহার বসিবার ঘরেই বসিলাম, রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কি খবর কিচ্ছু জিগ্‌গেষ করব না, আমি বেশ জানি সব সুখবর।" রবীন্দ্রনাথ আমার সহিত serious ভাবে কথাবার্ত্তা প্রায় বলিতেনই না, রসিকতা, হাসিঠাট্টা আমি অতিশয় উপভোগ করি সেটা বুঝিতেন বলিয়াই বোধহয়। এখন হইতে ত রসিকতা করা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে আলাপই ছাড়িয়া দিলেন। আবার বলিলেন, "তোমায় বললুম আমার স্কুলে মাষ্টারি করতে, তা তোমার পছন্দ হ'ল না, মন সব অন্যদিকে। তা বেশ করেছ, আমার এখন কি উপায় হবে? একজন কাউকে ঠিক ক'রে দাও, বিধবা কিম্বা বুড়ী দেখে দিও। তোমাদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না, কবে মাঝপথে

বসিয়ে সরে পড়বে।” যতক্ষণ ছিলাম, আমার দিকে তাকাইয়া প্রায় সারাক্ষণই হাসিয়াছিলেন। নূতন অবস্থার দোহাই দিয়া লেখা ছাড়িয়া দিতেছি বলিয়া একটু স্নেহের তিরস্কার করিলেন। আরও খবর দিলেন যে তিনি স্বয়ং ভয়ানক বোকা হইয়া গিয়াছেন, আর লিখিতে পারেন না। ৭ই পৌষের উৎসবের কথায় বলিলেন, “তোমায় অবশ্য এবার আমি যেতে বলছি না, তবু যদি যাও, আমার বাড়ীতেই ঠাঁই ক'রে দিতে পারি।” অন্য কয়েকজন অতিথি আসিয়া পড়ায়, বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পরদিন তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন যতদূর মনে পড়ে। জানুয়ারী মাসে আবার কলিকাতায় ফিরিলেন। এই সময় বোধহয় আচার্য্য Sylvain Levi শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন। রামমোহন লাইব্রেরীতে তাঁহার বিদায় উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। Levi দম্পতি ভারতীয় বেশে সভায় উপস্থিত হন। Prof. Levi একটি ছোট মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। Madame Levi উপস্থিত মহিলাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষে ইংরেজীতে একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন।

৭ই জানুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরীতে আর-একটি সভা

হইল, এখানে এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব Village Organisation সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, রবীন্দ্রনাথ হইলেন সভাপতি। বক্তার মতে আমাদের দেশের গ্রামগুলির তিনটি ব্যাধি, Malaria, monkeys and mutual mistrust। এই গুলির প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিলেন। ভাল সার দিয়া চাষ করিলে ফল কি রকম ভাল হয় তাহা দেখাইবার জন্য সাহেব কতকগুলি বেশ বড় বড় পাতিলেবু লইয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি সভাপতির সামনে একটি ছোট টেবিলের উপর ছিল। বক্তার কথা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া শ্রীনিকেতনে কিভাবে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে কিছু বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইবার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম দুইটা লেবু তাঁহার হাতে রহিয়াছে। আমি প্রণাম করিবামাত্র, সে দুটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এগুলো বিতরণ করব ব'লে এনেছিলুম, তোমাকেই দেওয়া সব চেয়ে উচিত। এই নাও, সফলতা লাভ কর।" এক হাট লোকের মাঝে এইরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসে "বসন্ত-উৎসব" উপলক্ষ্যে আবার কবি কলিকাতায় আসিলেন। গানের রিহার্সাল একদিন

শুনিয়া আসিলাম। আর একদিন রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি মজ্‌লিশে নিজের নূতন ও পুরানো লেখা অনেকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে প্রায়ই ঘুরিতেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে এই রকম এক ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। দিদির সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা এখন খুব লিখতে ব্যস্ত বুঝি?" "লেখা"টা অবশ্য সাহিত্যচর্চ্চা হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন নাই। খবর পাইলাম যে কাথিয়াওয়াড় বেড়াইতে গিয়া, সেখানকার মেয়েদের রঙীন সাজ দেখিয়া কবি খুব মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। বাঙালীর মেয়েরা খালি শাদা কাপড় পরে, দেখিতে ভাল লাগে না বলিয়া তিনি আশ্রমের মেয়েদের বকিতেছেন। ইহার পর আশ্রমেও রঙীন কাপড়ের কিছু প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছিল।

এপ্রিল মাসে আমাদের Social Fraternity প্রথম আরম্ভ হয়। এই সময় তাহার বার্ষিক জন্মোৎসব করার কথা উঠিল। প্রশান্তচন্দ্র Alipore Meteorological Office-এ কাজ লইয়া, সেইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করাতে, স্থানাভাবে আমাদের ক্লাবটির অধিবেশন আর তেমন নিয়মিত হইত না। এইবারে আলিপুরেই উৎসবের

আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন বলিয়া কথা দিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের নূতন বাড়ীতে সুন্দর বাগান ছিল, সেইখানেই সব ব্যবস্থা করা গেল। বাগান ত আর সাজাইবার দরকার হয় না, তবু অল্প কিছু সাজানোও হইল, এবং মেয়েরা সকলে রঙীন কাপড় পরিয়া সাজিয়া গেলেন, কারণ কবি শাদা সাজের বিরুদ্ধে এই সময় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যথাসময়েই আসিলেন, সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও নন্দিনী। নন্দিনীকে সেই প্রথম দেখিলাম। ক্লাবের জন্মদিন যদিও তবু ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন অনেকেও আসিয়াছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পত্নী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার লওয়াতে আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখিয়া অনেক প্রকার অভিযোগ করিলেন। আমি তাঁহাকে আর দেখিতে যাই না কেন? এই প্রকার ব্যবহারের মূলে যে কোন্ মনোভাব আছে তাহা তিনি জানেন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার আর জ্ঞান কতটা হইল তাহাও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। গল্প লেখা ভাল না গল্প হওয়া ভাল, সেও ছিল তাঁহার একটা প্রশ্ন।

জলযোগের আয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথকে কিছু

খাইতে অনুরোধ করায় তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,"এই রকম ক'রে ফাঁকি দেবার চেষ্টা বুঝি ?" আমি বলিলাম, "ফাঁকি দেবার চেষ্টা ত কিছু করছি না ?" কবি বলিলেন, "বেশ, দে'খ যথাকালে যেন এ কথাটা মনে থাকে। থাকবে ত ?" মনে যে থাকিবে তাহা দুই-তিনবার বলিয়া তবে তাঁহাকে কিছু খাওয়ানো গেল।

Prof. Winternitz-ও এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই সময় আমাদের কাছে আসিয়া বসাতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি অন্য অতিথিদের খাওয়ার তদারক করিতে গেলাম।

গানের আয়োজন ছিল। শ্রীমতী সাহানা বসু দুই-তিনটি গান করিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও কয়েকটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দিন-দুই পরে জোড়াসাঁকোয় গেলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে। সেদিন ঘরে অনেক লোক, তবু জনান্তিকে দুই-চারবার রসিকতা করিলেন। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ক্রমেই আমার গভীর হইতেছে কিনা, সে প্রশ্ন আজও একবার শুনিলাম। ইহার পর কিছুদিনের জন্য তিনি শিলং চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি। শুনিলাম নূতন একখানি নাটক লিখিয়া আসিয়াছেন, সকলকে শুনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। নাটকটির প্রথম নামকরণ হয় "যক্ষপুরী", পরে বদলাইয়া "রক্তকরবী" নাম দেন।

নাটক পড়া হইল, পাঠান্তে একটু আলোচনাও হইল। ইহার পর অনেকে উঠিয়া গেলেন। কবি আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছ ?" বলিলাম, "না।" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ঝগড়া করেছ ?"

আমার ভবিষ্যৎ গৃহে আমি যে তাঁহাকে একেবারেই ডাকিব না, সে বিষয়ে দেখিলাম তিনি নিশ্চিন্ত। বলিলেন, "বিবাহের পর মেয়েরা আর কাহারও intrusion সহ্যই করতে পারে না।"

এই সময় হইতেই "বিসর্জ্জন" অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতিমা দেবী একদিন বিকালে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন, সেই সুযোগে রিহার্সালও দেখিয়া আসিলাম। আমার খুড়তুতো ভাই শ্রীমান্ হেমন্ত ও শ্রীমান্ অশোক দুজনেই দলে ভিড়িয়াছেন, দেখিলাম। হেমন্ত গ্রামবাসী সাজিয়াছেন ও অশোক সাজিয়াছেন চাঁদপাল।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। এ তাঁহার এক নূতন রূপ দেখিলাম। অভিনয় ত তাঁহাকে অসংখ্যবার করিতে দেখিয়াছি কিন্তু তাহা অভিনয় বলিয়াই প্রায় বোধ হইত না। যেন তিনি রবীন্দ্রনাথ রূপে দাঁড়াইয়া নিজেরই কথা বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু রঘুপতির ভূমিকায় তাঁহার নূতন মূর্ত্তি দেখিলাম। পরে অবশ্য সব বদ্‌লাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চে তিনি রঘুপতি না সাজিয়া সাজিলেন জয়সিংহ। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা দুই ভূমিকাতেই তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিলাম। ইহার পর আর-একদিন রিহার্সাল দেখিতে গিয়া শুনিলাম অনেকেরই ভূমিকার অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। রিহার্সালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, "কি সীতা, তোমার latest কি?" বলিলাম, "earliest যা ছিল তাই।"

ইহারই মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে নানাস্থানে সভা-সমিতিও হইত। রামমোহন লাইব্রেরী আমাদের বাড়ীর খুবই কাছে ছিল, সেখানে কিছু হইলে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতাম। ২৫শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ এইখানে নিজের পুরানো রচনা অনেকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন। ব্যাখ্যাও করিলেন কয়েকটি কবিতার।

আগষ্ট মাসের একেবারে শেষে এম্পায়ার থিয়েটারে "বিসর্জ্জন" অভিনীত হইল। রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহ সাজিয়াই নামিলেন, যদিও বয়স তখন ৬২ বৎসর। যে কেহ তাঁহাকে তখন দেখিয়া যুবক বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত, এমন সতেজ চলাফেরা, দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। রঘুপতি সাজিলেন দিনেন্দ্রনাথ। রক্তাম্বর-পরিহিত তাঁহার ভৈরব-মূর্ত্তি এখনও মানসনেত্রে দেখিতে পাই। রাজা সাজিলেন রথীন্দ্রনাথ, রাণী গুণবতী সাজিলেন সংজ্ঞা দেবী। আমরা যেদিন দেখিতে গেলাম সেদিন অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করিলেন মঞ্জুশ্রী দেবী, দ্বিতীয় দিনে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিলেন প্রীতি অধিকারী। নয়ন রায় সাজিয়াছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রামবাসীদের নৃত্যগীতগুলি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। একটি নৃত্য মনে করিয়া এতকাল পরেও হাস্য-সম্বরণ করিতে পারি না।

দুই রাত্রি অভিনয় দেখিয়াও কলিকাতাবাসীর আকাজ্ক্ষা মিটিল না, আরও দুই দিন অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল এমন সময় স্বয়ং কবি, রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বাধাইয়া শুইয়া পড়াতে অভিনয় আর হইল না।

পরিশিষ্ট

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বিবাহ হয়। ইহার পর বহুদিনের জন্য বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রস্থান করিলাম।

বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী উপহার দিয়া গেলেন। প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় দুই লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত, তবুও বৌভাতেও খানিকক্ষণের জন্য গিয়াছিলেন।

বিদেশযাত্রার পর তাঁহার সহিত বাহিরের যোগসূত্র অনেকদিনের মত ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহাকে চিরদিনই দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতাম। শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি স্নেহও তাঁহার অক্ষুণ্ণই ছিল, ইহাই বিশ্বাস করি। আত্মীয়-স্বজনের চিঠিতে প্রায়ই তাঁহার খবর পাইতাম। সকলের নিকট হইতে অতদূরে গিয়া আমি রহিয়াছি ইহা তাঁহার ভাল লাগিত না, বাবাকে কয়েকবারই সে কথা বলিয়াছিলেন। ফিরাইয়া আনার কার্য্যে সাহায্য করিতেও

প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তখন দেশে ফিরিতে পারিলাম না।

১৯২৪-এর মার্চ্চ মাসের শেষে আমি একবার কলিকাতায় আসি। বেশ অসুস্থ অবস্থায়ই আসিয়াছিলাম। আসিয়া শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশযাত্রার আয়োজন করিতে তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ হইয়া চীন যাইবেন। দেখা করিতে গেলাম। জোড়াসাঁকোর তখন মহা ভীড়। রবীন্দ্রনাথ তবু কয়েক মিনিটের জন্য কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া গেলেন। বলিলেন, আমি রেঙ্গুনে থাকিলে আমার বাড়ী গিয়া অতিথি হইতেন। আমার ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতাকে কি ওখানে নাপ্‌পি আর ডুরিয়ান্‌ ছাড়া কিছু খেতে দেওয়া হ'ত না? ওর চেহারা অমন হ'য়ে গেল কেন?" ইহার কয়দিন পরেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

কয়েক মাস পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। আমার প্রথমা কন্যাটি তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্য একদিন তিনি আমাদের রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে আসিলেন। খুকীকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কি নাম রাখা হইয়াছে। সুদক্ষিণা নাম দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া নাম নির্ব্বাচনের

প্রশংসা করিলেন। তাহার পর ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওকে আমার হিংসে হচ্ছে, কেমন নিশ্চিন্ত আরামে আছে, বিশ্বভারতীর ভাবনা ভাবতে হয় না।" আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেশ থাকতে রেঙ্গুনে গিয়ে উঠলে কি কারণে বল ত?" কেন যে গেলাম তাহার সঙ্গত কারণ কিছু দিতে পারিলাম না। আবার বলিলেন, "তোমার কবিটিকে এখানে ধ'রে আন না, আমরা কি আর কাজকর্ম্ম দিতে জানি না নাকি? তুমি একটু pressure দিলেই হয়।" অল্পক্ষণ পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

আমিও মাস-দুই পরে আবার ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া গেলাম। শিশুকন্যাটি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহাকে লইয়া এমন ব্যস্ত থাকিতে হইত যে আর কোনো কাজ করিবার, কোনো কথা ভাবিবার সময়ই থাকিত না। সমাজ-সংসার হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিতই হইয়া গেলাম।

মাসের পর মাস পীড়িতা কন্যাকে লইয়া ঘরের ভিতরেই কাটিয়া যাইত, বাহিরের মানুষের মুখই এক রকম দেখিতে পাইতাম না। রবীন্দ্রনাথের খবর বাড়ীর চিঠি হইতে মাঝে মাঝে পাইতাম, কাগজপত্রেও পাইতাম।

বিশ্বভারতীর জন্ত অর্থ সংগ্রহার্থে তিনি ক্রমাগতই দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছেন, এই খবরটাই সব চেয়ে বেশী করিয়া পাইতাম।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাভা, বালি প্রভৃতি ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া অক্টোবর মাসে যখন দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন রেঙ্গুনে দিন-তুই-তিন থাকিয়া আসেন; আমার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার পীড়িতা কন্তার কি চিকিৎসা হইতেছে তাহার খবর লইলেন ও বায়োকেমিক্ চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন। আমায় বলিলেন, "চেহারাটা অনেকখানি বদলে ফেলেছ।" তাঁহাকে বিশেষ কিছু খাওয়ানো গেল না। পাড়ার নানা শ্রেণীর নরনারী তাঁহার দর্শন লাভের জন্ত উৎসুক হইয়াআসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ বাসের পর্ব্ব সাঙ্গ করিয়া আমি আবার দেশে ফিরিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। পূজার ছুটির সময় একবার শান্তিনিকেতনে গিয়া মাস-খানিক কাটাইয়া আসিলাম। কোনার্ক ভবনটি তখন খালি ছিল, সেইখানেই ছিলাম। রবীন্দ্রহীন শান্তি-নিকেতন কেমন যেন অদ্ভুত লাগিল। দেখিলাম আশ্রমের বাহিরের চেহারা আগাগোড়াই প্রায় বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ আর আগের মত হইত না। নিজে তখন সংসারভারে ভারাক্রান্ত, গিয়া যে দেখা করিব সে উপায় ছিল না। কবিও বিশ্বভারতীর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। স্বাস্থ্যও তাঁহার ভাঙিয়া পড়িতেছিল, আগের মত ঘোরাঘুরি করিতে পারিতেন না।

১৯৩১-এর ডিসেম্বরে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় কয়েকবার দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। "নটীর পূজায়" ভিক্ষু উপালীরূপে তাঁহাকে দেখিয়া একটু চমকিত হইয়া গেলাম। চেহারায় তখন বার্দ্ধক্যের আক্রমণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠস্বর কিন্তু আগেরই মত সতেজ। টাউন হলের অভিনন্দনের দিন দূর হইতে দেখিলাম।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই বোধহয় কবি খড়দার একটি বাগান-বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। সেইখানে গিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। হাঁটা-চলা করাও তাঁহার পক্ষে ক্রমেই কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিতেছে বোধ হইল। এই সময়ই বোধহয় কলিকাতা আর্ট কলেজে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। তিনি তখন শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের অতিথি রূপে কলিকাতায়ই ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যাকে লইয়া

দিদির সঙ্গে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শিশুটিকে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন ও অনেক আদর করিলেন। সেইদিন "নটীর পূজা" ফিল্মটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নিউ থিয়েটার্সে'র কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নাতনীস্থানীয়া কয়েকটি বালিকা উপস্থিত দেখিয়া কবি বলিলেন, "এদের কিছু খাইয়ে দিলে হ'ত। আচ্ছা চল বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।" রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ছবিখানি দেখাইতে। বহুকাল পরে মনে হইল, তাঁহার স্নেহ কিছুই কমে নাই, সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া বাধ্য হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি, তাই আগের মত এই ঐশ্বর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি না। এই বৎসরই তিনি পারস্য যাত্রা করিলেন। দম্‌দম্ aerodrome-এ তাঁহার যাত্রা দেখিবার জন্য গেলাম। অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে সকলেরই সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন, তাহার পর পাইলটের সাহায্যে aeroplane-এ উঠিয়া গেলেন। প্লেন্ তাঁহাকে লইয়া যখন শূন্যে উঠিল, তখন মনটা একটা ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। আকাশ-যান একবার বহু উর্দ্ধে উঠিয়া হঠাৎ যেন ঘুড়ির মত গোঁৎ খাইয়া একেবারে গাছের

ভাঙে আসিয়া ঠেকিল, আবার সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। শুনিলাম উহা নাকি aeroplane-এর salute, প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া একটু ভয়ই পাইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। পারস্য হইতে তিনি জুন মাসে ফিরিয়া আসেন। নানা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় কয়েকবারই আসেন, দুই-একবার তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে প্রফুল্ল-জয়ন্তীতে তাঁহাকে সভাপতিরূপে দেখিতে পাইলাম।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "চণ্ডালিকা" অভিনয় দেখিতে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নাটকটি পড়িয়া শুনাইলেন। রামমোহন শতবার্ষিকীতে একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম। দাঁড়াইতে বা বেশী হাঁটিতে এই সময় তিনি কষ্টবোধ করিতেন, বসিয়াই বক্তৃতা দিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরেজীতে তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম অবাঙালী শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিলেন। এই বৎসরেরই বিভিন্ন সময়ে, "দুই বোন", "মালঞ্চ" ও "বাঁশরী" এই তিনটি রচনা করেন ও কলিকাতাবাসী ভক্তদের পড়িয়া শোনান। কলিকাতায় আসিলে এই সময় প্রায়ই তিনি প্রশান্তচন্দ্রের বরাহনগরের বাড়ীতে বাস করিতেন, সেখানে

যাওয়া সহজ ছিল না। তবে ঐ তিনটি রচনা শুনিতে গিয়াছিলাম।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কলিকাতায় "রাজা" অভিনয় হয়। ৭৪ বৎসর বয়সেও তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ঠাকুরদাদারূপে, আড়াল হইতে "রাজা"র ভূমিকাও অভিনয় করিলেন। ইহার পর তিনি বোধহয় আর অভিনয় করেন নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে যখন "চিত্রাঙ্গদা" অভিনীত হইল তখন তিনি স্টেজে আসিয়া বসিয়াছিলেন বটে, তবে অভিনয়ে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

এই সময় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নাম দিয়া বিচিত্রাভবনে আবার একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, তখন হইতে স্বাস্থ্য তাঁহার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। আরও যে চার বৎসর ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকে আমাদের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, সে চার বৎসর অনেকাংশেই তাঁহাকে রোগীর মত কাটাইতে হইয়াছিল। অসাধারণ মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল, তাই কাজ করিয়া যাইতেন, মধ্যে মধ্যে সভা-সমিতিতেও উপস্থিত হইতেন। কিন্তু দেশবাসীর

নিকট হইতে তিনি অনেক দূরে চলিয়া গেলেন, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া ক্রমেই অসম্ভবের পর্য্যায়ের মধ্যে গিয়া পড়িল। আমরা পূর্ব্বকালে তাঁহার ঘরের মানুষের মত ছিলাম, যখন ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার কাছে গিয়াছি, কখনও বাধা ত পাইই নাই, সাদর অভ্যর্থনাই পাইয়াছি। কিন্তু ক্রমে দেখিলাম অবস্থার সহিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এত বিধিনিষেধের গণ্ডি এড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাওয়ার মধ্যেও কোনও আনন্দ পাইলাম না। দুই-একবার চেষ্টা করিয়া দূরেই সরিয়া গেলাম। তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না জানি না, করিলেও এ বিষয়ে কি ভাবিয়াছিলেন, তাহা জানিবার সুযোগ হয় নাই। তবে কালেভদ্রে কখনও যদি হঠাৎ কাছে গিয়া পড়িতাম, মনে হইত তিনি আনন্দিতই হইয়াছেন, আগেরই মত আদর করিতেন, আগেরই মত রসিকতা করিতেন। যে দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য একদিন আমাদের ছিল, বিশ্বাস করি শেষের দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে বঞ্চিত হই নাই, তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল না, তাই সাক্ষাৎভাবে মনপ্রাণ দিয়া আর তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর কয়েকটি অধিবেশনে গিয়াছিলাম মনে আছে। কিন্তু বাল্যকালের ডাইরী লেখার

অভ্যাস উত্তর জীবনে আর রাখি নাই, কাজেই কবে কি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না। গীতবাদ্য, নৃত্যাদি কয়েকবার হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরাই এ-সব বেশীর ভাগ করিত, কলিকাতার দুই-চারজনও কিছু কিছু করিয়াছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ "ছেলেবেলা" হইতে অনেকখানি পড়িয়া শুনাইলেন। আমার দ্বিতীয়া কন্যাকে সেদিন লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এটি যে কার মেয়ে তা আর ব'লে দিতে হবে না।"

আর-একদিন নূতন কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু একদিন অধিবেশন আরম্ভ হইবার ঠিক আগেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেদিন আমরাও কিছু আগে গিয়াছিলাম তাঁহার সহিত দেখা করিবার আশায়। বিচিত্রার দোতলার একটি ছোট ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দুই-চারটি কথা বলিতেছি, এমন সময় একজন আসিয়া খবর দিলেন যে সভার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সীতা, আমাকে এইবার সাজতে হবে, ভেবো না যে সাজ-সজ্জা তোমাদেরই দরকার, আমাদেরও দরকার।" আমরা ত চলিয়া আসিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময় পণ্ডিত নেহেরু

আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কবির সাজসজ্জার আরও দেরি হইয়া গেল বোধহয়।

আর-একদিন গিয়াছিলাম দেখা করিতে, উপলক্ষ্যটা কি ছিল মনে নাই। সেদিনও দেখিলাম বিচিত্রার উপরের একটি ছোট ঘরে বসিয়া আছেন, অবনীন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া। ঘরে যথেষ্ট চেয়ার ছিল না বলিয়া আগেরই মত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেদিন অতিরিক্ত অতিথিসমাগম নাকি সকাল হইতেই চলিতেছিল। তাঁহাদের ভিতর অনেকগুলির সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অথচ তাঁহার সেক্রেটারীরা ভাবিয়াই পাইতেছিলেন না যে কি ছুতায় তাঁহাদের বিদায় করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তোমাদের রাখা, তাও একটু গুছিয়ে বলতে পার না ?"

কবির রচনাবলীর কথা উঠিল। এ সম্বন্ধে ভাল একখানা বই কেহ লেখে নাই বলিয়া কালিদাসবাবু দুঃখ করিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "দাঁড়াও না, যাবার সময় যা-কিছু লিখেছি সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, দেখি তোমরা কি কর।"

১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে ৭ই পৌষের উৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। ১৯৩০-এ ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া

একবার সেখানে গিয়াছিলাম, তাহার পর এইবার। কবির স্বাস্থ্য অতি দুর্ব্বল দেখিলাম। তখন "পুনশ্চ" নামক ছোট একতলা বাড়ীটিতে বাস করিতেছিলেন, "উদীচি" সবে শেষ হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কানেও ভাল শুনিতে পান না দেখিলাম। এখানে আসিয়াই শুনিলাম, বেশী লোকজন গিয়া ভীড় করিলে কবি বিরক্ত হন। ভাবিলাম সে যাহাই হউক, তাঁহাকে দেখিতেই যখন আসিয়াছি, তাঁহাকে না দেখিয়া যাইব না। ৬ই পৌষ দুপুর বেলা গেলাম তাঁহার কাছে। মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, ঘরটি প্রায় অন্ধকার, মনে হইল যেন চিনিতে পারিতেছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন না?" কণ্ঠস্বরেই চিনিলেন, রসিকতা করিয়া বলিলেন, "আয়তনে চিনছি।" আমি বলিলাম, "আমার চেয়ে বিপুলায়তন মানুষ ত অনেকগুলিই আপনার এখানে দেখলাম।"

তাহার কয়েক দিন আগেই তিনি মেদিনীপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, খানিকক্ষণ তাহারই গল্প করিলেন। মেদিনীপুর ও মেদিনীপুরবাসীদের তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছে বলিলেন। বাঙালী শহরে ছেলেদের কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন।

৭ই পৌষ সকালে তিনিই মন্দিরে উপাসনা করিলেন। এই শেষ তাঁহার উপাসনা শুনিলাম। বিকালের গাড়ীতে

চলিয়া আসিতেছিলাম, ভাবিলাম দুপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, না হইলে সময় হইবে না। সকালে তিনি নূতন বাড়ী "উদীচি"তে উঠিয়া গেলেন, ঠিক উপাসনার পরেই। দৈহিক দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া নিজেই হাঁটিয়া উপরে উঠিলেন দেখিলাম। সকাল হইতেই লোকের ভীড়, শুনিলাম ক্রমাগত তাঁহার কাছে মানুষ গেলে হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন। ভাবিলাম যাইয়াই দেখা যাক, কখনও ত আদর বই অনাদর তাঁহার কাছে পাই নাই, না-হয় এবার বকুনিই খাইয়া আসিব। আমি ও আমার ভ্রাতৃজায়া গেলাম, উদীচির বারান্দায় তখন বসিয়াছিলেন, হাসিয়াই বসিতে বলিলেন, আমাকে বলিলেন, "পালাচ্ছ বুঝি? খুব জব্দ হয়েছ ত ভীড়ের মধ্যে এসে? আমি কিছু জানি নে বাপু, যেমন এসেছ বিনা নেমন্তন্নে।" আমার ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, "কলকাতায় আবার 'চিত্রাঙ্গদা' হবার কথা হচ্ছে, তুমি সাজবে চিত্রাঙ্গদা?" আমি হাসাতে বলিলেন, "সীতা, এ রকম ক'রে হাসা বড়ই অসৌজন্যের পরিচায়ক, আমি seriouslyই বলছি।" বেশীক্ষণ কথা বলিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। এণ্ড্রুজ সাহেবকে এইখানে দেখিলাম।

আমাকে দেখিয়া খুসি হইয়া সকলের খবর লইলেন, ও আমাদের সঙ্গে শ্রীনিকেতনে বেড়াইতে গেলেন। শান্তি-নিকেতনের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম সেই পুরানো দিনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই। পুরাকালের অধ্যাপকদের ভিতরেও বিশেষ কেহই আর সেখানে নাই, দুই-তিন জন ছাড়া। বিকালের গাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। ডিসেম্বরের শেষে তাঁহার নাতনী নন্দিনীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইলাম, কিন্তু নানা বাধা পড়ায় তখন আর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এ গিয়া দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল চিকিৎসার জন্য। শিয়ালদা স্টেশনে গেলাম একবার দেখিতে পাইবার আশায়, কারণ একবার বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্টেশনে লোক খুব বেশী হয় নাই, বোধহয় কখন কোন্ ট্রেনে তিনি আসিবেন তাহা বিশেষ কেহ জানিতে পারেন নাই।

দার্জ্জিলিং মেলে তিনি আসিলেন। ষ্ট্রেচারে করিয়া বহন করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনা হইল। স্টেশনের

কর্ত্তৃপক্ষগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, নিজের হাত দিয়া একবার মুখ আড়াল করিলেন। এম্বুল্যান্সের গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে জোড়াসাঁকোতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও জোড়াসাঁকো প্যর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। বাড়ীর উঠানে যখন রবীন্দ্রনাথকে ষ্ট্রেচারে করিয়া গাড়ী হইতে নামানো হইল, তখন সকলের দিকে একবার তিনি তাকাইয়া দেখিলেন। চিনিতে পারিলেন কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এইখানেই কয়েক দিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ার পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের উৎসবের সময় মেয়েদের লইয়া একবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা একটু ভাল করিয়া দেখুক এই ইচ্ছা লইয়াই গিয়াছিলাম, তাঁহাকেও বহুদিন দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তিনি তখন আর বাহিরে আসিতে পারেন না, দেখা করাও অতি কঠিন, তবু গায়ের জোরে বাধা কাটাইয়াই গেলাম, কারণ কতদিন আর তাঁহাকে ভগবান্ আমাদের মধ্যে রাখিবেন সেই বিষয়েই সন্দেহ ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার ঘরে গেলাম। আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কানে

তখন খুব কম শোনেন, চোখেও বিশেষ ভাল দেখেন না, তবু অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। দিদির বড় মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার মাও এত লম্বা নয়, তোমার বাবাও এত লম্বা নয়, তোমার দাদামশায়ও এত লম্বা নয়, তুমি এত লম্বা কি ক'রে হ'লে ?"

মহাত্মা গান্ধী ও মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রাম এই সময় আসিল। গান্ধীজির টেলিগ্রামটির একটি রসিকতাপূর্ণ উত্তর তখনই তখনই দিয়া দিলেন। তাঁহার সেক্রেটারি কি কাজের কথা বলিতে আসাতে তাঁহাকে বলিলেন, "সৎসঙ্গ ভাগ্যে মেলে, এখন এঁদের সঙ্গে আলাপ করছি।" আমাকে বলিলেন, "এই দেখ, তোমাদের নিয়েই ত যত বিপদ্, তোমরা ভীম নাগের সন্দেশ খাবে না দ্বারিকের সন্দেশ খাবে তাই এখন আমাকে ঠিক করতে হবে।"

বেশীক্ষণ কথা বলিয়া পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে আমরা খানিক পরেই চলিয়া আসিলাম।

পরদিন নববর্ষে তাঁহার জন্মোৎসব। বিকালের দিকে উদয়নের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উৎসব হইল। নৃত্য-গীতগুলি অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাহিরে

আসিয়া বসিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াই রহিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে মুখে কিছু বলিলেন। যে কণ্ঠস্বর তূর্য্যনিনাদের মত সহস্র সহস্র লোকের কর্ণে গিয়া বাজিত, বিশালতম জনসমাগমেও যাহা কখনও হার মানিত না, আজ তাহা ক্ষীণবল, কয়েক গজ দূরে বসিয়াই তিনি কি বলিতেছেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। "সভ্যতার সংকট" ক্ষিতিমোহনবাবু পড়িয়া শুনাইলেন।

উৎসবান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। তখনও ঘরে যান নাই, বাহিরেই বসিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে আমার একটি লেখা বাহির হইয়াছিল, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের তাঁহার জন্মোৎসবের বিবরণ। ইহারই মধ্যে সেটি পড়িয়া ফেলিয়াছেন দেখিলাম। আমি কাছে যাইতেই হাসিয়া বলিলেন, "সীতা, কি সব বাজে কথা লিখেছ বল দেখি? আমি নাকি তোমাদের আনতে স্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠিয়েছিলুম? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা!" আমি বলিলাম, "গরুর গাড়ী ছাড়া আপনার আর কিছু তখন ছিল না ত কি পাঠাবেন? বাজে কথা আরও ঢের জমা হয়ে আছে, পরে লিখব।" বলিলেন "ও বাবা, আরও লিখবে নাকি?"

ইহ জীবনে শেষ এই তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বিধাতা মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই রাখিয়াছেন, তাই

নিজের জীবনের একটা দিকের উপর যে শেষ যবনিকা পড়িল, তাহা না বুঝিয়া, প্রফুল্লচিত্তেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। রাত্রে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আশ্রমের ও শ্রীনিকেতনের সকলকে খাওয়ানো হইল। ভোর রাত্রের ট্রেনে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর আর কিই বা লিখিব। শেষে বিদায়ের স্মৃতি যে বেদনাময় রেখায় হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারি এমন ভাষা কোথায়? অস্ত্রোপচার হইবার পর দুই দিন জোড়াসাঁকোয় গিয়াছিলাম। প্রথম দিন শুনিয়া আসিলাম তিনি ভালই আছেন, অস্ত্র করায় উপকার হইয়াছে। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া আবার যেদিন গেলাম, সেদিন বুঝিতেই পারিলাম ডাক আসিয়াছে, আর দেরি নাই। তবু মন সে কথা বুঝিতে চাহিল না। এই পৃথিবীতে আমরা সকলেই থাকিব, অথচ তিনি থাকিবেন না, ইহা কখনও কল্পনা করি নাই, তাই তখনও যাহা নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলাম তাহা জোর করিয়া বিশ্বাস করিলাম না। রোগীর ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলাম তন্দ্রাচ্ছন্ন মূর্ত্তি, যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

শেষদিন সকালে জোড়াসাঁকো হইতে ডাক আসিল,

আর দেরি নাই। যাইতে পা উঠিতেছিল না, কিন্তু না যাইয়াই বা থাকিব কি করিয়া? দিদিদের সঙ্গে গেলাম। তাঁহার ঘরের সামনে যাইতে বা ভিতরে যাইতে আজ আর কোনো বাধা নাই। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার ভিতরের দিকে চাহিলাম। অনন্তধামযাত্রীর সে মূর্ত্তি সহ্য করিতে পারিলাম না, ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।

তিনি চলিয়া গেলেন। শেষ অবধি বিশ্বাস ছিল যে অলৌকিক কিছু ঘটিয়াও তিনি থাকিয়া যাইবেন, আমাদের ত্যাগ করিবেন না, বিধাতা সে বিশ্বাস ভাঙিয়া দিলেন। সূর্য্যহীন পৃথিবী যেমন মানুষ ধারণা করিতে পারে না, রবিহীন বঙ্গভূমি আমরা তেমনই কখনও কল্পনা করি নাই। কিন্তু তাহারই ভিতর ত বাস করিতেছি। তিনি কোথাও নাই, ইহা বিশ্বাস ত হয় না, কিন্তু কোথায় আছেন, ব্যাকুল মন তাহার সন্ধানও পায় না।

বাল্যকালে ভাবিতাম ভগবান্ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মত দেখিতে। এখন জীবনের অনেক পথ মাড়াইয়া আসিয়াছি, তবু সেই শৈশবের বিশ্বাস যেন নূতন একটা রূপ ধরিয়া মনে জাগিয়া আছে। তাঁহার দর্শন আর কোথাও মিলিবে না এ বিশ্বাস কিছুতেই হয় না, ভাবি যে-ভগবানের ভিতর তিনি বিলীন হইলেন, তাঁহারই মধ্যে আমাদের চির-পরিচিত সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব।